শ্রীশ্রীযোগিরাজ

গম্ভীরনাথ-প্রসঙ্গ

প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ।
স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্ (শ্রীভা ৩।২৫।২০)

ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের

দর্শনাধ্যাপক—

শ্রীঅক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ

প্রণীত

১৩৩২

उत्सर्गः

सद्गुरुचरणात्प्राप्तम्

सद्गुरुचरणेऽर्पितम् ॥

ভক্তবৎসল শ্রীশ্রীবাবা গম্ভীর নাথজী

শ্রীশ্রীগম্ভীরনাথাষ্টকম্ ।

আজানুলম্বিতভুজং সিতকৃষ্ণকেশং
দীর্ঘায়তারুণমৃদুস্মিতশোভিনেত্রম্ ।
শ্বেতাম্বরাবৃততনুং কনকাবদাতং
আরক্তকোমলপদং নৃবরং প্রপদ্যে ॥ ১

সুকেশং সুবেশং সুনেত্রং সুবক্ত্রং
সুনাসং সুহাসং সুপাণিং সুপাদম্ ।
সুকর্ণং সুবর্ণং সুবাচং সুশীলম্
প্রপন্নোঽস্মি নাথং মনোহারিরূপম্ ॥ ২

প্রসন্নদৃষ্ট্যাখিলতাপশোষণং
বরাভয়ার্থং ধৃতপাণিপল্লবম্ ।
স্বপাদপোতেন ভবাব্ধিতারণং
অনাথনাথং প্রণমামি সদ্গুরুম্ ॥ ৩

জনস্য মিথ্যাভিমতেরচক্ষুষঃ
চিরং প্রসুপ্তস্য তমস্যনাশ্রয়ে ।
প্রবোধনার্থং স্বকৃপা-বিভাসিতং
সমাশ্রয়েঽহং গুরুদেবভাস্করম্ ॥ ৪

স্বসুখনিভৃতচিত্তং তন্নিরস্তান্যভাবং
স্বমহিমপরিপূর্ণং সর্ববকর্ম্মপ্রমুক্তম্ ।

দলিতসকলভেদং নির্ব্বিকারং প্রশান্তং
ত্যক্তনভজনহীনং যোগিরাজং প্রপদ্যে ॥ ৫
সৃষ্টিস্থানপ্রলয়করণে ত্বাং ক্ষমং কেচিদাহুঃ
সাক্ষাদ্‌বিশ্বেশ্বর ইতি তথা কেচিদন্যে মহান্তঃ
মায়াতীতস্ত্রিগুণরহিতো যুক্তযোগীতি কেচিৎ
জানেঽহং ত্বামশরণগতিং কিঞ্চনান্যন্ন জানে ॥ ৬
ঐশ্বর্য্যং তে মহিমজলধেঃ সংধৃতানন্তশক্তেঃ
বিজ্ঞাতুং কঃ কথমিহ বিভো শক্যতে জীববুদ্ধ্যা ।
যে তু প্রেম্না প্রণতিপরমা ত্বৎপদং সংশ্রয়ন্তে
তৈ দৃষ্টস্তেঽপ্রতিমমহিমা ত্বৎকৃপালোকদীপ্ত্যা ॥ ৭
শান্তং দান্তং সমদৃশিযুতং মৌনবন্তং নিরীহং
স্বাত্মক্রীড়ং নিজসুখভুজং সৌম্যগম্ভীরমূর্ত্তিম্ ।
শক্ত্যাধারং পরমকরুণং জীবকল্যাণদীক্ষং
বন্দে দেবং ভবভয়হরং সদ্‌গুরূণাং বরিষ্ঠম্ ॥ ৮

ইতি শ্রীশ্রীগুরু-গম্ভীরনাথাষ্টকম্ ॥

শ্রীশ্রীযোগিরাজ গম্ভীরনাথ স্তোত্রম্।

ওঁ ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্ ।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি ॥

আনন্দমানন্দকরং প্রসন্নং
জ্ঞানস্বরূপং নিজবোধযুক্তম্ ।
যোগীন্দ্রমীড্যং ভবরোগবৈদ্যং
শ্রীমদ্‌গুরুং নিত্যমহং ভজামি ॥

প্রশান্তং নিরহংভাবং নির্ম্মানং মুক্তমৎসরম্ ।
প্রসন্নবদনং সৌম্যং যোগিরাজং নমাম্যহম্ ॥

হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগকামলেশবিবর্জ্জিতম্ ।
আত্মনাত্মনি সন্তুষ্টং যোগিরাজং নমাম্যহম্ ॥

উদাসীনবদাসীনং সদাত্মদৃষ্টিসংযুতম্ ।
ঈপ্সয়ানীপ্সয়া হীনং যোগিরাজং নমাম্যহম্ ॥

সমদুঃখসুখং স্বস্থং সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনম্ ।
সমনিন্দাস্তুতিং ধীরং যোগিরাজং নমাম্যহম্ ॥

জরাং ব্যাধিং বিনাশং চ সম্পদমাপদং তথা ।
রম্যান্তরৈব ভুঞ্জানং যোগিরাজং নমাম্যহম্ ॥

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ ॥
রজস্তমোবিযুক্তং তং যোগিরাজং নমাম্যহম্ ॥
সর্ব্বেচ্ছাঃ সকলাশ্চিন্তাঃ সর্ব্বেহাঃ সকলাঃ ক্রিয়াঃ
চিন্তাগ্নির্ব্বাসিতা যেন যোগিরাজং নমাম্যহম্ ॥
সংসারাড়ম্বরাঃ সর্ব্বে যস্যান্তর্ব্বর্ত্তিদৃষ্টিষু ।
স্বপ্নবদ্ ভাসমানাস্তং যোগিরাজং নমাম্যহম্ ॥
সর্ব্বত্র বিগতস্নেহং সর্ব্বত্র সমদর্শনম্ ।
সর্ব্বত্র প্রেমবন্তং চ যোগিরাজং নমাম্যহম্ ॥
নিঃশেষিতজগৎকার্য্যং পরিপূর্ণমনোরথম্ ।
লোকহিতায় সক্রিয়ং যোগিরাজং নমাম্যহম্ ॥
অহেতুককৃপাসিন্ধুং প্রেমপূর্ণ বিলোকনম্ ।
সর্ব্বজীবহিতাশংসং যোগিরাজং নমাম্যহম্ ॥
ক্রূরপ্রকৃতয়ঃ সর্ব্বে সর্পব্যাঘ্রাদয়োঽপি হি ।
প্রেম্না বশীকৃতা যেন যোগিরাজং নমাম্যহম্ ॥
অন্তর্গূঢ়মহৈশ্বর্য্যং বিহরন্তমনীশবৎ ।
সুসংবৃতমহাশক্তিং যোগিরাজং নমাম্যহম্ ॥
বিশ্বমাত্মনি পশ্যন্তং সর্ব্বজ্ঞানসমন্বিতম্ ।
প্রাকৃতবচ্চরন্তং তং যোগিরাজং নমাম্যহম্ ॥
ভবব্যাধিচিকিৎসার্থং দীনানামনুকম্পয়া ।
আচার্য্যত্বং স্বীকুর্ব্বাণং যোগিরাজং নমাম্যহম্ ॥
আকৃষ্য সাদরং ক্রোড়ে আতুরাণি মনাংসি বৈ ।
জ্ঞানামৃতপ্রদাতারং যোগিরাজং নমাম্যহম্ ॥

সচিত্তত্বেঽপি নিশ্চিত্তং সক্রিয়ত্বেঽপি নিষ্ক্রিয়ম্ ।
দেহস্থত্বেঽপি ব্রহ্মস্থং যোগিরাজং নমাম্যহম্ ॥
লব্ধ্বাপি ব্রহ্মনির্ব্বাণং ভক্তচিত্তে প্রকাশিতম্ ।
সর্ব্বগং সচ্চিদানন্দং যোগিরাজং নমাম্যহম্ ॥
যাবতীর্ব্বাসনাস্ত্যক্ত্বা দীনকল্যাণবাসনা ।
পোষিতা হৃদি গম্ভীরে গম্ভীরাত্মন্ নমোঽস্তু তে ॥
অনাথা বহবো নাথ নাথবন্তস্ত্বয়া বিভো ।
গম্ভীরনাথ মন্নাথ নাথযোগিন্ নমোঽস্তু তে ॥
কায়েন মনসা বাচা নমস্কারং বিনা প্রভো ।
সাধনং নৈব জানামি ভূয়ো ভূয়ো নমোঽস্তু তে ॥
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্ব্বত
এব সর্ব্ব ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো
নমস্তে ॥
ত্বন্নিবেদিতসর্ব্বস্বঃ ত্বদ্ধ্যানসুধয়াপ্লুতঃ ।
কদানন্দময়ো ভূত্বা ত্বয়ি স্থাস্যাম্যহর্নিশম্ ॥
ইতি—শ্রীশ্রীযোগিরাজগম্ভীরনাথস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।
ওঁ তৎসৎ ॥

প্রকাশকের নিবেদন।

জীবন ও জীবনী—দুইটী পরস্পরের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইলেও পরস্পর হইতে পৃথক্। জীবন ভিতরের, জীবনী বাহিরের। জীবন বিম্ব, জীবনী প্রতিবিম্ব। জীবন আসল, জীবনী তাহার নকল। কোন ব্যক্তিবিশেষ স্বরূপতঃ যাহা, তাঁহার অন্তরাত্মা যথার্থতঃ যেভাবে অভিব্যক্ত হয়, তাহাই তাঁহার জীবন। তিনি বিশিষ্ট দেশ কাল ও অবস্থার মধ্যে পড়িয়া যেসব কাজ করেন এবং তাঁহার আবেষ্টনের উপর সাময়িক ভাবে যেরূপ প্রভাব বিস্তার করেন, তাহা দ্বারা তাঁহার জীবনী গ্রথিত হয়। জীবনী মূলতঃ জীবনেরই বহির্বিকাশ হইলেও, তারমধ্যে অনেক ভেজাল জিনিষ মিশান থাকে; অবস্থা বিশেষে তার চেহারা অনেক সময় এমন আকার ধারণ করে যে, তাহা দ্বারা জীবনটী ঢাকা পড়িয়া যায়; বাহিরের কার্য্যাকার্য্য ও অবস্থা-পুঞ্জের মধ্য হইতে যথার্থ জীবনটীকে চিনিয়া লওয়া দুষ্কর হইয়া থাকে। খাঁটী মানুষের—সার্থকনামা মহাজনদের—আভ্যন্তরীণ জীবনটীই মানব সমাজের নিকট চিরকাল স্থায়ী অমূল্য সম্পৎ, এবং তাহার একটি সুস্পষ্ট ও জীবন্ত চিত্র রাখিতে পারিলে দেশ কাল ও অবস্থার পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও চিরদিনই তাহা মানব প্রাণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু তাঁহাদের বড় ছোট

কার্য্যাবলী, তাঁহাদের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধীয় মতামত প্রভৃতি বাহিরের জিনিষগুলি সম্পূর্ণই সময়ের অধীন, বিশেষ প্রকার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরেই তাহাদের মূল্য নির্ভর করে। অথচ, আমাদের মত বহির্মুখীন লোকসমূহ মহাপুরুষগণের জীবনী জানিবার জন্য যত লালায়িত, তাঁহাদের জীবন বুঝিবার জন্য ততটা কৌতুহলী ও প্রযত্নশীল নহে।

শ্রীশ্রীবাবা গম্ভীরনাথজী যখন স্থূল দেহে বিদ্যমান ছিলেন, তখন কয়েকবার আমরা তাঁহার নিকট তাঁহার জীবনী লিখিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলাম, এবং তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের ও সাধনজীবনের ঘটনাবলী ও অবস্থাপুঞ্জ শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলাম। তিনি সর্ব্বদা স্থিরাসনে অন্তর্নিবদ্ধ দৃষ্টি হইয়াই অবস্থান করিতেন, এবং তাঁহার শ্রীমুখের দু একটি কথা পাওয়াও নিতান্ত সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়াই বিবেচিত হইত। নেহাৎ পীড়াপীড়ি করিলে তিনি গম্ভীর ভাবে বলিতেন, "জীবনীসে ক্যা হোগা" অথবা "প্রপঞ্চসে ক্যা হোগা"? এ কথার সম্যক্ তাৎপর্য্য তখন বুঝিতে পারি নাই, এবং এখনও যে প্রাণে প্রাণে বুঝি, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু তিনি আমাদিগকে সর্ব্বদা ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন যে, জীবনী জানার চেষ্টা অপেক্ষা—জীবনের আনুসঙ্গিক কতকগুলি অবান্তর বাহ্যিক ঘটনার অনুসন্ধান ও তাহা নিয়া সময়ক্ষেপ অপেক্ষা—আভ্যন্তরীণ জীবনটাকে স্বকীয় সাধনার সাহায্যে হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিবার চেষ্টা অনেক ভাল,

এবং তাহাই কল্যাণের পথ। নকল নিয়া থাকা অপেক্ষা আসলকে ধরিবার জন্যই প্রযত্ন করা উচিত।

কিন্তু আমাদের জীবনের অধিকাংশ সময় ও শক্তি নকল নিয়াই ব্যাপৃত; শুধু নকল নয়, নকলের নকল নিয়াই প্রধানতঃ আমরা আছি। কেবলমাত্র এক বিষয়ে নকলকে ছাড়িবার চেষ্টা করিলে কি হইবে? এই নকলকে বাদ দিলেই কি আসলকে ধরা যাইবে? বিশেষতঃ যে নকলের মধ্যে আসলের ছাপ কতক কতক লাগিয়া থাকিবার কথা, যে নকলকে অবলম্বন করিয়া আসল সম্বন্ধে অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও ধারণা জন্মিবার সম্ভাবনা আছে, সেই নকলকে বাদ দিলে বাস্তবিকই লোকসান। আসল ধরিতে না পারিয়া তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট নকলকেও ত্যাগ করিলে যে তাহাকে ধরিবার সম্ভাবনা আরও সুদূরপরাহত হওয়ার আশঙ্কা। আর যাঁহারা আসলকে ধরিতে পারিয়াছেন, সেই সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ নকলের মধ্যে আসলের বিবিধ বিলাসই দেখিয়া আনন্দসম্ভোগ করিতে পারেন।

এতদ্ভিন্ন, শ্রীশ্রীনাথজীর এমন অনেক শিষ্য আছেন, যাঁহারা একবারের বেশী তাঁহাকে দেখিবারও সৌভাগ্য লাভ করেন নাই, এবং কাজেই তাঁহার জীবনটীকে ধারণার মধ্যে আনিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবার বিশেষ সুবিধাও প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার শিষ্য ব্যতীত আরও অনেক ভক্ত ও ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি—যাঁহারা তাঁহার নাম ও অনন্য সাধারণ মাহাত্ম্যের কথা অনেক শুনিয়াছেন, কিন্তু সঙ্গ করিবার বা তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ

কিছু জানিবার সুবিধা পান নাই,—তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত ও উপদেশবাণী শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। এই সব কারণে তাঁহার দেহান্তের কিছুকাল পর হইতেই তাঁহার একখানি জীবনীর আবশ্যকতা অনেকে বোধ করিতে লাগিলেন, এবং অনেকে তজ্জন্য উৎকণ্ঠার সহিত নাথজীউর যোগ্যতর শিষ্যদিগকে অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এমতাবস্থায় অনেক গুরুভ্রাতা একমত হইয়া আমাদের বর্ত্তমান গ্রন্থকারের উপর শ্রীশ্রীগুরুদেবের একখানা জীবনী লিখিবার ভার অর্পণ করেনে। তিনি গ্রন্থকাররূপে আত্মপ্রকাশ করিতেই অসম্মত;—তারপর, জ্ঞানে, প্রেমে, শক্তিতে, আত্ম-স্থিতিতে অতুলনীয় এইরূপ একজন পরিপূর্ণ মহাপুরুষের কর্ম্ম-বাহুল্যবিহীন জীবন অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ লিখিবার সাহস করা তিনি আগুন নিয়া খেলা করার মতই যেন বোধ করিয়া কুণ্ঠিত হইলেন। কিন্তু ঠাকুর যাহাকে দিয়া যাহা করাইবেন তাহার তাহা না করিয়া উপায় কি? তিনি প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও, সম্মানার্হ গুরুভাইদের সম্মান রক্ষার্থে এবং বন্ধুদের আগ্রহাতিশয্যে এই কার্য্যে হাত দিতে রাজী হইলেন। তখন এটী তাঁহার সাধনার অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইল। তথাপি চলিতে চলিতে অনেকবার তিনি কুণ্ঠাবশতঃ একার্য্যে বিরত হইয়াছেন, আবার বন্ধুদের তাড়নায় আরম্ভ করিয়াছেন।

আমরা সাধারণতঃ জীবনী বলিতে যাহা বুঝি, এবং সাধারণতঃ জীবনী যেভাবে লিখিত হইয়া থাকে, তাহাতে এই

'প্রসঙ্গ'কে ঠিক ঠিক জীবনী বলা যায় কিনা সন্দেহ। গ্রন্থকার শাস্ত্র, মহাপুরুষ বাণী ও স্বীয় অনুভূতি ও বিচারের সাহায্যে মহাপুরুষের জীবনটীই ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং মাঝে মাঝেই পাঠকবর্গকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, এসব প্রসঙ্গ মহাপুরুষের লোকোত্তর জীবনটী বুঝিবার জন্য ইঙ্গিত মাত্র, তাহার সম্যক্ পরিচয় নয়। তিনি লিখিয়াছেন, "জীবন দ্বারাই জীবন চিনিতে হয়, বহির্দৃষ্টিপরায়ণ স্থূলবুদ্ধি দ্বারা নয়।" ক্রিয়া কলাপ ও বাহ্যিক ঘটনাপরম্পরা প্রভৃতি যেসব উপকরণ দ্বারা জীবনী রচিত হয়, বাবা গম্ভীরনাথের ব্যাবহারিক জীবনে স্বভাবতঃই সে সকলের অভাব। তৎসত্ত্বেও লেখক যে পরিমাণ উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার অনেকাংশ তিনি অবান্তরবোধে পরিহার করিয়াছেন, এবং মহাপুরুষের আদর্শ জীবনের একটি আলেখ্য অঙ্কিত করিবার জন্য বাহ্যিক ঘটনা ও অবস্থার সাহায্য যতটুকু আবশ্যক, ততটুকুই তিনি স্বেচ্ছায় ও সবিচারে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য জীবনী বর্ণন করা নয়, যথার্থ জীবনটীকে বিচারশীল ও হৃদয়বান্ ধর্ম্ম-পিপাসুদের নিকট উপস্থিত করা।

গ্রন্থখানি শেষ করিয়াও গ্রন্থকার ইহার মুদ্রণ ও প্রকাশের জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করিতেছিলেন না। এবিষয়ে তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসাবাদ হইলে, তিনি স্পষ্ট বলিতেন যে, তাঁহার উপর যে ভার ছিল, তাহা বহন করিয়া তিনি খালাস,—তিনি শ্রদ্ধার্হ সতীর্থদের অনুরোধ রক্ষার্থ এবং নিজের চিত্ত-

শুদ্ধির নিমিত্তই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইহার মুদ্রণ ও প্রকাশ বিষয়ে তাঁহার কোন হাত আছে বা সামর্থ্য আছে কিংবা দায়িত্ব আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না।

এইভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ায় এবং অন্য কোন স্থান হইতে কোনরূপ চেষ্টা না হওয়ায়, আমরা আমাদের নিতান্ত ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া মফঃস্বলের একটি অতি ক্ষুদ্র সহরে অবস্থিত থাকিয়াও, সাহসপূর্ব্বক এই মুদ্রণ ও প্রকাশের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম। এক্ষেত্রেও তাহাই মনে হইল যে, ঠাকুর যাহাকে দিয়া যাহা করাইবেন, তাহার তাহা না করিয়া উপায় কি? এবং তাহা সম্পাদন করিবার শক্তিও তিনিই দিবেন বৈ কি?

'আমরা' বলিতে, সর্ব্বপ্রথমে আমার শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা, ফেণী বরদা প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন দাস মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি গুরুভক্তির প্রেরণায় স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মুদ্রণ কার্য্যের সর্ব্ববিধ দায়িত্ব নিজে বহন করিতে অগ্রসর না হইলে, এই কার্য্য এখানে সম্পাদন করার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। তিনি নানা প্রকার শারীরিক ও পারিবারিক বিপদ্ আপদ্ অগ্রাহ্য করিয়া এবং আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করিয়া গুরুসেবা বুদ্ধিতে এই কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার এইসব বিপদ্ আপদ্ না হইলে, সম্ভবতঃ মুদ্রণ কার্য্যে যেসব ভুলপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে, তাহা থাকিত না। যাহা হউক, তিনি ও তাঁহার অনুপ্রাণনায় অনুপ্রাণিত প্রেসের ম্যানেজার প্রমুখ সকল

কর্ম্মচারী ভক্তিপূতচিত্তে অতিশয় প্রেমের সহিত নিজকার্য্যবোধে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত মুদ্রণ ব্যাপার সমাধা করিয়াছেন। সাধারণ রীতির বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগকে মৌখিক ধন্যবাদ দিতে গেলে তাঁহাদের প্রতি অন্যায় করা হইবে। তাঁহাদের এই আন্তরিক পূজা ঠাকুর সাদরে গ্রহণ করুন, ইহাই প্রার্থনা করি।

শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় বাবাজীর দেহান্তের পর সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার সম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিয়া আমাদিগকে উপকৃত করিয়াছিলেন। তিনি আমাদের গ্রন্থকারকে তাঁহার পুস্তিকা হইতে ইচ্ছামত যে কোন অংশ উদ্ধৃত করিতে অনুমতি দিয়া আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত ভুপতি চন্দ্র দত্ত বি, এ, ও শ্রীযুত মোহিনী মোহন বর্ম্মন্ বি, এল্, পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা সম্বন্ধে গ্রন্থকারকে অতিশয় প্রেমের সহিত বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। প্রেমাস্পদ শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র কাব্যতীর্থ মহাশয় প্রুফ সংশোধন বিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। শ্রদ্ধার্হ শ্রীযুত পবিত্র নাথ দাস এবং প্রীতিভাজন শ্রীমান্ গোপেশ চন্দ্র ও শান্তকুমার দাস নিজ ব্যয়ে কয়েকখানা ব্লক তৈয়ারী করাইয়া দিয়াছেন। তাহাদের সকলকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

অবশেষে পাঠকবর্গের নিকট আমাদের করযোড়ে বিনীত নিবেদন এই যে, লেখক যে ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া গ্রন্থখানি

লিখিয়াছেন, এবং আমরাও যে ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া ইহার মুদ্রণ ও প্রকাশের কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি, তাঁহারা যেন গ্রন্থখানা সেই ভাবেই গ্রহণ করেন, এবং লেখক, মুদ্রক ও প্রকাশকের দোষ ত্রুটী অনুগ্রহ পূর্ব্বক উপেক্ষা করিয়া ও সদয় সহানুভূতির চক্ষে দেখিয়া প্রসঙ্গের ঈপ্সিত অনুধাবন পূর্ব্বক আলোচ্য জীবনটী নিজেদের জীবন দ্বারা উপলব্ধি করিতে যত্নবান্ হন। তাহা হইলেই আমাদের সেবা গৃহীত হইল বলিয়া নিজে কৃতার্থ বোধ করিব।

শ্রীশ্রীনাথজীর উপদেশামৃতের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত আছে। তাঁহার কৃপা দৃষ্টি হইলে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

ফেণী,
রাসপূর্ণিমা
১৩৩২ বঙ্গাব্দ

বিনীত
শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রকাশক।

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

শ্রীশ্রী[illegible]-

গম্ভীরনাথ প্রসঙ্গ

যোগিগুরু গোরক্ষনাথ

ভারতবর্ষে বিভিন্ন যুগে যে সকল অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া স্বকীয় সাধনার প্রভাবে ও মাধুর্য্যে সনাতনী ভারতীয়-সাধনার ধারাটিকে আভ্যন্তরীণ কলুষতা ও বিজাতীয় আক্রমণ হইতে মুক্ত করিয়া ক্রমশঃ অধিকতর নির্ম্মল, গম্ভীর, প্রশস্ত, শক্তিসম্পন্ন ও মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন, যোগিগুরু গোরক্ষনাথ তাঁহাদের অন্যতম। হিমালয়ের দুর্গম পার্ব্বত্যপ্রদেশসমূহ হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূর রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত এবং বঙ্গদেশের পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া আফগানিস্থান পর্য্যন্ত, ভারতের সর্ব্বত্র এবং ভারতবহির্ভূত অনেক স্থানে গোরক্ষনাথের অলৌকিক প্রভাবের নানারূপ পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে তাঁহার সম্বন্ধে যে কত প্রকার প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।* গোরক্ষনাথের স্বরচিত গ্রন্থসমূহ এবং তাঁহার সম্প্রদায়ের গ্রন্থাবলী

---

* No legend is more popular in Northern India than that of Guga, of which several versions have been published. Here not only is Gorakhnath the wonder-working saint, who is responsible for the birth of the hero, he is also the "Deus ex machina" who ever and anon appears to help him. It is in this story that with this object he bends even fate to his will. So also in other

ব্যতীত অন্যান্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ভাষায় রচিত নানা-জাতীয় গ্রন্থের মধ্যেও নানা ভাবে তাঁহার আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্মের কথা এবং তাঁহার অলৌকিক যোগৈশ্বর্য্য ও জীবপ্রেম সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। তিনি যে সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার প্রসার ও প্রতিপত্তি বর্ত্তমানেও সামান্য নহে। এসকল সত্ত্বেও তাঁহার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তত্ত্ব অতি সামান্যই নিশ্চিতরূপে অবধারিত হইয়াছে।

যোগিরাজ গোরক্ষনাথ কখন কোথায় কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আধুনিক ঐতিহাসিকগণ তাহা আবিষ্কার করিবার জন্য নানারূপ গবেষণার গহনবনে প্রবেশ করিয়াও এখন পর্য্যন্ত কোন অকাট্য প্রমাণ লইয়া বাহির হইতে পারেন নাই। গোরক্ষ-নাথের সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুগণের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে যে, তিনি ত্রেতাযুগ হইতে বিদ্যমান আছেন। ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র তাঁহার নিকট যোগসম্বন্ধীয় উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ব্যাস, হনুমান, প্রভৃতির ন্যায় অমর, এবং সূক্ষ্ম শরীরে এখনও লোকহিতার্থে নানা স্থানে বিচরণ করিয়া থাকেন। আর একটি প্রবাদ অনুসারে

---

important folk-tales, such as those of Puran Bhakat and of Raja Rasatu, he takes a most prominent part. In fact in the popular religion of India he is the representative of Siva, or even a form of that God himself.

Goraknath has long been deified in India proper, and legend gives him omnipotence. He can coerce even Brahma, the God of Fate, and command Him to alter a person's destiny. Sometimes he is shown as greater even than Siva himsilf.

—Encyclopaedia of Religion & Ethics.

তিনি সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই চারিযুগেই বর্ত্তমান আছেন। এক এক যুগে এক এক স্থানে তাঁহার বিশেষ আবির্ভাব হয়।* সম্প্রদায় বহির্ভূত বিচারশীল ব্যক্তিগণ অবশ্য এই সকল প্রবাদকে ঐতিহাসিক তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিতে স্বভাবতঃই কুণ্ঠিত হন।

কবীরের জনৈক শিষ্যকৃত "গোরক্ষনাথকী গোষ্ঠী" নামক হিন্দীগ্রন্থে গোরক্ষনাথের সহিত কবীরের কথোপকথন দেখিয়া এবং কবীর কৃত "বীজেক" নামক পুস্তকের নানা স্থানে গোরক্ষনাথের প্রসঙ্গ দেখিয়া কোন কোন পণ্ডিত তাঁহার জীবনকাল চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এ প্রমাণও অকাট্য নয়। পূর্ব্ববতন প্রভাবশালী ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক একজন মহাপুরুষের সহিত কয়েক শতাব্দী পরবর্ত্তী নূতন ধর্ম্মপ্রচারক একজন মহাপুরুষের অলৌকিক অথবা কাল্পনিক কথোপকথন ধর্ম্মগ্রন্থসমূহে নিতান্ত বিরল নহে। বিশেষতঃ কবীরের একটি দোঁহায় এরূপ কথাও আছে যে ব্যাস, গোরক্ষ প্রভৃতি মহাত্মগণ কখন কোথায় কি ভাবে থাকেন, তাহা কেহই বলিতে পারে না। ইহাতে মনে হয় যে কবীরও তাঁহাকে বহুকালপ্রসিদ্ধ যোগৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া জানিতেন, এবং তিনি অলৌকিক শক্তিবলে সাধারণের অলক্ষিত ভাবে বিচরণ করেন, এরূপ বিশ্বাস করিতেন। হয় ত তিনি অলৌকিক ভাবে তাঁহার দর্শনলাভও করিয়া থাকিতে পারেন।

---

* The local tradition is that Goraknath is identical with the supreme Being. In the Satya yuga he lived in the Punjab, in the Treta yuga at Gorakhpur. in the Dvapara yuga at Hurmuj and in the Kali yuga at Gorakhmandi in Kathiwar.

পশ্চিম ভারতে একটি প্রবাদ আছে যে, সিদ্ধযোগী ধর্ম্মনাথ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে কচ্ছ প্রদেশে যোগধর্ম্ম প্রচার করেন এবং তিনি যোগিগুরু গোরক্ষনাথের সতীর্থ। তদনুসারে গোরক্ষনাথও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান হয়।

মহারাষ্ট্রীয় মহাপুরুষ জ্ঞানেশ্বর মহারাজের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহার গুরু শ্রীনিবৃত্তিনাথজী শ্রীমদ্গৈনীনাথের শিষ্য, এবং গৈনীনাথজী যোগিগুরু গোরক্ষনাথের নিকট উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। জ্ঞানেশ্বর মহারাজ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন, এবং তিনি এই যুগের সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্মসংস্কারক বলিয়া মহারাষ্ট্রদেশে পরিচিত। ইহা হইতে অনুমান হয় যে গোরক্ষনাথজী দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

বঙ্গীয় সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় 'ময়নামতীর গান,' 'গোবিন্দচন্দ্রের গান' 'গোরক্ষবিজয়,' 'ধর্ম্মমঙ্গল' প্রভৃতি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গোরক্ষনাথ একাদশ শতাব্দীর লোক। স্বনামধন্যা রাণী ময়নামতী গোরক্ষনাথের শিষ্যা ছিলেন। তিনি মেহেরকুলের (ত্রিপুরার) রাজা তিলকচন্দ্রের কন্যা। তাঁহার স্বামীর নাম মাণিকচন্দ্র। মাণিকচন্দ্র শ্বশুরের রাজ্য ত্রিপুরা ও পৈতৃক রাজ্য বিক্রমপুরের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি একাদশ শতাব্দীতে রাজত্ব

বাবু বিশ্বাস করেন। অবশ্য এই সম্বন্ধে মতভেদ আছে। প্রসিদ্ধ

রাজা গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার পুত্র। ইনি গোবিচন্দ্র বা গোপীচন্দ্র নামেও প্রথিত হইয়াছেন। গোবিন্দচন্দ্রের গাথা ভারতবিখ্যাত। তাহাতে দেখা যায় যে গোবিন্দচন্দ্রের মাতা ময়নামতীর কৈশোর অবস্থায় যোগিগুরু গোরক্ষনাথ তিলকচন্দ্রের রাজভবনে পদার্পণ করেন, এবং কৃপা-পরবশ হইয়া বালিকা বয়সেই ময়নামতীকে দীক্ষা প্রদান করেন ও মহাজ্ঞান শিক্ষা দেন। ময়নামতী তাঁহার গুরুদত্ত নাম; তাঁহার পিতৃদত্ত নাম ছিল 'শিশুমতি'। ময়নামতীই পরবর্ত্তী কালে গোবিন্দচন্দ্রকে অষ্টাদশ বৎসর বয়সে গোরক্ষ-নাথের অন্যতম শিষ্য মহাজ্ঞানী হাড়িসিদ্ধার নিকট দীক্ষা গ্রহণ-পূর্ব্বক দ্বাদশ বৎসরের জন্য সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে বাধ্য করেন। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, গোরক্ষনাথ দশম ও একাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

নেপালের ইতিহাস আলোচনা করিয়া প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত সিল্‌ভ্যাঁ লেভি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তিনি রাজা নরেন্দ্রদেবের সমসাময়িক এবং সপ্তম শতাব্দীর লোক। কিন্তু নেপালে প্রচলিত অপর একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ অনুসারে, গোরক্ষনাথ চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে নেপালের বৌদ্ধ রাজা মহীন্দ্রদেবকে পদচ্যুত করিয়া নিজ স্নেহাস্পদ সেবক বসন্তদেবকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

আচার্য্য শঙ্করের জীবনীপাঠে অবগত হওয়া যায় যে গোরক্ষ-নাথ তাঁহার পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন।

রাজা ভর্ত্তৃহরি গোরক্ষনাথের শিষ্য, এবং নাথ সম্প্রদায়ের একটি শাখাও রাজা ভর্ত্তৃহরি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। তিনি রাজা

বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা বলিয়া প্রবাদ আছে। বিক্রমাদিত্য হইতে বিক্রম-সংবৎ গণিত হয়। এতদনুসারে গোরক্ষনাথকে খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর লোক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। অনেক পণ্ডিত ভর্ত্তৃহরিকে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক, অপর কেহ কেহ তাঁহাকে চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর লোক মনে করেন; তদনুসারে গোরক্ষনাথকেও সপ্তম, পঞ্চম বা চতুর্থ শতাব্দীর লোক মনে করা যাইতে পারে। গোরক্ষনাথের জীবিতকাল সম্বন্ধে এই প্রকার বহুসংখ্যক মত প্রচলিত আছে। বাহুল্যভয়ে সে সকল আলোচিত হইল না। কোন কোন পাশ্চত্য পণ্ডিত এইরূপ মতভেদ দেখিয়া গোরক্ষনাথ নামে কোন ব্যক্তি ছিলেন, কি স্বয়ং শিবকেই ভক্তগণ গোরক্ষনাথরূপে বর্ণন করিয়াছেন—এ বিষয়ে পর্য্যন্ত সন্দেহ উত্থাপন করিয়াছেন। মোট কথা, গোরক্ষনাথের সময় সম্বন্ধে এখনও কোন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতেছে না।

আবির্ভাবকালের ন্যায় তাঁহার জন্মস্থানও অনিশ্চিত। শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের অনুমান এই যে, তিনি পঞ্চনদে জলন্ধর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। জ্ঞানেশ্বর লিখিত যোগিসম্প্রদায়াবিষ্কৃতি নামক মহারাষ্ট্রীয় গ্রন্থ অনুসারে গোদাবরী প্রদেশান্তর্গত চন্দ্রগিরি নগর তাঁহার জন্মভূমি। তাঁহার পিতা বশিষ্ঠ-গোত্রজ সূরয নামক ব্রাহ্মণ, এবং মাতার নাম সরস্বতী দেবী। তাঁহার মাতা মৎস্যেন্দ্রনাথের কৃপাপাত্রী ছিলেন এবং মৎস্যেন্দ্রনাথের কৃপাতেই এই পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে

এই পুত্র মৎস্যেন্দ্রনাথের নিকট যোগ-দীক্ষা ও যোগিবেশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার অনুগমন করেন।

দীনেশ বাবু বলেন যে, গোরক্ষনাথ মীননাথের শিষ্য, এবং মীননাথের বাড়ী বাখরগঞ্জে ছিল বলিয়া তাঁহার ধারণা। 'হঠযোগ প্রদীপিকা'য় নাথ সম্প্রদায়ের সিদ্ধ যোগিগণের যে তালিকা আছে, তাহাতে মীননাথের পরেই গোরক্ষনাথের নাম দৃষ্ট হয়। কিন্তু গোরক্ষনাথ ও কবীরের কথোপকথনাত্মক প্রবন্ধে তিনি

"আদিনাথকে নাতি, মচ্ছেন্দ্রনাথকে পুত।
মৈঁ যোগী গোরখ্ অবধূত ॥"

বলিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই 'নাতি' এবং 'পুত' শব্দদ্বয় যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা গৃহত্যাগী সাধুদের পরিচয় প্রদানের সাধারণ রীতি হইতেই অনুমান করা যায়। ইহাতে মনে হয় তিনি মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য। জনসাধারণের নিকটও তিনি মহাসিদ্ধ যোগিরাজ মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য বলিয়াই পরিচিত। পূর্ব্বোক্ত তালিকায় মৎস্যেন্দ্রনাথের পরে পঞ্চম স্থানে গোরক্ষনাথের নাম। কিন্তু তাহা হইতে তিনি মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য নন, ইহা প্রমাণিত হয় না।

গোরক্ষনাথের জন্ম সম্বন্ধে একটী গল্প প্রচলিত আছে, এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় 'নবনাথ-ভক্তিসার' নামক গ্রন্থে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। মৎস্যেন্দ্রনাথজী একদিন এক রমণীর নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রমণী তাঁহাকে একজন মহাতেজা সাধু বুঝিতে পারিয়া ভিক্ষা দানান্তে তাঁহার নিকট

পুত্রবর প্রার্থনা করিলেন। মৎস্যেন্দ্রনাথজী কৃপাপরবশ হইয়া তাহাকে কিছু বিভূতি-প্রসাদ প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন যে, এই বিভূতি সেবন করিলে যথাসময়ে তাহার পুত্ররত্ন লাভ হইবে। মহাপুরুষ বিদায় লইলে পর অন্যান্য রমণীগণ এ সম্বন্ধে তাহাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে থাকে। তাহাতে উত্যক্ত হইয়া রমণী ঐ বিভূতি-প্রসাদ ভক্ষণ না করিয়া গোরক্ষাতে (গোবর, আবর্জ্জনা প্রভৃতি ফেলিবার স্থানে) নিক্ষেপ করেন। বার বৎসর পরে মৎস্যেন্দ্রনাথজী পুনরায় আগমনপূর্ব্বক ঐ রমণীর নিকট ভিক্ষা চাহিলেন, এবং রমণী ভিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার পুত্র কোথায়?" বিভূতি সেবন করা হয় নাই শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন,—'আমার সেই সিদ্ধ বিভূতি হইতে নিশ্চয়ই এক অলোকসামান্য পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যেখানে সেই বিভূতি রক্ষা করিয়াছিলে, সেইখানে চল'। সেইখানে উপস্থিত হইয়া মৎস্যেন্দ্রনাথজী আহ্বান করা মাত্র দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক এক বালক গোরক্ষা হইতে উঠিয়া আসিয়া মৎস্যেন্দ্রনাথের নিকট দণ্ডায়মান হইলেন। এই গোরক্ষা হইতেই তাঁহার নাম গোরক্ষনাথ হয়। তিনি তখনই মৎস্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রস্থান করিলেন। এই গল্পটী অতিরঞ্জিত হইলেও ইহা হইতে অনুমান হয় যে, গোরক্ষনাথের মাতা মৎস্যেন্দ্রনাথের কৃপাতেই তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন এবং তিনি বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করেন।

তাঁহার নামকরণ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে তিনি বাল্যকাল

হইতে গো-সেবাতে অত্যধিক প্রীতিযুক্ত ছিলেন বলিয়া গোরক্ষনাথ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। কোন কোন মনীষী ব্যক্তি এরূপও অনুমান করেন যে, সমগ্র হিন্দু সম্বন্ধে গোসেবা ও গোরক্ষা যে এত বড় পুণ্যকার্য্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে—গোসেবা ও গোরক্ষা যে হিন্দু ধর্ম্মের একটি অবিসংবাদিত প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে—যোগিগুরু গোরক্ষনাথের প্রভাবই ইহার বিশেষ কারণ।

নেপাল অঞ্চলে গোর্খা নামে একটি জাতি আছে। তাহারা তাহাদের সাহস ও বীর্য্যের জন্য সর্ব্বত্র সুপরিচিত। তাহারা বলিয়া থাকে যে, গোরক্ষনাথজী নেপালে থাকিয়া দ্বাদশ বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার তপস্যার স্থান তাঁহারই নামে গোর্খা বলিয়া পরিচিত, এবং সেই স্থানের ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের অধিবাসিগণও তাঁহার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহার নামানুসারে গোর্খা বলিয়া আপনাদের পরিচয় প্রদান করে। তাহা হইতেই গোর্খা জাতির উৎপত্তি।* নাথ সম্প্রদায়ের সাধুগণ গোরক্ষপুরই গোরক্ষনাথের আদি সাধনক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এবং বলেন যে বর্ত্তমানে গোরক্ষনাথের যে আসনে নিত্য পূজার্চ্চনাদি হইয়া থাকে, সেই আসন তাঁহার তপস্যার সময় হইতেই

---

* ঐতিহাসিকগণ বলেন যে গোর্খাগণ বর্ত্তমান নেপাল প্রদেশের আদিম অধিবাসী নহে। তাহারা নিম্নস্থ সমতলভূমি হইতে নেপালে গমন পূর্ব্বক সেখানকার রাজাকে পরাজিত করিয়া রাজ্য অধিকার করে এবং ক্রমশঃ তাহারাই নেপালে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত জাতি হয়। সম্ভবতঃ গোরক্ষনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াই তাহারা শৌর্য্যবীর্য-সম্পন্ন হইয়াছিল, এবং গোরক্ষনাথের তেজে তেজিয়ান হইয়াই তাহারা নেপালের বৌদ্ধ রাজাকে পরাস্ত করিয়া সেখানে হিন্দুধর্ম্মের বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল। অন্যান্য কিম্বদন্তি এই মতের পোষকতা করে। বর্ত্তমানেও গোরক্ষনাথের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মই নেপালে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল।

সেখানে প্রতিষ্ঠিত আছে। গোরক্ষপুর সহর যে তাঁহারই নাম বহন করিতেছে, তাহা বলাই বাহুল্য। অন্য প্রবাদ অনুসারে তাঁহার প্রথম তপস্যার স্থান বদরিকাশ্রম। মৎস্যেন্দ্রনাথ নবীন সন্ন্যাসী গোরক্ষনাথকে লইয়া বদরিকাশ্রমে গমনপূর্ব্বক সেখানে তাঁহাকে দ্বাদশবর্ষব্যাপী কঠোর তপস্যায় নিয়োজিত করেন। সিদ্ধিলাভান্তে তিনি ধর্ম্মপ্রচারার্থে বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হন।

ভারতের সকল প্রদেশেই তাঁহার নামানুসারে অনেক স্থানের ও অনেক মন্দিরের নামকরণ হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে লিখিত আছে যে,—"পশ্চিমোত্তর প্রদেশে তাঁহার নামে নানা স্থানের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। পেশোয়ারে 'গোরক্ষ-ক্ষেত্র' নামে একটী স্থান আছে; আবুল ফজল নিজের গ্রন্থে তাহা উল্লেখ করিয়া যান। দ্বারকা সন্নিধানে অন্য একটি 'গোরক্ষ-ক্ষেত্র' ও হরিদ্বারে ইহাদের একটী অতি শ্রদ্ধেয় সুড়ঙ্গ বিদ্যমান আছে; এই উভয়ই এই সম্প্রদায়ের তীর্থস্থান-বিশেষ। আর নেপালের পশুপতিনাথ প্রভৃতির মন্দির সমুদায়ও এই সম্প্রদায়-সংক্রান্ত। কলিকাতার এদিকে দমদমার সন্নিকট 'গোরখ্‌বাসলি' (গোরক্ষ-বংশী) নামে একটি স্থান আছে। তথায় তিনটী মানুষের মূর্ত্তি, ও শিব, কালী, হনুমান, প্রভৃতি কতকগুলি দেবতার প্রতিমূর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রথমোক্ত তিনটী নরমূর্ত্তি দত্তাত্রেয়, গোরক্ষনাথ ও মৎস্যেন্দ্রনাথের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। গোরক্ষপুর ইহাদের প্রধান স্থান।" এতদ্ভিন্ন পঞ্জাব প্রদেশে জেলম জিলায় গোরখটিলা, গিরনারে গোরখমাঢ়ী, গোয়ার নিকটে গোরখকাজুলি,

মেবারের একলিঙ্গ শিব মন্দির, ত্রিবেণীর নিকটে মহানাদ নামক গ্রামে জটেশ্বর শিব মন্দির, নেপালের উত্তরে চন্দ্রনাথ, প্রভৃতি অসংখ্য স্থান ও মন্দির গোরক্ষনাথ কর্ত্তৃক বা তাঁহার নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত। কালীঘাটের কালীও গোরক্ষনাথ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ, বিরূপাক্ষনাথ ও স্বয়ম্ভুনাথ এবং মহেশখালি দ্বীপের আদিনাথ, প্রভৃতিও তৎকর্ত্তৃক বা তৎসম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অনুমিত হয়। নাথ-সম্প্রদায়ের আদি গুরুর নামও আদিনাথ। তিনি শিব হইতে অভিন্ন বলিয়া নাথযোগিগণ বিশ্বাস করেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে গোরক্ষনাথের জন্মস্থান যেখানেই হউক, তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র সমগ্র ভারতব্যাপী। কেবল ভারত নয়, তিব্বত, আফ্‌গানিস্থান, বেলুচিস্থান, পিনাং প্রভৃতি বহুস্থানে তাঁহার প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এখনও এইসব স্থানে গোরক্ষনাথ প্রবর্ত্তিত যোগিসম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক আশ্রম প্রতিষ্ঠিত আছে, গোরক্ষনাথের নিয়মিত সেবাপূজা প্রচলিত আছে, এবং অসংখ্য সাধু ও গৃহস্থ তাঁহার পতাকার নীচে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনে নিরত রহিয়াছে। বুদ্ধের পরে একমাত্র শঙ্করাচার্য্য ভিন্ন সমগ্র ভারতে আর কোন মহাপুরুষ এরূপ প্রভাব বিস্তার করেন নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। মহাপুরুষ শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় তিনিও শিবের অবতার বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন। উভয় মহাপুরুষই বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের সময়ে এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুত্থানের পূর্ব্বে

ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মের সুসংস্কৃত তত্ত্ব ও ভাব সকল প্রচার করিবার জন্য এবং হিন্দুসমাজকে উদার সার্ব্বজনীন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। উভয়ের প্রচারিত ধর্ম্মের উপরই বৌদ্ধ প্রভাব বিদ্যমান, উভয়েই বৌদ্ধধর্ম্মের নাস্তিকভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আস্তিকতার বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। উভয়েই সনাতন হিন্দুধর্ম্মের আস্তিকভাব ও আচারের সহিত বুদ্ধ-প্রচারিত উদারনীতির সামঞ্জস্য করিয়া ভারতীয় বৌদ্ধসমাজকে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে এবং হিন্দুসমাজকে নূতন-ভাবে গঠিত করিয়া তুলিতে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া-ছিলেন।

কিন্তু শঙ্কর ও গোরক্ষনাথের প্রচারের পদ্ধতি অনেকাংশে পৃথক ছিল। জ্ঞানিগুরু শঙ্কর প্রধানতঃ বেদান্ত-প্রচারক। তিনি উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষ্য রচনা করিয়া তাহার ভিতর দিয়া স্বীয়মত প্রচার করেন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান আচার্য্যদিগকে দার্শনিক বিচারে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদিগকে আপনার শিষ্যশ্রেণীভুক্ত করেন ও তাঁহাদিগকে তাঁহার বেদান্ত-মত প্রচার করিবার জন্য নিয়োজিত করেন, এবং ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থস্থানে স্বকীয় সম্প্রদায়ের মঠ স্থাপন করিয়া সেই সকলকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানের কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার প্রচারে অদ্ভুত মেধা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য ও সংগঠন শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার ধর্ম্মমত বুদ্ধিমান পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের বুদ্ধির উপর প্রভাব

বিস্তার করিয়াই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে এবং তাঁহাদের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ সমাজের নিম্নস্তরের অন্তঃকরণ তদ্‌ভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু যোগিগুরু গোরক্ষনাথের লোক-সংগ্রহের প্রণালী স্বতন্ত্র। তাঁহার প্রণালীর সহিত প্রাচীনযুগের বুদ্ধ ও বৌদ্ধাচার্য্যদিগের এবং পরবর্ত্তীযুগের চৈতন্য, কবীর, নানক প্রভৃতি গুরুগণের শিক্ষাপ্রণালীর সাদৃশ্য অনেক বেশী। তিনি সংস্কৃত ভাষায় কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তন্মধ্যে যে কয়েকখানা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রধানতঃ যোগেরই উপদেশ। গোরক্ষসংহিতা, গোরক্ষকল্প, গোরক্ষশতক, গোরক্ষসহস্র, যোগচিন্তামণি, যোগমহিমা, যোগসিদ্ধান্ত পদ্ধতি, বিবেকমার্ত্তণ্ড, চতুরশীতি আসন প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাদের অধিকাংশই প্রধানতঃ যোগ-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। গোরক্ষপিষ্টিকায় রসায়নের আলোচনা আছে। এ সকল পুস্তক জনসাধারণের জন্য নয়, এবং ইহাদের বহুল প্রচারও হয় নাই। বর্ত্তমান যুগেও এ সকল পুস্তক শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। সাধারণ লোক যোগসিদ্ধ গুরুর সাক্ষাৎ উপদেশ ব্যতীত কেবলমাত্র পুস্তক পড়িয়া হঠযোগ অভ্যাসের চেষ্টা করিলে তাহাতে সুফল অপেক্ষা কুফলের সম্ভাবনাই অধিক। গোরক্ষনাথ যদি কেবলমাত্র হঠযোগের গুরু হইতেন, তবে সমাজের সকল স্তরের লোকের মধ্যে তাঁহার প্রভাব এমন ভাবে বিস্তার লাভ করিত না। সেইরূপ ভগবান বুদ্ধ যদি কেবল-

মাত্র নির্ব্বাণপ্রদ অন্তরঙ্গ সাধনের উপদেষ্টা হইতেন, তবে জগতের এক-তৃতীয়াংশ লোক তৎপ্রবর্ত্তিত সংঘের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক কল্যাণ লাভ করিতে পারিত না। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যদি কেবলমাত্র অন্তরঙ্গ রস-সাধনার উপদেশ করিতেন, তবে আপামর জনসাধারণ তাঁহাকে আপনার প্রভু জানিয়া হৃদয়ে গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতার্থ হইতে পারিত না ; বেদান্তাচার্য্য শঙ্করও যদি কেবলমাত্র অন্তরঙ্গ আত্মজ্ঞান সাধনার আচার্য্য হইতেন, তবে তিনি হিন্দু সমাজের সংগঠন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না।

ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, যে মহাপুরুষ দার্শনিক যুক্তির সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে যত উচ্চ আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, এবং সেই আদর্শের সাহায্যে মানবের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনের জটিল-সমস্যাসমূহের যত সরল মীমাংসার উপায় শিক্ষা দিতে পারেন, সেই মহাপুরুষের শিক্ষা তত স্থায়ী হয় এবং ভবিষ্যদ্‌যুগের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের বুদ্ধিকে তত অধিক আকর্ষণ করিতে পারে। কিন্তু কোনও মহাপুরুষ যদি তাঁহার দার্শনিকতার অত্যুচ্চ-শিখরে আরূঢ় হইয়া সাধারণ লোকের দর্শন-স্পর্শনের অতীত অবস্থাতেই সর্ব্বদা অবস্থান করেন, তবে সাধারণ লোক তাঁহাকে আপনার আশ্রয়দাতা বলিয়া হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারে না ; তাঁহার প্রভাবও তাঁহার জীবিতকালে অধিক দূর এবং অধিক নিম্নস্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় না। সেই হেতু জীবদুঃখকাতর পরমকারুণিক বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, কবীর প্রভৃতি অন্যান্য যুগধর্ম্ম-প্রচারক মহাত্মাদের ন্যায়

যোগিরাজ গোরক্ষনাথও যোগধর্ম্মের 'সরল সংস্করণ' করিয়া তাহা বিভিন্ন প্রদেশের প্রচলিত কথ্য ভাষার সাহায্যে ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বত্র গমনাগমন করিয়া নিজের জীবনটীকেই আদর্শরূপে সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিতেন। রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ, সদাচারী, কদাচারী, পুরুষ, নারী, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, সমাজনেতা, সমাজবহিষ্কৃত,—সকলের নিকট যাতায়াত করিয়া, সকলের সহিত সমানভাবে মিলিত হইয়া, তিনি স্বীয় ধর্ম্মজীবনের আদর্শ দেখাইতেন, এবং পবিত্র উদার-নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন। কখন কখন তিনি ভোগাসক্ত বহির্মুখ জনমণ্ডলীকে যোগ ও জ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য বিস্ময়কর যোগৈশ্বর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক আধ্যাত্মিক শক্তির মাহাত্ম্য প্রখ্যাপন করিতেন। সকল শ্রেণীর লোকেই তাঁহাকে নিজ-জন বোধে গুরু ও ত্রাতা বলিয়া শ্রদ্ধা ও সমাদর করিত। তাঁহার প্রভাবে রাজমহিষী ময়নামতী এবং হাড়ির কর্ম্মে নিযুক্ত 'হাড়িসিদ্ধা' পরস্পরকে গুরুভাই ও গুরুভগ্নী বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন, এবং গোবিন্দচন্দ্রের ন্যায় রাজপুত্রও মহাজ্ঞানী হাড়ির মন্ত্রশিষ্য হইতেন।

এরূপ ভাবে যেসব মহাপুরুষ আচণ্ডালে প্রেম বিতরণ করেন, তাঁহারা তাঁহাদের জীবিতকালেই সমাজস্থ বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্কীর্ণতা ও হিংসা-বিদ্বেষ অনেক পরিমাণে বিদূরিত করিয়া সমাজকে উন্নতস্তরে উন্নীত করিয়া যান, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদের তিরোভাবের পরে কালক্রমে

তাঁহাদের প্রচারিত মতের সঙ্গে অশিক্ষিত সাধারণ লোকের নানা প্রকার সংস্কার মিশিয়া গিয়া সেই সকল মতকে এমন বিকৃত করিয়া ফেলে যে, আবর্জ্জনার মধ্য হইতে খাঁটি জিনিষটীকে বাছিয়া বাহির করা কষ্টকর হইয়া উঠে। এই শ্রেণীর আচার্য্যগণ সহজেই দেবতা বা অবতার বলিয়া প্রখ্যাপিত হন। তাঁহাদের জীবনের ঘটনাগুলি মুখে মুখে নানা প্রকার রঙে অতিরঞ্জিত হইয়া এমন আকারে প্রচারিত হয় যে, তাহারা ঐতিহাসিক তথ্য হারাইয়া কতকগুলি কিংবদন্তীতেই পর্য্যবসিত হয়, এবং ভবিষ্যৎকালের সত্যানুসন্ধিৎসুগণ তাহার মধ্যে কোনও সত্য আছে বলিয়া স্বীকার করিতে স্বভাবতঃই কুণ্ঠিত হন। তাঁহাদের ধর্ম্মের বিকৃতিও অপেক্ষাকৃত অল্পকালেই হয়, এবং তাঁহাদের সম্প্রদায়বর্ত্তী অশিক্ষিত লোকসমূহের মধ্যে ধর্ম্মের নামে নানা প্রকার ব্যভিচারও সহজেই প্রবেশ করে। এই কারণেই বোধ হয় গোরক্ষনাথের জীবনের ঘটনাবলী আবিষ্কার করা এত কঠিন। এই কারণেই তাঁহার সম্প্রদায়বর্ত্তী অশিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে যোগধর্ম্মের এত বিকৃতি ঘটিয়াছে।

বুদ্ধ, চৈতন্য, কবীর প্রভৃতি মহাত্মাদের প্রচারিত ধর্ম্মেও এরূপ বিকৃতি যথেষ্ট হইয়াছে। ইঁহারা প্রত্যেকেই অবতার বলিয়া পূজিত হইয়াছেন ও হইতেছেন, এবং ইঁহাদের প্রত্যেকের জীবন অবলম্বন করিয়াই বিবিধ প্রকার অদ্ভুত গল্পাবলি রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু বুদ্ধের পরবর্ত্তী বৌদ্ধাচার্য্যগণ এবং চৈতন্যের সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সংস্কৃত ভাষায় ও তৎকালে প্রচলিত দেশভাষায় সুযুক্তিপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী

দার্শনিক ও সাধ্য-সাধন-রহস্য-সমন্বিত মহামূল্য গ্রন্থনিচয় রচনা করিয়া তাঁহাদের বিশুদ্ধ ধর্ম্মমতসমূহ চিরস্থায়ী করিয়া রাখিয়াছেন। কবীরের কতকগুলি দোঁহাই প্রচলিত আছে, এবং সেগুলি সবই যে অবিমিশ্রভাবে তাঁহারই রচনা, তৎসম্বন্ধেও সন্দেহের কারণ আছে। কিন্তু গোরক্ষনাথের সম্প্রদায়ে কয়েকখানা হঠযোগের গ্রন্থ ব্যতীত সেরূপ কোন চিরকাল-স্থায়ী সর্ব্বজন-চিত্তাকর্ষক ও দার্শনিক-যুক্তিপূর্ণ গ্রন্থ লিখিত কি প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। সম্ভবতঃ তত্ত্বসম্বন্ধে তিনি বেদান্তমতই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার যোগ সম্বন্ধীয় গ্রন্থসমূহেও অদ্বৈত-সিদ্ধান্তই গৃহীত হইয়াছে। তাঁহার সম্প্রদায়ের পরবর্ত্তী মহাপুরুষগণও তত্ত্বোপদেশ প্রদানের সময় অদ্বৈত-তত্ত্বেরই উপদেশ দিয়া থাকেন। হয়ত এই কারণেই দার্শনিক গ্রন্থ না লিখিয়া তিনি সাধন-পদ্ধতি সম্বন্ধে সুবিস্তৃত উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হঠযোগ সাধারণ লোকের বুদ্ধিগম্যও নয়, চিত্তাকর্ষকও নয়। বিশেষতঃ অধ্যাত্মজ্ঞাননিষ্ঠ মুমুক্ষু ব্যতীত অন্যলোক হঠযোগ অভ্যাস করিয়া সেই শক্তির যেরূপ অপব্যবহার করে, তাহা দেখিয়া হঠযোগের প্রতিই অনেকে ভ্রান্তধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। সেই হেতু বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজে বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতির ধর্ম্মমতের ন্যায় তাঁহার ধর্ম্মমতের তেমন সমাদর দেখা যায় না।

কিন্তু বৌদ্ধগাথা, এবং কবীর, তুলসীদাস, দাদু প্রভৃতির দোঁহার ন্যায় গোরক্ষনাথের কীর্ত্তি ও ধর্ম্মমতবিজ্ঞাপক একটী গাথা-সাহিত্য

ভারবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচার লাভ করিয়াছে। নানা প্রাদেশিক ভাষায় এইসব গাথা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। উড়িয়া ভাষায় লিখিত গোবিন্দচন্দ্রের গীতি উড়িষ্যাদেশে পাওয়া যায়। বিহারে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে হিন্দী ভাষায় রচিত 'গোপীচাঁদের পুঁথির' প্রচলন আছে। মহারাষ্ট্র দেশে গোবিন্দ-চন্দ্রের প্রসঙ্গ লইয়া নানা জাতীয় নাটক রচিত হইয়াছে এবং এখনও হয়। ইহা যে এই গাথা-সাহিত্য হইতেই উদ্ভূত, ইহা বলা বাহুল্য। এই গাথাগুলি ভারতের জাতীয়-সাধনার অমূল্য সম্পত্তি। কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজে তাহার অধিকাংশই অপরিচিত। বাংলা ভাষা যে গোরক্ষ-ভক্তদের নিকট কত ঋণী, তাহা চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী বাংলা সাহিত্য আলোচনা করিলেই বোঝা যায়। তাঁহাদিগকে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম স্বষ্টিকর্ত্তা বলা যায়। এ সম্বন্ধে সাহিত্যাচার্য্য দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' দ্রষ্টব্য।

অন্যান্য যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষদের ন্যায় গোরক্ষনাথ তাঁহার ধর্ম্মশিক্ষা দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন; একটী অন্তরঙ্গ ও একটী বহিরঙ্গ। ভগবান্ বুদ্ধ যেমন সংসারত্যাগী বৈরাগ্যবান্, বিশুদ্ধ-চিত্ত ভিক্ষুদিগকে সাক্ষাৎ নির্ব্বাণপ্রদ অন্তরঙ্গ সমাধিকৌশল শিক্ষা দিতেন, এবং সংসারত্যাগে অসমর্থ অবিশুদ্ধচিত্ত সাধারণ গৃহস্থদের নিকট অহিংসা, সত্য, পবিত্রতা, মৈত্রী, দান, পারলৌকিক ক্রিয়া প্রভৃতি উদার সর্ব্বজনগ্রাহ্য ধর্ম্মনীতি প্রচার করিতেন; বেদান্তা-চার্য্য শঙ্কর যেমন সদসদ্‌বিবেকবান্, ঐহিক ও পারলৌকিক

বিষয়ভোগে বৈরাগ্যযুক্ত, শমদমাদিসম্পন্ন মুমুক্ষুর জন্যই সর্ব্বো-পাধি-বিনির্ম্মুক্ত নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপের এবং 'তত্ত্বমসি' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' প্রভৃতি মহাবাক্যার্থের শ্রবণ, মনন ও নিধিধ্যাসন রূপ অন্তরঙ্গ জ্ঞানযোগের ও সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, এবং সর্ব্বসাধারণের জন্য নিজ নিজ অধিকারানুরূপ শাস্ত্রবিহিত ঐহিক ও পারলৌকিক শুভকর্ম্ম, দেবপূজা, ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতির উপদেশ প্রচার করিয়াছেন; প্রেমাবতার চৈতন্য যেমন বিজিতেন্দ্রিয়, রাগদ্বেষবিহীন, বৈরাগ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত, তত্ত্বজ্ঞানী, অনন্যচিত্ত, অন্তরঙ্গ ভক্তের সহিতই উচ্চাঙ্গের প্রেমরস সাধনার আলোচনা করিতেন; এবং অপরাপর সকলকে ভক্তিযুক্ত চিত্তে স্ব স্ব ধর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক নাম-সংকীর্ত্তন ও নাম-জপ করিতে উপদেশ করিতেন, সেইরূপ যোগি-গুরু গোরক্ষনাথও সংসারবিরাগী, ধর্ম্মময়-জীবন, বিশুদ্ধ-চরিত্র, মুক্তিপিপাসুদিগকেই হঠযোগ ও রাজযোগের অন্তরঙ্গ রহস্য সকল ও মহাজ্ঞান শিক্ষা দিতেন, এবং উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর গৃহস্থদের নিকট তাহাদের অধিকারানুসারে তাহাদেরই পরিচিত ভাষায় মানবজীবনের উদ্দেশ্য ও তত্ত্বজ্ঞান ব্যাখ্যা করিতেন, যোগের বহিরঙ্গ প্রচার করিতেন, শিবচরিত্রের ও শৈবধর্ম্মের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করিতেন, উদার ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম ও নীতি উপদেশ করিতেন। তিনি ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশে বিভিন্ন স্থানে শিবমন্দির ও যোগীদের আস্তানা স্থাপন করিয়া, একদিকে যেমন সংসারত্যাগী যোগীদের যোগসাধনার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন,

অপরদিকে তেমনি জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

যোগিবর গোরক্ষনাথ ঠিক কোন্ সময়ে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া কেহ বলিতে পারেন না, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে উচ্চ ও নীচ সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাবও যে অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়াই বলা যায়। তাঁহার সম্প্রদায়ের বিস্তার ও প্রভাব এখনও সমগ্র ভারতে চলিতেছে। এখনও তাঁহার সম্প্রদায়ে যোগৈশ্বর্য্যসম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষগণের আবির্ভাব দৃষ্ট হইতেছে। তাঁহার বিশিষ্ট ধর্ম্ম-মতের প্রচার সাধারণ লোক-সমাজে বিশেষভাবে হউক বা না হউক, এখনও নাথ-সম্প্রদায়ের মঠসমূহের সুবন্দোবস্তের ফলে এবং ঐ সকল মহাপুরুষের চরিত্রের আকর্ষণে ও শক্তির প্রভাবে অসংখ্য শান্তিকামী সংসারবিরাগী লোক তাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। একথা অসঙ্গত নয় যে, বাস্তবিকই গোরক্ষনাথ অমর; এখনও তাঁহার জীবন্ত প্রভাব ভারতের ধর্ম্মসাধনক্ষেত্রে সর্ব্বত্র অনুভূত হয়। তাঁহার সম্বন্ধে কি তাঁহার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' হইতে গোরক্ষনাথের উজ্জ্বল চরিত্র ও বঙ্গদেশের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ প্রদর্শন করিবার জন্য কয়েক পংক্তি মাত্র উদ্ধৃত করিয়া এই অধ্যায় শেষ করিব।

"গোরক্ষবিজয়ের মত এরূপ অপূর্ব্ব গ্রন্থ যে বঙ্গ সাহিত্যের আদিযুগে রচিত হইয়াছিল, ইহা আমাদের গৌরবের কথা। গোরক্ষযোগীর চরিত্র শরৎ সেফালিকা বা যুথিকার ন্যায় শুভ্র, তাঁহার চরিত্র-মাহাত্ম্য বঙ্গসাহিত্যের আদিযুগের একটি প্রধান দিক্‌নির্দ্দেশক স্তম্ভ। ইহা বৌদ্ধযুগের চরিত্রবল, উচ্চনীতি, গুরুভক্তি প্রভৃতি মহৎ গুণরাশিকে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেছে। বিশাল অদ্রিশ্রেণী যেরূপ বঙ্গদেশের উত্তর সীমার চিহ্ন, 'গোরক্ষ-বিজয়' এদেশের সাহিত্যের সেইরূপ যুগনির্দ্দেশক চিহ্ন। এই চিহ্নের পর ভিন্ন যুগ ও ভিন্ন রাজ্যের এলাকা; তখন ব্রাহ্মণ আসিয়া সংস্কৃত সাহিত্য মন্থন করিতেছেন, গ্রাম্য ভাষাকে অবজ্ঞা করিয়া সংস্কৃত শব্দ দ্বারা বঙ্গভাষাকে সাজাইতেছেন। এবং কঠোর জ্ঞানমার্গ ও চরিত্রবলের পথ ছাড়িয়া কোমল ভক্তি ও প্রেম কুসুমাকীর্ণ পথে লোকচরিত্রকে সবলে টানিয়া লইতেছেন। এই অপূর্ব্ব পুঁথির গ্রাম্য ভাষা ও রুচি যে পাঠককে ভ্রান্ত ও ভগ্নোৎসাহ করিবে, তিনি সাহিত্যের এক মহার্ঘ খনির পরিচয় লাভে বঞ্চিত হইবেন। গোরক্ষ ভগবতীর সমস্ত প্রলোভন একটী একটী করিয়া জয় করিয়া য়িহুদিশ্রেষ্ঠ জভের মত অকুণ্ঠিতভাবে স্থৈর্য্যপরায়ণ। নারীর ললামসৌন্দর্য্য ও প্রেম-নিবেদনের নব নব কষ্টিপাথরে তাঁহার চরিত্র কত বার কষিত হইল, কিন্তু প্রত্যেক বারই প্রমাণিত হইল, তাহা খাঁটি সোণা। পার্ব্বতী শিবের নিকট স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহার মায়ার নিকট যোগীর সাধনা কোন্ ছার। অন্যান্য যোগীরা রূপের জালে পড়িয়া ধৃত হইলেন, মীননাথ

স্বয়ং মীনের মতনই জালে আবদ্ধ হইলেন, কিন্তু গোরক্ষনাথের নিকট পার্ব্বতীর উচ্চশির হেঁট হইল।

"গোরক্ষনাথ কিরূপে নর্ত্তকী সাজিয়া কদলীপত্তনে তাঁহার গুরুকে উদ্ধার করেন, মৃদঙ্গের ধ্বনিতে গুরুর উদ্বোধন কিরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, 'কায়াসাধ' উপদেশ বারংবার মৃদঙ্গ হইতে ধ্বনিত হইয়া কিরূপে কদলীপত্তনের রাজপ্রাসাদ কম্পিত হইয়াছিল, তাহা পাঠক নিজে পড়িয়া কৃতার্থ হইবেন। যে চরিত্র-বল এবং নিঃস্বার্থ ও অহৈতুকী ভক্তির উপর এই গ্রন্থের ভিত্তি প্রতিষ্ঠাপিত, তাহা বঙ্গীয় অন্য পুস্তকে নাই। যেমন আলোকস্তম্ভ বৌদ্ধযুগের নিদর্শন, এই পুস্তক তেমনই নাথ-ধর্ম্মের গৌরব নিদর্শন। এই নাথধর্ম্মে বৌদ্ধ ও শৈবধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ উপকরণ মিশিয়া গিয়াছিল। * * আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গ্রাম্য মুসলমান ও অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ এই দুরূহ যোগমার্গের বিষয়গুলির অনুশীলন করিয়াছিল।

"গোরক্ষবিজয় হইতে আভাস পাওয়া যায় যে এই যোগীই কালীঘাটের কালী প্রতিষ্ঠিত করেন। বিশ্বকোষ অভিধানে বহুপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল যে লৌকিক প্রবাদ এই যে গোরক্ষনাথই কালীঘাটের কালীর প্রতিষ্ঠাতা। যখন একথা লিখিত হইয়াছিল, তখন 'গোরক্ষবিজয়ের' অস্তিত্ব কেহ জানিত না। সুতরাং এই পুস্তক প্রাচীন প্রবাদকে দৃঢ়ীভূত করিতেছে। সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া গোরক্ষনাথের শিষ্য সম্প্রদায় বিদ্যমান। এই নাথ সম্প্রদায়ের চেষ্টায়ই গোরক্ষনাথের কীর্ত্তি বিজ্ঞাপক

সাহিত্য ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচার লাভ করিয়াছে। ময়নামতীর গান এই সাহিত্যের অন্তর্গত। * * * ধর্ম্মমঙ্গলের পুঁথিগুলিরও কোন কোনটীতে আমরা মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা কানফা প্রভৃতি নাথগুরুগণের সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ উল্লেখ পাইয়াছি। সুতরাং ইহাদের মধ্যে ধর্ম্মমতে কোনপ্রকার ঐক্য যে বিদ্যমান ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

"এই সমস্ত গাথা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুত্থানের পূর্ব্ববর্ত্তী। সাধারণ জনসমাজে তখনও রামায়ণ মহাভারতাদির অনুশীলন এদেশে আরম্ভ হয় নাই।"

জ্ঞানমার্গ ও যোগমার্গ—শঙ্কর ও গোরক্ষনাথ

অতি প্রাচীনকাল হইতে পরমার্থনিষ্ঠ আর্য্যসমাজে মুমুক্ষু-গণের মোক্ষলাভের জন্য দ্বিবিধ অন্তরঙ্গ সাধনমার্গ প্রচলিত আছে। একটির নাম জ্ঞানমার্গ, অপরটীর নাম যোগমার্গ। মহাভারত রচিত হইবার পূর্ব্বেও, সম্ভবতঃ বৈদিক যুগ হইতেই, বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে অতৃপ্ত জ্ঞানমার্গাবলম্বী ও যোগমার্গাবলম্বী দুইটি প্রবল সম্প্রদায় বর্ত্তমান ছিল এবং তাহাদের মধ্যে স্ব স্ব মতের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে তর্ক বিতর্ক হইত। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাভারতের শান্তি পর্ব্বে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,—

সাংখ্যাঃ সাংখ্যং প্রশংসন্তি যোগা যোগং দ্বিজাতয়ঃ।
বদন্তি কারণং শ্রেষ্ঠং স্বপক্ষোদ্ভাবনায় বৈ ॥

সাংখ্যমতাবলম্বী দ্বিজাতিগণ সাংখ্যমার্গের (জ্ঞানমার্গের) এবং যোগমতাবলম্বিগণ যোগমার্গের প্রশংসা করেন। এবং নিজ নিজ পক্ষের উৎকর্ষ খ্যাপনের জন্য তাঁহারা শ্রেষ্ঠ যুক্তি সকল প্রদর্শন করিয়া থাকেন। জ্ঞানমার্গে তত্ত্ববিচারই মোক্ষের প্রকৃষ্ট সাধন। শাস্ত্র ও যুক্তির সাহায্যে যাবতীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম, ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ের অনিত্যত্ব, অশুচিত্ব, দুঃখকরত্ব, মোহজনকত্ব, প্রভৃতি দোষ এবং আত্মার নিত্যত্ব, অসঙ্গত্ব, নিষ্ক্রিয়ত্ব, সুখদুঃখাদিবিহীনত্ব, কার্য্য-কারণাতীতত্ব, সত্যজ্ঞানানন্তস্বরূপত্ব প্রভৃতি গুণ পর্য্যালোচনা

করিয়া, বিষয়সম্পর্ক বর্জ্জন পূর্ব্বক চিত্তকে আত্মস্বরূপে বা ব্রহ্ম-স্বরূপে সমাহিত করিবার ঐকান্তিক চেষ্টাই জ্ঞানমার্গাবলম্বীদের মোক্ষলাভের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। যোগিগণ বলিয়া থাকেন যে কেবলমাত্র বিচার দ্বারা বৈরাগ্যেরও প্রতিষ্ঠা হয় না, পরমতত্ত্বে স্থিতিলাভও হয় না। যতদিন পর্য্যন্ত অনিয়মিত ভাবে প্রাণের স্পন্দন চলিতে থাকে, দেহ ও ইন্দ্রিয় সকল অস্থির থাকে, এবং অন্তঃকরণের বৃত্তি সকল তরঙ্গ তুলিতে থাকে,—যতদিন ইচ্ছাশক্তি-প্রভাবে প্রাণকে আয়ত্ত, দেহ ও ইন্দ্রিয় সকলকে স্থৈর্য্যসম্পন্ন ও চিত্তবৃত্তি সকলকে নিরুদ্ধ করিতে পারা না যায়,—ততদিন বাসনা নির্ম্মূল হয় না, চাঞ্চল্য দূর হয় না, অন্তকরণ আত্মস্বরূপে সমাহিত হয় না, সুতরাং মোক্ষলাভও হয় না। এই হেতু যম ও নিয়মরূপ মহাব্রতের অনুষ্ঠান দ্বারা দেহেন্দ্রিয়মনের পবিত্রতা সম্পাদন পূর্ব্বক আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি অভ্যাস করা প্রয়োজন। এই সাধনা দ্বারা দেহেন্দ্রিয় স্থির, প্রাণস্পন্দ নিয়মিত ও চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে সেই নির্ম্মল নিস্তরঙ্গ বিষয়-সঙ্গ-রহিত, আত্মসমাহিত অন্তঃকরণে স্বয়ংপ্রকাশ আত্মার স্বরূপ প্রকাশিত হয়। সুতরাং ইহাই মোক্ষের প্রকৃষ্টতম উপায়। জ্ঞানী বলেন যে, বিষয়ের অনিত্যত্বাদি দোষদর্শন করিলে, এবং দৃশ্য-জগতের সহিত আত্মার বাস্তবিক কোনও সম্বন্ধ নাই, বিচার দ্বারা

দৃঢ়রূপে নিশ্চিত হইলে, চিত্ত স্বভাবতই বিষয়বিমুখ হইয়া প্রশান্ত হয়, কর্ম্ম প্রবৃত্তি নষ্ট হয়, ইন্দ্রিয় সকল স্থির হয়। দেহেন্দ্রিয়মনের চাঞ্চল্যের মূলে বাসনা, বাসনার মূলে অজ্ঞান।

আত্মাতে বিষয়ের অধ্যাস ও দেহাদি বিষয়ে আত্মার অধ্যাসরূপ অজ্ঞানই সকল অনর্থের মূল। অজ্ঞান তত্ত্ববিচারজনিত জ্ঞান-দ্বারা নিবারিত হয়। অজ্ঞানের নিবৃত্তিতে সর্ব্বপ্রকার চাঞ্চল্যেরই নিবৃত্তি হয়। তজ্জন্য যৌগিক প্রক্রিয়ার কোন বিশেষ প্রয়োজন নাই। আত্মবিষয়ক শ্রবণ মনন ও নিধিধ্যাসন দ্বারাই আত্মস্বরূপের অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার হয়। জ্ঞানী প্রকৃতি বা মায়া এবং তদুৎপন্ন সকল পদার্থে বৈরাগ্য করিয়া তদতীত আত্মস্বরূপ বা ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হইতে চাহেন ; যোগী প্রকৃতি বা মায়া ও তদুৎপন্ন দেহেন্দ্রিয় অন্তঃকরণ প্রভৃতির উপর আধিপত্যলাভ করিয়া ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হইতে চাহেন। উভয়েরই মতে আত্মা স্বরূপতঃ শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব। প্রকৃতি বা মায়ার দোষগুণ আত্মায় আরোপিত হইয়া আত্মাকে বদ্ধের ন্যায় করিয়া রাখে। আত্মার যথার্থস্বরূপ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারিলেই মুক্তি। এই মুক্তি উভয়েরই লক্ষ্য। কিন্তু সাধনপ্রণালীতে তাহাদের পার্থক্য। কপিল-প্রবর্ত্তিত সাংখ্য এবং বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদ জ্ঞান-প্রধান। কোন কোন অবান্তর বিষয়ে এই দুইয়ের পার্থক্য থাকিলেও উভয়ের সাধনতত্ত্ব মূলতঃ এক—তত্ত্ববিচার ও বৈরাগ্য। উপনিষৎ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রে অনেক স্থলে জ্ঞানবাদী-মাত্রই সাংখ্য নামে অভিহিত হইয়াছে। সম্যক্ খ্যায়তে অনেন ইতি সাংখ্যম্, অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞান যাহাদ্বারা হয়, তাহাই সাংখ্য। ঐ সব শাস্ত্রে যে সব স্থানে সাংখ্য ও যোগের বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে জ্ঞানমার্গ ও যোগমার্গের কথাই বলা হইয়াছে।

জ্ঞানমার্গ ও যোগমার্গের প্রণালীতে পার্থক্য থাকিলেও ফল সম্বন্ধে কোন পার্থক্য নাই। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥"

—সাংখ্য-মার্গাবলম্বিগণ যেস্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যোগমার্গাবলম্বীও সেই স্থানই প্রাপ্ত হয়। অতএব সাংখ্য ও যোগকে ফলতঃ এক বলিয়া যে দর্শন করে, সেই যথার্থ দর্শন করে। মহাভারতে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন,—

"উভে চৈতে মতে জ্ঞানে নৃপতে শিষ্ট সম্মতে।
অনুষ্ঠিতে যথাশাস্ত্রং নয়েতাং পরমাং গতিম্॥"

—হে নৃপতে! এই উভয় (যোগমার্গের ও সাংখ্যমার্গের) সাধন-জ্ঞানই শিষ্টসম্মত বলিয়া শ্রদ্ধার্হ; যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত হইলে উভয়ই পরমগতি প্রদান করে। ভীষ্মদেব আরও বলিতেছেন যে,—

"তুল্যং শৌচং তপোযুক্তং দয়া ভূতেষু চানঘ।
ব্রতানাং ধারণং তুল্যং দর্শনং ন সমং তয়োঃ॥"

—এই দুই মার্গের গন্তব্যই যে শুধু সমান, তা নয়, শৌচ, তপশ্চরণ, ভূতদয়া, ব্রতধারণ প্রভৃতিও সমান। কেবলমাত্র তাহাদের দর্শন (view-point) বা শাস্ত্র সমান নয়। বশিষ্টদেবও জনককে এই কথাই বলিয়াছেন,—

"যদেব যোগাঃ পশ্যন্তি সাংখ্যৈস্তদ্ অনুগম্যতে।
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স বুদ্ধিমান্॥"

যাজ্ঞবল্কও জনককে সাংখ্য ও যোগের এইরূপ সাম্যই উপদেশ

করিয়াছেন। অনেক মহাপুরুষ তত্ত্ববিচার ও যোগ—উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া সাংখ্য ও যোগের সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং শিষ্যদিগকে উভয় পন্থাই উপদেশ করিয়াছেন।

যদিও সাংখ্য ও যোগ ফল সম্বন্ধে সমান, এবং সাধনাঙ্গ সম্বন্ধেও অনেকটা সমান, সুতরাং কোন পথকে শ্রেষ্ঠ এবং কোন পথকে নিকৃষ্ট মনে করা নিতান্তই সাধ্য-সাধন-বিষয়ক অজ্ঞতার পরিচায়ক; তথাপি মুমুক্ষুদিগের প্রকৃতিগত, রুচিগত, শক্তিগত, ও অবস্থাগত বৈষম্য নিবন্ধন একজনের পক্ষে হয়ত যোগমার্গ অধিকতর উপযোগী, অপরের পক্ষে হয়ত সাংখ্যমার্গ বা জ্ঞানযোগ অধিকতর উপযোগী। যোগবাশিষ্ঠে বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে উপদেশ দিতেছেন,—

"দ্বৌক্রমৌ চিত্তনাশস্য যোগো জ্ঞানং চ রাঘব।
যোগো বৃত্তিনিরোধো হি জ্ঞানং সম্যগবেক্ষণম্॥
অসাধ্যঃ কস্যচিদ্‌যোগঃ কস্যচিৎ তত্ত্বনিশ্চয়ঃ।
প্রকারো দ্বৌ ততো দেবো জগাদ পরমঃ শিবঃ॥"

—হে রাঘব! চিত্তনাশের দুইটী পথ—যোগ ও জ্ঞান। বৃত্তি নিরোধের নাম যোগ, এবং সম্যক্ তত্ত্বানুসন্ধানের নাম জ্ঞান। কাহারও পক্ষে যোগের পথ অসাধ্য, কাহারও পক্ষে তত্ত্ব-নিশ্চয়ের পথ অসাধ্য। সেই হেতু পরমগুরু শিব এই দুই প্রকার সাধনমার্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ 'যোগ' শব্দটী সর্ব্বাপেক্ষা উদার অর্থে

প্রয়োগ করিয়াছেন। যে কোন উপায়ে চিত্ত বিশুদ্ধ ও আত্মনিষ্ঠ হয়, যে কোন উপায়ে চিত্তবৃত্তির বহির্মুখতা ও বহুমুখতা নিবারিত হইয়া অন্তর্মুখতা ও একমুখতা সম্পাদিত হয়, যে কোন উপায়ে সাধকের সকল কর্ম্ম, সকল জ্ঞান, সকল ভাব এক-কেন্দ্রানুগ হয়, যে কোন উপায়ে মানব-জীবনে সকল প্রকার অসামঞ্জস্য ও তজ্জনিত ক্লেশ বিনষ্ট হইয়া সাম্য ও শান্তি সংস্থাপিত হয়, যে কোন উপায়ে সাধক আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়, তাহাই যোগশব্দ বাচ্য। দেহেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ নানা বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া নানা সময়, নানা অবস্থায় নানা দিকে ধাবিত হয়, তাহাদের কেন্দ্র সর্ব্বাবস্থায় ঠিক এক থাকে না,—ইহাই নিজের সঙ্গে নিজের বিয়োগ। সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া, আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া, যদি কায়িক, ঐন্দ্রিয়িক ও মানসিক সর্ব্বপ্রকার স্থূল সূক্ষ্ম ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তবেই যোগ হইল, তবেই জীবন পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইল। জীবনের বহুত্ব বা অসাম্য দূরীভূত হইয়া যত একত্ব বা সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, ততই দেহেন্দ্রিয়মন মলিনতা-শূন্য হয়, এবং আত্মার সচ্চিদানন্দস্বরূপের সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয়। সুতরাং গীতা সাংখ্যকেও যোগ বলিয়াছেন, ভক্তিকেও যোগ বলিয়াছেন, কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে সম্পাদিত কর্ম্মকেও যোগ বলিয়াছেন, আসন-প্রাণায়াম-ধারণা-ধ্যানাদি সমন্বিত অভ্যাস-যোগকেও যোগ বলিয়াছেন। সাধকের যেরূপ প্রকৃতি, যেরূপ রুচি, যেরূপ শক্তি, যেরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তদনুসারে

সে তাহার অনুকূল একটী বিশেষ যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া যোগযুক্ত বুদ্ধিতে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত সাধন করিতে থাকিলেই কৃতকৃতার্থ হইবে।

মহাভারতের যুগে অথবা তাহার অব্যবহিত পরে মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত যোগসূত্র যেমন যোগদর্শন ও যোগসাধনাকে একটী সুন্দর সুগঠিত সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন চিরস্থায়ী বিশিষ্ট রূপপ্রদান করিয়াছে, ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রও তেমনি উপনিষদনুগত অদ্বৈতনিষ্ঠ সাংখ্যমত বা ব্রহ্মবাদ এবং জ্ঞানসাধনাকে একটী চিরস্থায়ী রূপপ্রদান করিয়াছে, সেইরূপ জ্ঞানমার্গাবলম্বী অপর শাখাও আপনাদিকে কপিল প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় বলিয়া পরিচয়-প্রদান পূর্ব্বক সাংখ্যসূত্র রচনা করিয়া আপনাদের বিশিষ্ট দার্শনিক মত ও সাধনাকে একটি স্থায়ী আকার দান করিয়াছে। তৎপর প্রত্যেক মতেরই সাম্প্রদায়িক মহাজনগণ অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ও নিজ নিজ সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিয়াছেন। এইরূপে গুরুশিষ্য-পরম্পরায় সকল-সম্প্রদায়ই প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং নানা শ্রেণীর মনুষ্যের আধ্যাত্মিক ক্ষুধার আহার প্রদান করিতেছে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও সাংখ্য ও যোগ উভয়ই অংশতঃ গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে একটি বিশিষ্ট নূতন রূপ প্রদান পূর্ব্বক নিজস্ব করিয়া লইয়াছিল। ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনা এইরূপেই ক্রমশঃ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে।

মধ্যযুগে জ্ঞান-সাধনা ও যোগ-সাধনার বৈজয়ন্তী লইয়া

দুই জন অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—একজন বেদান্তাচার্য্য শঙ্কর, আর একজন যোগাচার্য্য গোরক্ষনাথ। শঙ্কর হইতে বৈদান্তিক জ্ঞানসাধনা এবং জ্ঞানি-সম্প্রদায় যেমন নবজীবন লাভ করিয়াছে, গোরক্ষনাথ হইতেও যোগসাধনা ও যোগি-সম্প্রদায় তেমনই নবজীবন লাভ করিয়াছে। জ্ঞানিগুরু শঙ্কর বেদান্ত শাস্ত্রের প্রচার ও জ্ঞানসাধনার প্রচলনের উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়কে পুনর্গঠিত করিলেন, তাহাদিগকে কয়েকটি শাখায় বিভক্ত করিলেন, প্রধান প্রধান স্থানে মঠ স্থাপন করিয়া সেইসব স্থান জ্ঞানশিক্ষার কেন্দ্র করিলেন; এবং এইরূপে তিনি স্বকীয় সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণ দ্বারা সমগ্র ভারতবর্ষে বেদান্তের তত্ত্ব ও সাধনা শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যোগিগুরু গোরক্ষনাথও যোগসাধনার প্রচলনের উদ্দেশ্যে যোগিসম্প্রদায়ের পুনর্গঠন করিলেন, তাহাদিগকে কয়েকটি শাখায় বিভক্ত করিলেন, বিভিন্ন স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া যোগশিক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করিলেন, এবং স্বকীয় অলৌকিক প্রভাব বিস্তার করিয়া ও শিষ্য-প্রশিষ্যগণের ভিতর দিয়া, সমগ্র ভারতে যোগধর্ম্ম প্রচারের ব্যবস্থা করিলেন। মোক্ষা-ভিলাষী সংসারবিরাগী সাধুদিগের জন্য শঙ্কর যেমন অন্তরঙ্গ জ্ঞানসাধনার বিধান করিয়াছিলেন, গোরক্ষনাথও তেমনই অন্তরঙ্গ যোগসাধনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহারা কেহই সাকার দেবোপাসনার বিদ্বেষী ছিলেন না। অদূরদর্শী সংকীর্ণচেতা

ধর্ম্মসংস্কারক ও সমাজসংস্কারকদের ন্যায় অধিকার-নিরপেক্ষ হইয়া সকলের জন্য একই রকম ধরাবাঁধা সাধন-প্রণালী তাঁহারা ব্যবস্থা করেন নাই। এই উদ্দেশ্যে, সাধারণ গৃহীদের কল্যাণের জন্য এবং নিম্নাধিকারী সাধুদের পক্ষে সাধনার উচ্চ সোপানে আরোহণের সৌকর্য্য সম্পাদনের জন্য, তাঁহারা অনেক মঠে বা আশ্রমে দেবমূর্ত্তিরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভক্তি ও আচারনিষ্ঠার সহিত দেবতার উপাসনা করিতে করিতেই দেহেন্দ্রিয়মন বিশুদ্ধ হয়, হৃদয় সরস ও ধর্ম্মানুরাগী হয়, ধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য সকল জানিবার জন্য আগ্রহ জন্মে, এবং অন্তরঙ্গ যোগসাধনা বা জ্ঞানসাধনার অধিকার লাভ হয়। সালম্বন উপাসনা নিরালম্ব উপাসনার সোপান। লোকোত্তর মহাপুরুষগণও লোকশিক্ষার জন্য—আপনাদের জীবনের দৃষ্টান্তের দ্বারা লোকের মন তাহাদের অধিকারানুযায়ী ধর্ম্মসাধনে আকৃষ্ট করিয়া, তাহাদিগকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করিবার জন্য—সাধারণ ধর্ম্মপরায়ণ লোকের মত দেবতার সাকার মূর্ত্তির নিকট পূজার্চ্চনাদি করিয়া থাকেন। কারণ,—

'যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥'

—শ্রেষ্ঠব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন, সাধারণ লোকও সেইরূপই আচরণ করিয়া থাকে, শ্রেষ্ঠব্যক্তি (নিজের আচরণ দ্বারা ও উপদেশ দ্বারা) যে শাস্ত্রের প্রামাণ্য প্রতিপাদন করেন, লোকও সেই শাস্ত্রেরই অনুবর্ত্তন করে।

উদারচরিত্র জ্ঞানিগণ ও যোগিগণ কোন দেবতার উপাসনাই অবজ্ঞা করেন না। সকল দেবতাকেই তাঁহারা প্রকৃতিপুরুষেশ্বর মায়াধীশ অশেষ-কল্যাণ-গুণাকর ভগবানের বিভূতি বা বিশেষ-বিকাশ বলিয়া জানেন, এবং সকল দেবতার উপাসনা দ্বারাই ভগবানের উপাসনা হয় বলিয়া তাঁহারা উপলব্ধি করেন। তবে, তাঁহাদিগকে প্রধানতঃ শিবের উপাসক হইতেই দেখা যায়। শিব—যোগীরও আদর্শ, জ্ঞানীরও আদর্শ। শাস্ত্রেও শিবকেই যতিদিগের উপাস্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—'যতীনাং চ মহেশ্বরঃ।' পাতঞ্জল যোগসূত্রে সূত্রিত হইয়াছে যে,—'ক্লেশ-কর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ, অর্থাৎ—ক্লেশ, কর্ম্ম, কর্ম্মফল, ও বাসনা দ্বারা অসংস্পৃষ্ট যে পুরুষবিশেষ, তিনিই ঈশ্বর। এই আদর্শেই যোগিগণ ও জ্ঞানিগণ শিবমূর্ত্তি ও শিবচরিত্র বর্ণনা করেন ও ভাবনা করেন। শিব সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালিনী বিশ্বপ্রকৃতিময়ী ভগবতী মহামায়ার স্বামী,—তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, যাহা কিছুর অস্তিত্ব আছে সবই তাঁর—অথচ তিনি নির্লিপ্ত, উদাসীন, জ্ঞান-তপোরত, আত্মসমাহিত। মায়ার বিকাররূপ সংসারকে সংযম দ্বারা সংহৃত ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত করিয়া তদবশেষরূপ ভস্ম নিজ অঙ্গে মাখিয়া—আপনার ভিতরে সমস্ত বিশ্ব প্রলীন করিয়া—তিনি আত্মানন্দে ভরপুর। মায়া তাঁহারই শক্তি, তাঁহারই অঙ্কলীনা, তাঁহাহইতে স্বরূপতঃ অভিন্না। এই মায়া হইতে সৃষ্টিবৈচিত্র্যের উৎপত্তি হইলেও তিনি নির্ব্বিকার, প্রশান্ত, অচল, অটল। তাঁহার যে রূপ কল্পিত

হইয়াছে তাহাতে সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে কদর্য্য, ঘৃণ্য, ভীষণ ও নিষ্কিঞ্চনভাব একাধারে সামঞ্জস্যের সহিত মিলিত হইয়াছে। সবই তাঁহার অঙ্গীভূত হইয়া সুশোভিত ও আনন্দপ্রদ হইয়া আছে। শিবগীতায় শিব নিজকে এইরূপ বর্ণন করিতেছেন,—

অচিন্ত্যরূপ মব্যক্ত মনন্ত মমৃতং শিবম্।
আদিমধ্যান্ত রহিতং প্রশান্তং ব্রহ্ম কারণম্॥
একং বিভুং চিদানন্দং অরূপ মজমদ্ভুতম্।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশ মুমাদেহার্দ্ধধারিণম্॥
ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধরং নীলকণ্ঠং ত্রিলোচনম্।
জটাধরং চন্দ্রমৌলিং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্॥
ব্যাঘ্রচর্ম্মোত্তরীয়ং চ বরেণ্য মভয়প্রদম্।
চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিনয়নং স্মেরবক্ত্রসরোরুহম্।
ভূতি ভূষিত সর্ব্বাঙ্গং সর্ব্বাভরণভূষিতম্॥
এবমাত্মারণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
জ্ঞাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ সাক্ষাৎ পশ্যন্তি মাং জনঃ॥

—"অচিন্ত্য (মনের অগোচর), অব্যক্ত (ইন্দ্রিয়ের অগোচর), অনন্ত (দেশকালের অতীত), অমৃত (মোক্ষস্বরূপ), শিব (মঙ্গলস্বরূপ), আদি মধ্য ও অন্তরহিত (অখণ্ড, নিরবয়ব), প্রশান্ত (নির্ব্বিকার), এক (অদ্বিতীয়), বিভু (সর্ব্বব্যাপী), চিদানন্দ, অরূপ (নিরাকার), অজ (জন্মরহিত), অদ্ভুত (উপমাশূন্য), সর্ব্বকারণ-কারণ, ব্রহ্ম।" ইহাই তাঁহার পারমার্থিক স্বরূপ। যাহাদের চিন্তাশক্তি দেশ, কাল, নাম, রূপ, প্রভৃতি স্থূলের মধ্যে

আবদ্ধ, তাহাদের নিকট এই স্বরূপের একটি আভাস রূপের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই একটি রূপকল্পনা আবশ্যক হয়। সেই হেতু স্বরূপ বর্ণনার পরে তাঁহার রূপ বর্ণনা হইয়াছে। তিনি স্বরূপতঃ বর্ণহীন বলিয়াই তাঁহার রূপ শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় শুভ্রবর্ণবিশিষ্ট। মায়া বা প্রকৃতি তাঁহার আশ্রয়েই বিশ্বরচনা কার্য্য করিতেছে বলিয়া তিনি উমাদেহার্দ্ধধারী। জগতে যাহা কিছু ভীষণ, তাহা সেই মঙ্গলময়ের অঙ্গাভরণ হইয়া মঙ্গলময়েরই অঙ্গীভূত হইয়াছে। সেই হেতু ব্যাঘ্রচর্ম্ম তাঁহার পরিধেয় ও উত্তরীয়, সর্প তাঁহার যজ্ঞোপবীত। ভক্তের সকল দুঃখ নিজের ভিতরে গ্রহণ করিয়া তাহা যে তিনি অবিক্রিয়ভাবে হজম করিয়া ফেলিতেছেন, তাহারই আভাস নীলকণ্ঠে প্রকাশিত। তাঁহার জ্ঞাননেত্র সদা উন্মীলিত বলিয়া তিনি ত্রিলোচন। এই জ্ঞাননেত্রের তেজেই কাম ভস্মীভূত, ও বৈরাগ্য প্রতিষ্ঠিত। প্রসাধনবিহীন জটাজুটধারী মস্তক তাঁহার পরবৈরাগ্যের একটি নিদর্শন। আবার, মনোনয়নাহ্লাদকরী চন্দ্রকলা তাঁহার ললাটে জটাজুটের সম্মুখেই শোভা পাইতেছে। সর্ব্বদা সুপ্রসন্ন বলিয়া তাঁহার মুখপদ্ম ঈষদ্ হাস্যবিকসিত। তিনি বিশ্বরূপ, তাঁহার তিনটি চক্ষুই যেন চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নি হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। আবার, তিনি বিশ্বাতীত বলিয়া বিভূতি-ভূষিত। সংসারে যত কিছু বিরোধীভাব, সব তাঁহার অঙ্গে সৌসামঞ্জস্যে বিরাজিত, সকলই তাঁহার আভরণ।

যে সাধক স্বীয় আত্মাকে অরণি করিয়া এবং প্রণবকে

উত্তরারণি করিয়া জ্ঞানমন্থন অভ্যাস করে, সে এই শিবের সাক্ষাৎ পারমার্থিক স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া মোক্ষলাভ করে।

আরাধ্য দেবতাকে যেরূপ স্বভাবান্বিত বলিয়া চিন্তা করা যায়, তাঁহার উপাসনা করিতে করিতে উপাসক তদ্ভাবভাবিত হইয়া অনেক পরিমাণে সেইরূপ স্বভাব প্রাপ্ত হয়। এই হেতু শিবের উপাসকদিগের পক্ষে বৈরাগ্যপ্রবণ, সংসারবিমুখ, কঠোর-তপঃপরায়ণ, অধ্যাত্মবিচারশীল, উদাসীন সন্ন্যাসী হওয়া বেশী স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে বিষ্ণ্বুপাসকগণের পক্ষে ভক্তিমান্, প্রেমিক, ভাবপ্রবণ, সেবাধর্ম্মরত, সমাজমুখীন, লীলাস্বাদনশীল সাধু হওয়া বেশী স্বাভাবিক। সেই হেতু সাধারণতঃ দেখা যায় যে ভক্তিপন্থিগণ অধিকাংশ স্থলে বৈষ্ণব হয়। এবং যোগপন্থী ও জ্ঞানপন্থী সন্ন্যাসিগণ অধিকাংশস্থলে শৈব হইয়া থাকে। এই কারণে শঙ্কর ও গোরক্ষনাথের সম্প্রদায় দুইটীতে শিবোপাসনার প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হয়।

একদিকে শিব যেমন বৈরাগী জ্ঞানী ও যোগীর আরাধ্য, অন্যদিকে তিনি আবার সর্ব্বসাধারণের উপাস্য। শিবের পূজায় পৌরোহিত্যের প্রাধান্য নাই। স্ত্রীলোক, বৈশ্য এবং শূদ্রেরাও নিজে নিজেই শিবের পূজা করিতে পারে। শিবমন্দিরে প্রবেশ করিতে এবং স্বহস্তে শিব পূজা করিতে কাহারও বাধা নাই। যাহারা অন্য কোন দেবতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়, তাহারাও শিবের পূজা করিয়া থাকে। শিবলিঙ্গ সঙ্গে করিয়া গাড়ী ষ্টিমার প্রভৃতিতে অনেকে নানা স্থানে যাতায়াত করিয়া থাকেন। স্পর্শ-

দোষ শিবকে স্পর্শ করে না। এদেশে কুমারীগণ প্রথমেই অতি অল্প বয়সে শিবপূজায় দীক্ষিত হয়। মধ্যযুগে কৃষকগণ কৃষিকার্য্যে প্রধানতঃ শিবের সাহায্য প্রার্থনা করিত। শিবের গান পুরাতন বাংলা সাহিত্যে একটী প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই গান এত বহুলভাবে প্রচারিত হইয়াছিল যে, 'ধান ভান্‌তে শিবের গীত' একটি প্রবাদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের পতন ও হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানের সময় অনেক বৌদ্ধ শিবোপাসনা গ্রহণ পূর্ব্বক হিন্দুসমাজ ভুক্ত হইয়াছিল। সাধারণ বৌদ্ধদিগকে হিন্দুভাবাপন্ন করিতে এবং শৈবধর্ম্মের এইরূপ বহুল প্রচার করিতে যোগিগুরু গোরক্ষনাথের বিশেষ প্রভাব ছিল বলিয়া অনুমান হয়।

জ্ঞানপন্থী ও যোগপন্থী সম্প্রদায়ের অনেক বিষয়ে বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও, অনেক জ্ঞানপন্থী ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণকে বশীভূত করিবার জন্য যোগসাধনার সাহায্য গ্রহণ করিতেন, এবং অনেক যোগপন্থী তত্ত্বনির্দ্ধারণের উদ্দেশ্যে সাংখ্য বা বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও তদনুযায়ী বিচার করিতেন। গোরক্ষনাথ ও শঙ্করের বহু পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ জ্ঞান ও যোগের মাখামাখি চলিয়া আসিতেছিল। শিব-সংহিতা প্রভৃতি যোগগ্রন্থে বৈদান্তিক ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা করিয়া সেই ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপায়রূপেই যোগপ্রক্রিয়ার উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। শঙ্কর ও গোরক্ষনাথের পরে এই মাখামাখি আরও বেশী মাত্রায় চলিয়া আসিতেছে বলিয়া বোধ হয়। গোরক্ষনাথের সম্প্রদায়বর্ত্তী

মহাপুরুষগণ তত্ত্ব বিচারের জন্য প্রায়শঃ বেদান্তশাস্ত্রই অবলম্বন করেন। শঙ্করের সম্প্রদায়বর্ত্তী অনেক মহাপুরুষও যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। ভক্তিধর্ম্ম প্রচারিত হওয়ার সময় হইতে অবশ্য জ্ঞানিসম্প্রদায় ও যোগিসম্প্রদায় উভয়েই স্ব স্ব সাধনপ্রণালী ভক্তির রসে অভিসিঞ্চিত করিয়া সরস করিয়া লইয়াছেন। মধ্যযুগের পর হইতে জ্ঞানী ও যোগী সকল সাধককেই 'ভক্ত' আখ্যাপ্রদান করা যায়। ভক্তি বর্ত্তমান যুগের যুগধর্ম্ম, ইহা প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

শঙ্করের সম্প্রদায়ে যেমন উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্র সর্ব্বোপরি প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইলেও, স্বয়ং শঙ্করের এবং তৎপরবর্ত্তী অনেক মহাজনের প্রণীত অনেক গ্রন্থও প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হয়, গোরক্ষনাথসংগঠিত যোগিসম্প্রদায়েও তেমনি যোগসাধনা বিষয়ে পাতঞ্জলসূত্র প্রভৃতির প্রামাণ্য সর্ব্বোপরি হইলেও গোরক্ষনাথ এবং তৎপরবর্ত্তী কয়েকজন মহাপুরুষের রচিত যোগগ্রন্থের প্রামাণ্যও সকল যোগীই স্বীকার করিয়া থাকেন। নাথ-যোগি-সম্প্রদায়ে বিশেষভাবে প্রচলিত প্রামাণিক যোগগ্রন্থসমূহের মধ্যে গুরু দত্তাত্রেয়ের উপদিষ্ট 'দত্তাত্রেয় সংহিতা,' গোরক্ষোপদিষ্ট 'গোরক্ষসংহিতা' এবং সহজানন্দ চিন্তামণিস্বাত্মারাম যোগীন্দ্রের রচিত 'হঠ প্রদীপিকা' সমধিকপ্রসিদ্ধ। গুরু দত্তাত্রেয় সম্বন্ধে ভাগবতে উল্লিখিত আছে যে,—

ষষ্ঠমত্রেরপত্যত্বং বৃতঃ প্রাপ্তোঽনসূয়য়া।
আন্বীক্ষিকীমলর্কায় প্রহ্লাদাদিভ্য ঊচিবান্॥

—ভগবান্ অনসূয়া কর্ত্তৃক আরাধিত ও বৃত হইয়া, অত্রির পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই অত্রি ও অনসূয়ার পুত্রই দত্তাত্রেয় নামে প্রসিদ্ধ। তিনি ভগবানের ষষ্ঠ অবতার। তিনি অলর্ক ও প্রহ্লাদ প্রভৃতিকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন। দত্তাত্রেয় সংহিতায় পাতঞ্জলোক্ত অষ্টাঙ্গযোগই বিশদরূপে ও কার্য্যকরভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। হঠপ্রদীপিকাতেও তাহাই করা হইয়াছে। দত্তাত্রেয় সংহিতায় আছে যে,—

যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনঞ্চ ততঃ পরম্।
প্রাণায়ামশ্চতুর্থঃ স্যাৎ প্রত্যাহারশ্চ পঞ্চমঃ ॥
ষষ্ঠী তু ধারণা প্রোক্তা ধ্যানং সপ্তমমুচ্যতে।
সমাধিরষ্টমঃ প্রোক্তঃ সর্ব্ব পুণ্য ফলপ্রদঃ ॥

—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি—এই অষ্টাঙ্গযোগ সকলপুণ্যের ফল প্রদান করে। যম ও নিয়ম যোগসাধনার বিশেষ অঙ্গ নহে। ইহা মানবমাত্রেরই অনুষ্ঠেয়। যিনি যেরূপ সাধনই করুন, যেরূপ অবস্থাতেই থাকুন, যম ও নিয়ম লঙ্ঘন করা কাহারও কর্ত্তব্য হইতে পারে না। যম ও নিয়ম সকলসাধনার ভিত্তিস্বরূপ। যম ও নিয়ম স্বেচ্ছায় উল্লঙ্ঘন করিলে, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি বা কর্ম্ম কোন সাধনারই সম্যক্ অনুষ্ঠান সম্ভব হয় না। নিজের কল্যাণের জন্য, সমাজের কল্যাণের জন্য, জাতির কল্যাণের জন্য, যম ও নিয়ম সকল মনুষ্যেরই সকল অবস্থায় অবশ্য কর্ত্তব্য। এই হেতু মহাভারত ও পাতঞ্জলে যম ও নিয়ম 'সার্ব্বভৌম

মহাব্রত' বলিয়া শ্রদ্ধার সহিত উপদিষ্ট হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই কারণেই গুরু গোরক্ষনাথ 'গোরক্ষসংহিতায়' যম ও নিয়মকে বিশেষভাবে যোগের অঙ্গরূপে গ্রহণ করেন নাই, এবং যোগকে অষ্টাঙ্গ না বলিয়া ষড়ঙ্গ বলিয়াছেন,—

আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি বদন্তি ষট্‌॥

যাহা মানবমাত্রের সাধারণ ধর্ম্ম, তাহা বিশেষভাবে যোগের অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ নিষ্প্রয়োজন। হঠপ্রদীপিকায় দশটি যম ও দশটি নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং কৃপার্জ্জবম্‌।
ক্ষমাধৃতি র্মিতাহারঃ শৌচং চেতি যমা দশ॥
তপঃ সন্তোষ আস্তিক্যং দানং দেবস্য পূজনম্‌।
সিদ্ধান্ত শ্রবণঞ্চৈব হ্রীর্মতিশ্চ জপো হুতম্‌।
দশৈতে নিয়মাঃ প্রোক্তা যোগশাস্ত্র বিশারদৈঃ॥

—অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অচৌর্য্য), ব্রহ্মচর্য্য, কৃপা, অকপটতা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, মিতাহার ও শৌচাচার—এই দশটী যম। তপস্যা, সন্তোষ, আস্তিক্য (শাস্ত্র, গুরু ও ঈশ্বরে বিশ্বাস), দান, দেবপূজা, সিদ্ধান্তশ্রবণ (শাস্ত্র ও মহাপুরুষদের যাহা সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত, তাহা গুরুদেবের নিকট শ্রবণ করিয়া এবং শাস্ত্রগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া অবগত হওয়া) পাপকার্য্যে লজ্জাবোধ, মতি (মনন—সদসদ্‌ বিচার), জপ (প্রণব বা গুরুদত্ত মন্ত্র মনে মনে আবৃত্তি), হোম (দেবতার উদ্দেশ্যে নিজের ভোগ্যবস্তু নিবেদন করিয়া দেওয়া ও

দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করা)—এই দশটীকে যোগশাস্ত্র বিশারদগণ নিয়ম বলেন। যোগশাস্ত্রে অহিংসা প্রভৃতির ফল এইরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে যে, অহিংসা পূর্ণরূপে স্বভাবে পরিণত হইলে সাধকের সমীপে সকল প্রাণীই হিংস্রভাব বর্জ্জিত ও ভয়শূন্য হয়; সত্য সম্পূর্ণ-রূপে স্বভাবে পরিণত হইলে বাক্য অব্যর্থ হয়; অস্তেয় প্রতিষ্ঠিত হইলে (কোন অবস্থায় কাহারও কোন বিষয়ের উপর লোভ জন্মিবার সম্ভাবনা দূরীভূত হইলে) নানাদিক হইতে ধনরত্ন ও উত্তম উত্তম ভোগ্য বস্তু সকল আপনা আপনি আসিয়া নিকটে উপস্থিত হয়; ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে অপ্রতিহত বীর্য্যলাভ হয়। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক শৌচাচারের ফলে একদিকে স্বদেহের প্রতি আসক্তি ও পরদেহের প্রতি আসঙ্গলিপ্সা বিনষ্ট হয়, অন্যদিকে অন্তঃকরণ নির্ম্মল, সুপ্রসন্ন, ও একাগ্র হইয়া অতীন্দ্রিয়-দর্শন-যোগ্যতা লাভ করে; সন্তোষের ফলে অপ্রমেয় সুখ সম্ভোগ হয়, তপস্যা প্রভাবে অশুদ্ধিক্ষয় ও কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধি হয়, ইত্যাদি। যোগিগণ এসব কথা কেবল কল্পনার, অনুমানের বা শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া বলেন না—প্রত্যক্ষ পরীক্ষার ফলে বলিয়া থাকেন। মহাভারতে ভীষ্মদেব বলিয়াছেন যে,—'প্রত্যক্ষহেতবো যোগাঃ সাংখ্যাঃ শাস্ত্র বিনিশ্চয়াঃ।'—যোগিগণের যুক্তি প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং জ্ঞানীদিগের যুক্তি শাস্ত্র বাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

যম নিয়ম ব্যতীত যোগের অন্য ছয় অঙ্গের মধ্যে আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার বহিরঙ্গ, এবং ধারণা, ধ্যান ও সমাধি

অন্তরঙ্গ। আসনজয়ী যোগী শীত, আতপ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, প্রভৃতি দ্বারা অভিভূত হন না, আলস্য, তন্দ্রা ও বহুবিধ ব্যাধি হইতেও মুক্ত থাকেন। শ্বাস প্রশ্বাস নিয়মনরূপ প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণস্পন্দকে আয়ত্ত করিতে পারিলে জ্ঞানাবরক কর্ম্মের ক্ষয় হয়, মনকে তত্ত্ববিশেষে স্থির করিয়া রাখিবার শক্তি জন্মে, এবং অন্যান্য অনেক ক্ষমতাও লাভ হয়। সর্ব্বদা অবহিত হইয়া সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ দ্বারা মনকে ও ইন্দ্রিয়গণকে বাহ্য বিষয়ের সংস্পর্শ হইতে যথাসম্ভব নিবৃত্ত রাখা এবং আন্তরভাব লইয়া থাকিতে বাধ্য করাই প্রত্যাহার সাধন। ইহা অভ্যস্ত হইলে মন ও ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করে। এই সব বহিরঙ্গ সাধনায় উল্লিখিতরূপে যে সকল অসাধারণ শক্তি সামর্থ্য ও ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, যোগসাধক যদি তাহাতে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হন, এবং সেই শক্তিকে অন্তরঙ্গ সাধনায় নিয়োজিত না করিয়া যদি অতি-প্রবল কল্যাণকর প্রয়োজন ব্যতীত তাহা বাহিরে প্রকাশ করেন, তবে তিনি যোগ হইতে ভ্রষ্ট হন ও তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়। সদা জাগ্রত তীক্ষ্ণ বিচার এবং সদ্‌গুরুর বিশেষ কৃপা ব্যতীত এই প্রলোভন ও মোহ হইতে উদ্ধার পাওয়া খুব কঠিন। মহাভারতে 'দুর্গস্তেষ মহাপন্থাঃ' বলিয়া উল্লেখ পূর্ব্বক ও বিবিধ উপমা প্রদর্শন পূর্ব্বক যোগসাধককে সাবধান করিয়াছেন।

এই সব শক্তি ও ঐশ্বর্য্য সাধকের লক্ষ্য নহে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ যোগাঙ্গসাধনার অবশ্যম্ভাবী ফল। সুতরাং আধ্যাত্মিক চরম কল্যাণ লাভ করিতে হইলে এ সকলের উপরও

তীব্র বৈরাগ্য করিতে হইবে। সংসারাসক্তির ন্যায় এ সকলের প্রতি আসক্তিও সুতীক্ষ্ণ বিচারাস্ত্র দ্বারা ছিন্ন করিতে হইবে; ইহাদের প্রয়োজনীয় অংশ মাত্র অন্তরঙ্গ সাধনের সাহায্যার্থ প্রয়োগ করিতে হইবে। যথার্থ যোগিগণ তাহাই করিয়া থাকেন। যাহারা শক্তিকে ধারণ করিতে না পারিয়া প্রকাশ করে, তাহারা দুর্ব্বল; যাহারা নিজেদের এই সব শক্তি দর্শনে চমৎকৃত হইয়া অথবা প্রলোভনে পড়িয়া তাহা লইয়া ক্রীড়া করে, তাহারা মূর্খ; যাহারা ইহা দ্বারা লোক সকলকে চমৎকৃত করিতে চায়, তাহারা যোগিকুলকলঙ্ক।

ধারণা, ধ্যান ও সমাধির অভ্যাস যোগের অন্তরঙ্গ সাধনা। বেদান্তোপদিষ্ট নিদিধ্যাসনেরই এই তিনটি স্তর। নাভিচক্র, হৃদয়কমল, নাসিকাগ্র, জিহ্বাগ্র, মূর্দ্ধকেন্দ্র প্রভৃতি শরীরের কোন বিশেষ প্রদেশে, অথবা শরীরের বাহিরে ঘট, প্রতিমা, দীপশিখা, সূর্য্যমণ্ডল, চন্দ্রমণ্ডল প্রভৃতি বিশেষস্থানে, কিংবা অন্তঃকরণের কোন বিশেষ ভাবে, বা ভগবানের কোন বিশেষ নামে বা রূপে, ধ্যেয় বস্তুর প্রতিষ্ঠা করিয়া, দেহেন্দ্রিয়ের সংযমন পূর্ব্বক চিত্তকে তাহাতে আবদ্ধ রাখার নাম ধারণা।

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥

গীতোক্ত এই শ্লোকে আত্মবিষয়ক ধারণাই উপদিষ্ট হইয়াছে। ধারণা অভ্যস্ত হইলে, চিত্তবৃত্তি যখন অন্যবিষয়ের দিকে ধাবিত না হইয়া তৈলধারার ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন একতানতার

সহিত ধ্যেয়াকারে আকারিত হইয়াই প্রবাহিত হয়, তখনই ধ্যান হয়। ধ্যানের চরম উৎকর্ষের নাম সমাধি। ধ্যান যখন এরূপ প্রগাঢ় হয় যে, তাহাতে কেবল ধ্যেয় বিষয়েরই উপলব্ধি হইতে থাকে, ধ্যেয়াকার বৃত্তি ভিন্ন আর কোনও বৃত্তিই চিত্তে থাকে না, এমন কি নিজের পৃথক্ সত্তার ও উপলব্ধি হয় না, চিত্ত সম্পূর্ণরূপে ধ্যেয়ময় হইয়া ধ্যেয়েরই আকার প্রাপ্ত হয়, তাদৃশ চিত্তস্থৈর্য্য বা চিত্তবৃত্তি নিরোধই সমাধি নামে অভিহিত হয়। আত্মা, ব্রহ্ম বা ঈশ্বরে সমাধি ব্যতীত পরমার্থ সিদ্ধি হয় না। সমাধির ফলেই যথার্থ প্রজ্ঞা বা তত্ত্বজ্ঞান হয়, পরমতত্ত্বের অপরোক্ষ অনুভূতি হয়।

ধারণা, ধ্যান ও সমাধি নানা বাহ্য ও আন্তর বিষয়ে প্রয়োগ করিয়া নানা প্রকার বিভূতি ও সিদ্ধিলাভ করা যায়। সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রভৃতিও লাভ করা যায় বলিয়া যোগ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। কিন্তু 'তে সমাধৌ উপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ' (যোগসূত্র ৩।৩৭)—যোগলব্ধ নানা প্রকার শক্তি ও বিভূতি ব্যুত্থান অবস্থাতে সিদ্ধি হইলেও, সমাধিতে তাহারা বিঘ্নস্বরূপ, সমাধিদ্বারা লভ্য অব্যাহত পরমাত্ম সাক্ষাৎকারের তাহারা বিরোধী, তাহারা চিত্তকে বহির্মুখ করে এবং চরম লক্ষ্যসাধনে অন্তরায় হয়। সুতরাং সকল প্রকার শক্তি, বিভূতি বা সিদ্ধিতে বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক সমাহিত হইয়া জন্ম মৃত্যু ক্রিয়ার অতীত হইতে হইবে, কৈবল্য লাভ করিতে হইবে—ইহাই যোগশাস্ত্রের উপদেশ।

যোগিগুরু দত্তাত্রেয় বলিয়াছেন,—

> সমভ্যসেৎতদা ধ্যানং ঘটিকাষষ্ঠিমেবচ।
> বায়ুং নিরুধ্য তাং ধ্যায়েৎ দেবতা মিষ্টদায়িনীম্॥
> সগুণ ধ্যানমেতৎস্যা দণিমাদি সুখপ্রদম্।
> নির্গুণং খমিব ধ্যায়ন্ মোক্ষমার্গে প্রবর্ত্ততে॥
> নির্গুণধ্যান সম্পন্নঃ সমাধিং চ সমভ্যসেৎ।
> দিনদ্বাদশকেনৈব সমাধিং সমবাপ্নুয়াৎ॥

দিবাভাগের ষাট দণ্ড কালই ধ্যান অভ্যাস করিবে। বায়ু নিরোধ করিয়া (প্রাণায়াম করিয়া) সেই ইষ্টদায়িনী দেবতাকে ধ্যান করিবে। ইহার নাম সগুণ ধ্যান। ইহার ফলে অণিমাদি সুফললাভ হয়। (ইহাতে বৈরাগ্য করিয়া) আকাশের ন্যায় নির্গুণ ব্রহ্মের ধ্যান অভ্যাস করিলে মোক্ষমার্গে অগ্রসর হওয়া যায়। নির্গুণ ধ্যান সম্পন্ন হইয়া সমাধি অভ্যাস করা উচিত। এইরূপ নিত্যনিরন্তর নির্গুণ ধ্যান অভ্যাস করিলে দ্বাদশ দিনেই (অর্থাৎ অত্যল্প কালেই) সমাধির প্রতিষ্ঠা হয় ও তাহার ফলে কৈবল্য বা মোক্ষলাভ হয়।

মোক্ষলাভ হইলে অনন্ত কালের জন্য যে পরমানন্দলাভ করা যায়, তাহার তুলনায় ঐশ্বর্য্য ও শক্তিজনিত সকল আনন্দই নিতান্ত তুচ্ছ। ক্ষুদ্রহৃদয় যোগিগণই যোগলব্ধ ঐশ্বর্য্যে মত্ত হয় ও মোক্ষ হইতে বঞ্চিত হয়। যথার্থ যোগিগণ মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যেই পূর্ব্বোক্তরূপ যোগাঙ্গসকলের অনুষ্ঠান করেন। পতঞ্জলি বলিতেছেন,—'যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবি-

বেকখ্যাতেঃ, (যোগসূত্র ২।২৮)—যোগাঙ্গানুষ্ঠান দ্বারা অশুদ্ধিক্ষয় হইলে বিবেকখ্যাতি (প্রকৃতিবিবিক্ত আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার) পর্য্যন্ত জ্ঞান দীপ্তি হইতে থাকে।

যোগাধিকারী সাধকগণকে এইরূপ মোক্ষপ্রদ যোগপথে আনয়ন করিবার জন্যই যোগিগুরু গোরক্ষনাথ নাথ-যোগি-সম্প্রদায়ের সংগঠন করিয়াছিলেন।

নাথ-যোগি সম্প্রদায়

স্মরণাতীত কাল হইতে আর্য্য সমাজে যোগমার্গ প্রচলিত আছে এবং যোগি সম্প্রদায়ও বর্ত্তমান আছে, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কালের গতিতে যোগি সম্প্রদায় নানা ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের মধ্যে নানা-প্রকার তান্ত্রিক আচার ব্যবহার প্রবেশ করিয়াছিল এবং নানা প্রকার ব্যভিচারও উপস্থিত হইয়াছিল। নানা সম্প্রদায়ের সহিত সংঘর্ষে এবং নানারূপ সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতায় তাহাদের অবস্থা আধ্যাত্মিক কল্যাণলাভের অনুকূল না হইয়া প্রতিকূলই হইয়া পড়িয়াছিল। এরূপ অবস্থা সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে যে সিদ্ধ মহাপুরুষদের আবির্ভাব হইত না, এমন নহে। সমাজের ও সম্প্রদায়ের বিশৃঙ্খল অবস্থা সাধকদের সিদ্ধিলাভের পথ কণ্টকাকীর্ণ করিলেও তীব্র পুরুষকারসম্পন্ন সাধক স্বীয় শক্তি বলে সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। এরূপ সাধক সমাজে বা সম্প্রদায়ে যতদিন বিদ্যমান থাকেন, ততদিন নানা ব্যভিচার সত্ত্বেও তাহার জীবনীশক্তি থাকে, এবং শুদ্ধতা কতক পরিমাণে বজায় থাকে। কিন্তু বিধাতার নিকট হইতে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন কোন মহাপুরুষ সমাজে বা সম্প্রদায়ে অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে দেশ কাল ও অবস্থার উপযোগি-ভাবে সংগঠিত ও সুশৃঙ্খলিত না করিলে, যুগবিপ্লবের মধ্যে

আপনার বৈশিষ্ট্য পবিত্রভাবে রক্ষা করা এবং আপনার স্বাস্থ্য, বল ও কল্যাণপ্রদ সম্পদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥' বিশেষ বিশেষ যুগসন্ধিতে ভগবানের বিশেষ শক্তির বিকাশেই সমাজে ও সম্প্রদায়ে পাপের বিনাশ ও পুণ্যের অভ্যুত্থান হইয়া ধর্ম্মসংস্থাপন হইয়া থাকে। যোগিসম্প্রদায়ে এরূপ বিশেষ ভগবৎশক্তির বিকাশই গোরক্ষনাথের ভিতর দিয়া হইয়াছিল। জ্ঞানি-সম্প্রদায়ে যেমন শঙ্করের আবির্ভাব, ভক্ত-সম্প্রদায়ে যেমন রামানুজ এবং তৎপরে চৈতন্য, নানক ও কবীরের আবির্ভাব, যোগিসম্প্রদায়েও সেইরূপ গোরক্ষনাথের আবির্ভাব। ইঁহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব সম্প্রদায় ও সমাজের যুগোপযোগী পুনর্গঠন ও সুশৃঙ্খলতা সম্পাদনের ভিতর দিয়া সমগ্র হিন্দু জাতির—এবং সেই সূত্রে সমগ্র বিশ্বমানবের—ধর্ম্মোন্নতি ও সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

যোগিগুরু গোরক্ষনাথ স্বয়ং তপস্যা ও যোগসাধনা দ্বারা যোগসিদ্ধি ও জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া বিশ্বমানবের কল্যাণের উদ্দেশ্যে যোগিসম্প্রদায় সংগঠন করিতে এবং জনসাধারণের মধ্যে যোগধর্ম্ম ও শৈবোপাসনা প্রচার করিতে আত্মশক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তিনি তৎকালীন বিশৃঙ্খল যোগিসম্প্রদায় সমূহকে এক অখণ্ড যোগিসম্প্রদায়ে সংগ্রথিত করিলেন, এবং তাহাদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে শাখা-বিভাগ

করিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, বর্ত্তমানে যোগিসম্প্রদায় যে-সব 'পন্থ' বা শাখায় বিভক্ত, গোরক্ষনাথ স্বয়ং তাহাদের প্রবর্ত্তক নহেন, এ সকল পন্থ-বিভাগ তৎসম্প্রদায়বর্ত্তী মহাপুরুষগণ পরে করিয়াছিলেন। নাথ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি, বিস্তার, প্রভৃতি সম্বন্ধে নিশ্চিত ঐতিহাসিক তত্ত্ব এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। এ সব বিষয়ে যত প্রকার কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, সে সকল সংগ্রহ ও পরীক্ষা করিয়া ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করিবার যথোচিত চেষ্টাও এখন পর্য্যন্ত হয় নাই। যাহা হউক, নাথ-সম্প্রদায়ের কেন্দ্র ভূমি গোরক্ষপুরে সাধুগণের মধ্যে যেরূপ কিম্বদন্তী যথার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে, তদনুসারে এই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

নাথ যোগি সম্প্রদায় দ্বাদশ পন্থ বা শাখায় বিভক্ত। যথা,—সত্যনাথী, ধর্ম্মনাথী, রামপন্থ, নাটেশ্বরী, কম্বড়, কপিলানি, বৈরাগ, মাননাথী, আইপন্থ, পাগলপন্থ, ধ্বজপন্থ, গঙ্গানাথী। এই হেতু, শঙ্করের দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ন্যায়, ইহারা বারপন্থী যোগি সম্প্রদায় বলিয়া আখ্যাত। প্রত্যেক পন্থেরই এক একটি বিশেষ মুখ্য 'স্থান' আছে, এবং এক এক অঞ্চলে এক এক পন্থের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। পুণ্যক্ষেত্রকেই নাথ-যোগিগণ 'স্থান' আখ্যা দিয়া থাকেন। পন্থ সমূহের প্রায় প্রত্যেকটীই কোনও দেবতা বা পৌরাণিক মহাপুরুষকে আপনার মূল প্রবর্ত্তক বলিয়া নির্দ্দেশ করে।

১। সত্যনাথী পন্থ যোগিগুরু সত্যনাথ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত;

তিনি ব্রহ্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া কীর্ত্তিত হন। এই হেতু সত্যনাথী যোগীদিগকে 'ব্রহ্মার যোগী' বলা হইয়া থাকে। উড়িষ্যা প্রদেশে পাতাল ভুবনেশ্বর এই পন্থের মুখ্য স্থান বলিয়া কথিত হয়।

২। ধর্ম্মনাথী পন্থের মূল প্রবর্ত্তক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির। ইহার মুখ্য স্থান নেপাল রাজ্যস্থিত দুল্লুদেলক, বর্ত্তমান কপিলাবস্তু হইতে ১০০ মাইল উত্তর-পশ্চিম কোণে।

৩। রামপন্থের প্রবর্ত্তক ত্রেতাযুগের শ্রীশ্রীরামচন্দ্র। শ্রীরামচন্দ্রের সময় হইতেই এই পন্থ চলিয়া আসিতেছে, ইহা এই সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুদের বিশ্বাস। ইহার মুখ্যস্থান চৌক তাপ্পে পাঁচোয়াড়া (গোরক্ষপুর সদর মহকুমার অন্তর্গত)। কিন্তু এই 'স্থান' গ্রামে অবস্থিত বলিয়া এই পন্থের সাধুগণ গোরক্ষপুরকেই মুখ্য স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

৪। নাটেশ্বরী পন্থিগণ লক্ষ্মণের যোগী বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়া থাকেন। ইঁহাদের মুখ্যস্থান গোরক্ষ টিলা, পঞ্জাবে জেলম জিলার অন্তর্গত, রোতস্ গড়ের নিকট একটি পাহাড়ে অবস্থিত। এই পন্থের দুইটী উপশাখা বর্ত্তমানে প্রসিদ্ধ,—(১) নাটেশ্বরী, (২) দরিয়ানাথী।

৫। কন্থড়-যোগিগণ গণেশের যোগী বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করেন। ইঁহাদের মুখ্যস্থান মানফারা, কচ্ছভুজ রাজ্যে অবস্থিত।

৬। কপিলানি—এই পন্থ কপিল মুনি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত। ইহার মুখ্যস্থান গঙ্গাসাগর। বর্ত্তমানে কলিকাতার নিকটে দমদমায় গোরক্ষবংশী এই পন্থের প্রধান স্থান।

৭। বৈরাগ পন্থ রাজা ভর্ত্তৃ-হরি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত। ইহার মুখ্যস্থান রাতাডুঙ্গা—আজমীঢ়ের নিকটবর্ত্তী, পুষ্কর হইতে ৬ মাইল পশ্চিমে।

৮। মাননাথী পন্থের প্রবর্ত্তক মহারাজ গোপীচাঁদ। ইহার মুখ্যস্থান অজ্ঞাত; বর্ত্তমানে যোধপুরে মহামন্দির মঠ এই পন্থের প্রসিদ্ধ 'স্থান'।

৯। আইপন্থ ভগবতী বিমলা হইতে প্রবর্ত্তিত বলিয়া কথিত হয়। ইহার মুখ্যস্থান যোগীগুফা বা গোরক্ষকুঁই। ইহা প্রাচীন গৌড়ের অন্তর্গত, বর্ত্তমান দিনাজপুর জিলায় অবস্থিত।

১০। পাগলপন্থ যোগিগুরু চৌরঙ্গিনাথ (ইনি পূরণ ভকত নামে প্রসিদ্ধ) কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত। ইহার মুখ্যস্থান বোহর—প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে ৩৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

১১। ধ্বজপন্থ হনুমানজী হইতে প্রবর্ত্তিত। এই পন্থের কোন প্রসিদ্ধ স্থান বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে আছে বলিয়া জানা যায় না।

১২। গঙ্গানাথী পন্থের প্রবর্ত্তক গঙ্গাপুত্র ভীষ্মদেব। ইহার মুখ্যস্থান জখবার, পঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত—পাঠান কোট হইতে ৬ মাইল দূরে।

এই বার-পন্থ ব্যতীত নাথযোগি সম্প্রদায়ের আরও অনেক শাখা-প্রশাখা আছে এবং তাহাদের খুব বড় বড় 'স্থান' বা আশ্রম বিদ্যমান আছে। যথা,—

(১) সিদ্ধ কেরাণা—এই 'স্থান' পঞ্জাবে প্রথমতঃ সাহপুরে ছিল, বর্ত্তমানে সারগোদার অন্তর্গত।

(২) পেশাওয়ার—এই স্থান রতননাথের নামে প্রসিদ্ধ। এই পন্থের নাম রতননাথী। কুরুক্ষেত্রের নিকট।

(৩) ভেড়া—ইহা পীর কায়ানাথের নামে প্রসিদ্ধ। এই শাখার নাম পীর কায়ানাথী।

(৪) দিনোদর—কচ্ছরাজ্যে অবস্থিত। এই শাখা ধর্ম্মনাথী পন্থের অধীনতা স্বীকার করে।

(৫) গোরক্ষমণি বা গোরক্ষমঁড়ি—জুনাগড় রাজ্যে, প্রভাস-ক্ষেত্র হইতে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত।

এই সমুদয় স্থান ব্যতীত সিদ্ধ যোগিগণ আপনাদের তপস্যা-প্রভাবে অনেক প্রসিদ্ধ স্থানের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রায় সব প্রদেশেই নাথযোগী সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান স্থান বা আশ্রম প্রতিষ্ঠিত আছে। ভারতবহির্ভূত অনেক স্থলেও নাথ-যোগীদের আস্তানা ও প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়।*

* বঙ্গদেশে দমদমার গোরক্ষবংশী, দিনাজপুরের যোগিগুহা, বগুড়ার যোগিভবন, বর্দ্ধমানের মহানাদ-মন্দির, মেদিনীপুরের যোগিমঠ এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক মঠ, মন্দির ও আশ্রম বর্ত্তমান সময়েও নাথযোগিগণ কর্তৃক সজীবভাবে বা নির্জীবভাবে পরিচালিত হইয়া এই সম্প্রদায়ের পূর্ব্বপ্রভাবের পরিচয় প্রদান করিতেছে। কালী-ঘাটের কালী গোরক্ষনাথের এক প্রধান কীর্ত্তি। চন্দ্রনাথ, আদিনাথ প্রভৃতি তীর্থও নাথসম্প্রদায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। প্রধানতঃ গোরক্ষনাথ ও তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্যগণই আপনাদের জীবন ও উপদেশের প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের নাস্তিকভাব বঙ্গদেশ হইতে দূরীভূত করিয়া অসংখ্য বৌদ্ধকে শৈবধর্ম্মের পতাকায় নিয়ে আনয়ন করিয়াছিলেন, এবং তাহার ফলে এক সময়ে নাথসম্প্রদায় বঙ্গদেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। বোম্বাই অঞ্চলে সাতারায় বত্রিশসরালা, পুণায় গম্ভীরমঠ (সিদ্ধ মহাত্মা গম্ভীরনাথের মঠ) নাসিকে ত্র্যম্বক, বোম্বাইয়ে পাওধুণী, মহীশূর অঞ্চলে হাওীভয়ঙ্গনাথের মন্দির, মাদ্রাজ অঞ্চলে চুকুলগিরিও কাদ্রি প্রভৃতি মঠ, সারমোর রাজ্যে কালীবাড়ী ও গম্ভীরনাথের টিলা, ও অন্যান্য বহু 'স্থান' গোরক্ষনাথীদের কীর্ত্তি ও

নাথ-যোগী সম্প্রদায় যত শাখাতেই বিভক্ত হউক না কেন, এবং কতকগুলি গৌণবিষয়ে তাহাদের মতে ও আচারে অবান্তর পার্থক্য যাহাই থাকুক না, সাধ্য সাধন সম্বন্ধীয় প্রধান বিষয়ে তাহাদের সকলেরই মত ও আচার ব্যবহার প্রায় এক প্রকার। তাহারা সকলেই যে এক বিরাট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, তাহার পরিচয় প্রত্যেক শাখার মতে ও আচারে জাজ্বল্যমান। এই সম্প্রদায়ের যেসব প্রধান প্রধান স্থান, ক্ষেত্র, মন্দির বা মঠ আছে, তাহাদিগকে প্রত্যেক শাখাই অতি পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকে এবং সে সকল স্থানে প্রত্যেক পন্থের যোগিগণই ভক্তিপূর্ব্বক পূজার্চ্চনাদি

প্রভাব বিজ্ঞাপিত করিতেছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে যোগিসম্প্রদায়ের অসংখ্য মন্দির বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে আগ্রার নীলকণ্ঠ মহাদেব, পঞ্চমুখী মহাদেব ও মঙ্গলেশ্বর, কাশীধামে গোরক্ষটিল্লা, জয়পুরে হিঙ্গুয়া মঠ, বিকানীরে নোহর মঠ, যোধপুরে মহামন্দির মঠ, উদয়পুরে লাছুবাস ও আঙ্গিনা, গোয়ালিয়রে ভর্ত্তৃগুফা, সিন্ধুপ্রদেশে শিকারপুর ও শক্কর, কচ্ছরাজ্যে দিনোদর ও মনোফরা, আবুপাহাড়ে ভর্ত্তৃগুফা, গিরনারে গোরক্ষক্ষেত্র ও ভর্ত্তৃগুফা, জম্বুতে পিরখোহ্ সমধিক প্রসিদ্ধ। দিল্লী ও তন্নিকটবর্ত্তী ৬।৭ জিলায় প্রায় প্রতি নগরে ও গ্রামে এই সম্প্রদায়ের মঠ দৃষ্ট হয়। লাহোর, অমৃতসহর, আলমোড়া প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ সহরে এখনও নাথপন্থীদের বিভিন্নশাখা কর্ত্তৃক পরিচালিত মঠ-মন্দির সমূহ লোককোলাহলের মধ্যেও সাধুদিগকে যোগসাধনায় সুবিধা প্রদান করিতেছে। নেপাল রাজ্যে সর্ব্বত্র গোরক্ষনাথ ও তাঁহার ভক্তদের মাহাত্ম্য-বিজ্ঞাপক মঠ-মন্দির ও আশ্রম জীবন্তভাবে বিদ্যমান থাকিয়া ধর্ম্মপিপাসু দিগের চিত্তাকর্ষণ করিতেছে। বেলুচিস্থান, আফগানিস্থান, ইরাণ ও তিব্বতে নাথসম্প্রদায়ভুক্ত অনেক যোগী ও তাহাদের আস্তানা বিদ্যমান আছে বলিয়া সাধুরা বলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে কোহাট প্রভৃতি স্থানে এখনও নাথসম্প্রদায় সংশ্লিষ্ট বহু মন্দির বর্ত্তমান রহিয়াছে। তিব্বতে গোরক্ষনাথের চরিত্র ও যোগৈশ্বর্য্য সম্বন্ধে বহু কিম্বদন্তী প্রচলিত এবং তাঁহার ও তৎসম্প্রদায়ের অনেক কীর্ত্তিচিহ্ন বিদ্যমান দেখা যায়।

করিয়া থাকেন। এমন কতকগুলি 'স্থান' আছে, যেখানে প্রত্যেক পন্থই সমান অধিকার দাবী করে। সকল পন্থই শ্রীশ্রীআদিনাথকে সম্প্রদায়ের আদিপুরুষ বলিয়া স্বীকার করেন। আদিনাথ কোন পূর্ব্বতন যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ, অথবা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের 'আদিবুদ্ধের' ন্যায় কল্পিত আদিপুরুষ, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সাম্প্রদায়িকগণ বলিয়া থাকেন যে, আদিনাথ স্বয়ং শিবজী, বা স্বয়ং শিবজীই আদিনাথ, এবং মূলতঃ সমগ্র নাথযোগী সম্প্রদায়ই শৈব-সম্প্রদায়, ও সকলেরই মূল-উপাস্য শিব। শিবজীই এক অদ্বিতীয় সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারী জগদ্গুরু সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মা পরমেশ্বর। যদিও নাথ-যোগী সম্প্রদায়ে অনেক মহাসিদ্ধ পুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন, তথাপি সকল পন্থই গোরক্ষনাথকে শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিয়া থাকেন, এবং তাঁহাকে শিবের অবতার ও অমর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। নাথ সম্প্রদায়ের অনেক প্রধান প্রধান 'স্থান'ই গোরক্ষনাথের নামানুসারে আখ্যাত হইয়া থাকে। নাথ-সম্প্রদায়ের সকল পন্থেরই সংস্কার ও ক্রিয়াকাণ্ড প্রায়শঃ এক প্রকার। গো-সেবা ও গোরক্ষার প্রতি সকল নাথযোগীরই বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, সমগ্র হিন্দু সমাজে আপামর সাধারণের মধ্যে গো-জাতির প্রতি যে এত শ্রদ্ধা ও আদর দেখা যায় এবং হিন্দু মাত্রই যে গোরক্ষা ও গোসেবার প্রতি এত আগ্রহসম্পন্ন, তাহার মূলে যোগিগুরু গোরক্ষনাথেরই অলোকসামান্য প্রভাব। তাঁহারা আরও বলেন যে,

গো-জাতির সেবা শুশ্রূষা ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি তাঁহার এরূপ আগ্রহ ছিল বলিয়া এবং ইহাকে হিন্দু ধর্ম্মের অন্যতম প্রধান অঙ্গরূপে জন-সাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া ছিলেন বলিয়াই তিনি সর্ব্বত্র গোরক্ষনাথ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। সে যাহাই হউক, সমগ্র হিন্দু সমাজের উপর গোরক্ষনাথ যে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহ।

যোগিসম্প্রদায়ের একটি সাধারণ বিশ্বাস এই যে, এ সম্প্রদায়ে সকল সময়েই এক বা ততোধিক সিদ্ধপুরুষ বিদ্যমান থাকেন; পূর্ব্বেও বহু সিদ্ধপুরুষ জীবন্মুক্ত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিয়াছেন, এখনও কেহ কেহ করেন। হঠপ্রদীপিকায় অনেক মহাসিদ্ধ যোগিপুরুষের উল্লেখ আছে। যথা,—

শ্রীআদিনাথ মৎস্যেন্দ্র সারদানন্দ ভৈরবাঃ।
চৌরঙ্গী মীন গোরক্ষ বিরূপাক্ষ বিলেশয়াঃ॥
মন্থান ভৈরবো যোগী সিদ্ধবোধশ্চ কন্থড়ী।
কোরন্তকঃ সুরানন্দঃ সিদ্ধপাদশ্চ চর্পটী॥
কণেরিঃ পূজ্যপাদশ্চ নিত্যনাথো নিরঞ্জনঃ।
কাপালি বিন্দুনাথশ্চ কাকচণ্ডীশ্বরো ময়ঃ॥
অক্ষয়ঃ প্রভুদেবশ্চ ঘোড়াচূলী চ টিণ্টিনী।
ভল্লটির্নাগবোধশ্চ খণ্ডকাপালিকস্তথা॥
ইত্যাদয়ো মহাসিদ্ধা হঠযোগ প্রভাবতঃ।
খণ্ডয়িত্বা কালদণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডে বিচরন্তি যে॥

আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, সারদানন্দ, ভৈরবনাথ, চৌরঙ্গীনাথ,

মীননাথ, গোরক্ষনাথ, বিরূপাক্ষনাথ, বিলেশয়নাথ, মন্থান ভৈরব, সিদ্ধবোধ, কন্থড়ীনাথ, কোরণ্ডকনাথ, সুরানন্দ, সিদ্ধপাদ, চর্পটীনাথ, কণেরিনাথ, পূজ্যপাদ, নিত্যনাথ, নিরঞ্জননাথ, কাপালিনাথ, বিন্দুনাথ, কাকচণ্ডীশ্বর, ময়নাথ, অক্ষয়নাথ, প্রভুদেব, ঘোড়াচূলীনাথ, টিণ্টিনীনাথ, ভল্লটীনাথ, নাগবোধ, খণ্ডকাপালিক, ইত্যাদি বহু মহাসিদ্ধ পুরুষ হঠযোগ প্রভাবে কালদণ্ড খণ্ড করিয়া ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করিতেছেন। দশনামী সন্ন্যাসিগণ যেমন তীর্থ, আশ্রম, সরস্বতী, পুরী, ভারতী, বন, আরণ্য, গিরি, পর্ব্বত ও সাগর—এই দশ প্রকার উপাধির মধ্যে স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক বিভাগ অনুসারে কোন একটি উপাধি গুরু প্রদত্ত নামের সহিত গ্রহণ করিলেও সকলেরই সাধারণ উপাধি 'স্বামী'; সেইরূপ যোগিগণের সাধারণ উপাধি 'নাথ', তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত বার-পন্থায় বিভক্ত হইলেও তাঁহাদের নামের বা উপাধির মধ্যে স্ব স্ব পন্থার বিশেষ কোন নিদর্শন রাখেন না। ভোগাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া তাঁহারা স্বকীয় দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের উপরে এবং কর্ম্মভোগময় সংসারের উপরে 'নাথত্ব', 'স্বামিত্ব' বা আধিপত্য লাভ করেন বলিয়াই সম্ভবতঃ তাঁহারা ঐরূপ উপাধির অধিকারী হন। রাজা ভর্ত্তৃহরিও গোরক্ষনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহত্যাগ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। বৈরাগ্-পন্থা তাঁহার প্রবর্ত্তিত বলিয়া কথিত হয়।

নাথ সম্প্রদায়ের সাধকগণের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দীক্ষা প্রচলিত আছে। প্রথমতঃ মন্ত্রদীক্ষা। ইহাতে গুরু শিষ্যের কাণে

শক্তিসমন্বিত পবিত্র সিদ্ধমন্ত্র প্রদান করেন। শিষ্য গুরুর উপদেশ অনুসারে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া, গুরুদত্ত মন্ত্র ঐকান্তিকতার সহিত যথাবিধি জপ করিতে থাকিলে, উহার প্রভাবে পরম কল্যাণের অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারে। এই দীক্ষার সময়ে গুরু শিষ্যের অধিকার অনুসারে ভগবানের এক বা একাধিক নাম মনে মনে উচ্চারণ পূর্ব্বক জপ করিতেও দিতে পারেন, অথবা 'হংস' মন্ত্রেরও উপদেশ দিতে পারেন। গুরু গোরক্ষনাথ বলিয়াছেন,—

'হং' কারেণ বহির্যাতি 'স' কারেণ বিশেৎ পুনঃ।
হংস হংসেত্যমুং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা ॥
ষট্‌শতানি দিবারাত্রৌ সহস্রাণ্যেক বিংশতিঃ ॥
এতৎ সংখ্যান্বিতং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা।
অজপা নাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদায়িনী।
তস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

নিশ্বাস প্রশ্বাসের সময়ে 'হং' শব্দের সহিত বায়ু বহির্গত হয়, এবং 'স' শব্দের সহিত পুনরায় প্রবেশ করে। জীব স্বভাবতঃ সর্ব্বদা এই 'হংস' মন্ত্র জপ করিতেছে। দিবারাত্রিতে ২১৬০০ বার জীব এই মন্ত্র জপ করে। (প্রতি মিনিটে ১৫ বার শ্বাস-প্রশ্বাস হয়, এই হিসাবে ২৪ ঘণ্টায় ২৪ × ৬০ × ১৫ = ২১৬০০ বার হয়।) ইহা যদি প্রত্যেক শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত বুদ্ধি পূর্ব্বক স্মরণ করা যায় (অর্থাৎ প্রত্যেক শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত এই যে হংস জপ চলিতেছে, তাহা যদি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্বাস প্রশ্বাসের গতি লক্ষ্য করিয়া অনুভব করিতে থাকা যায়), তবে অজপা

নামক গায়ত্রীর সাধন হয়। এই অজপা গায়ত্রী যোগিগণের মোক্ষদায়িনী। হংস মন্ত্রের তাৎপর্য্য 'অহং সঃ'—'সোঽহং' অর্থাৎ আমি স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। শ্বাস প্রশ্বাস সর্ব্বদা আমাদিগকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। শ্বাসের গ্রহণ ও ত্যাগের মধ্যবর্ত্তীক্ষণে স্বভাবতঃ আমরা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তও হই। বুদ্ধিপূর্ব্বক শ্বাস প্রশ্বাসের অনুসরণ করিয়া সেই ভাবটি স্মরণ করিতে করিতে স্থায়ী করিবার চেষ্টাই এই সাধনের উদ্দেশ্য। এই মন্ত্রদীক্ষা গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী সকল সাধকই সদ্‌গুরুর নিকট গ্রহণ করিতে পারেন। সাধারণ ধর্ম্মপিপাসু গৃহী শিষ্যকে অন্তর্দর্শী গুরু সাধারণতঃ নাম জপেরই উপদেশ দিয়া থাকেন, বিশেষ ভাবে সাধনে নিমগ্ন হইতে ইচ্ছুক ও যোগ্য শিষ্যকেই তিনি হংস মন্ত্রের উপদেশ দেন। নাম জপই সহজতম সাধন।

যে সাধক সংসারের সহিত সকল সম্বন্ধ বর্জ্জন পূর্ব্বক সন্ন্যাস-জীবন অবলম্বন করেন, তাঁহার সেই সন্ন্যাস গ্রহণের একটি বিশেষ দীক্ষা আছে। গুরু তাঁহাকে কোন বিশেষ প্রকার অন্তরঙ্গ সাধনের উপদেশ দেন। তৎসঙ্গে সাম্প্রদায়িক আচারও কিছু আছে। গুরু স্বহস্তে কাঁচি দিয়া শিষ্যের শিখা বা একগোছা চুল কাটিয়া দেন ইহার নাম 'ঝুঁটি কাটা বা চুটী কাটা।' এই 'ঝুঁটি কাটা মুণ্ডনের অনুকল্প। ইহার তাৎপর্য্য এই যে গুরু শিষ্যের মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক পূর্ব্বজীবনের অবসান ও নবজীবনের আরম্ভ করিয় দিলেন। তখন সাধকের পুনর্জ্জন্ম। তখন হইতে গুরুই শিষ্যে পিতা, মাতা, আশ্রয়দাতা, পরিচালক ও অভিভাবক। এ

আধ্যাত্মিক নূতন জন্মগ্রহণের পর পূর্ব্বাশ্রমের সকল সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায়, ও সকল কর্ত্তব্যের অবসান হয়। তখন তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম গোত্রাদিরও বিসর্জ্জন হয়, এবং গুরু তাঁহাকে নূতন সন্ন্যাসোচিত নাম প্রদান করেন। ঝুঁটি কাটার সঙ্গে সঙ্গেই গুরু দুই তিন অঙ্গুলি পরিমিত একটি কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত বাঁশীর মত যন্ত্রবিশেষ রেশমসূত্রে বাঁধিয়া শিষ্যের গলায় মালার মত পরাইয়া দেন। ঐ বাঁশীটির নাম 'নাদ' ও ঐ সূত্র-মালার নাম 'সেলি'। নাদটি ঠিক হৃদ্‌যন্ত্রের উপরে লম্বিত থাকে। যোগিগণ বলিয়া থাকেন যে হৃদয়ের ভিতরে সর্ব্বদা 'অনাহত নাদ' ধ্বনিত হইতেছে। বাহ্যেন্দ্রিয় নিরুদ্ধ করিয়া সেই নাদের দিকে চিত্তকে একাগ্র করিলে ঐ একতান প্রণবধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। ভিতরে সেই নাদের কথা স্মরণ করাইয়া সর্ব্বদা সেই দিকে চিত্তকে সমাকৃষ্ট করিবার জন্যই সম্ভবতঃ বাহিরে এই কণ্ঠ-বিলম্বিত 'নাদ'-যন্ত্রের বিধান। শিষ্য গুরুকে বা দেবতাকে প্রণাম করিবার সময় ঐ নাদে ফুঁ দিয়া প্রণবধ্বনি করেন, এবং 'আদেশ' 'আদেশ' উচ্চারণ করেন। কোন উদাসীন সাধুর গলায় সেলি-লম্বিত নাদ দর্শন করিলেই তাঁহাকে নাথ-যোগি-সম্প্রদায় ভুক্ত বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ঝুঁটি-কাটা যোগিগণ 'অওঘর'-আখ্যা প্রাপ্ত হন। বলা বাহুল্য যে 'অঘোরপন্থী' বা 'অঘোরীদের' সহিত এই 'অওঘর' দিগের কোন সম্বন্ধ নাই। যে কোন সম্প্রদায়ের নরমাংসাহারাদি বীভৎস-আচার সম্পন্ন সাধুদিগকেই অঘোরী বলা হয়।

নাথযোগীদের মধ্যে আর এক প্রকারের দীক্ষা আছে। তখন গুরু শিষ্যের দুই কাণে দুইটি বৃহৎ ছিদ্র করিয়া দেন, এবং তাহাতে দুইটি কুণ্ডল পরাইয়া দেন। ঐ কুণ্ডল সাধারণতঃ প্রস্তর, বেলোয়ার বা গণ্ডারের শৃঙ্গে প্রস্তুত হয়। ঐ কুণ্ডলকে যোগিগণ শিবের কুণ্ডল বলিয়া বিশ্বাস করেন। এই কুণ্ডল-ধারণ প্রথা অতি প্রাচীন। মনুস্মৃতিতে ইহার বিধান পাওয়া যায়। নাথ সম্প্রদায়ের আদিপুরুষ আদিনাথ হইতে শিষ্য-পরম্পরাক্রমে যোগি সম্প্রদায়ে কুণ্ডল ধারণ প্রথা প্রচলিত আছে। উহার নাম 'মুদ্রা'। মুদ্রার অন্য একটি নাম 'দর্শন'। এই দীক্ষাই নাথ যোগীদের শেষ দীক্ষা। এই চরম দীক্ষাপ্রাপ্ত যোগিগণের 'কাণ ফাটা' অর্থাৎ কর্ণ ছিদ্র যুক্ত থাকে বলিয়া তাঁহারা 'কণ্‌ফট্‌ যোগী' আখ্যা প্রাপ্ত হন। তাঁহারা কর্ণে 'দর্শন' ধারণ করেন বলিয়া 'দর্শনী-যোগী' নামেও অভিহিত হন। উদাসীন যোগী হইলেই যে 'কণ্‌ফট্‌' হইতে হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই। যোগে সিদ্ধিলাভ করিবার জন্যও ইহার বিশেষ মূল্য বা আবশ্যকতা নাই। নাথ সম্প্রদায়ে অনেক সিদ্ধ মহাপুরুষের কথা শোণা যায়, যাঁহারা চিরজীবন 'অওঘর' ছিলেন, 'কণ্‌ফট্‌' হন নাই। কিন্তু 'কণ্‌ফট্‌' হইলে সাম্প্রদায়িক নিয়মে কতকগুলি বিশেষ সাম্প্রদায়িক অধিকার জন্মে। কেহ কেহ বলেন যে যোগি সমাজে অনধিকারীর প্রবেশ নিবারণার্থ এই দুঃখপ্রদ কর্ণচ্ছেদন রূপ কঠিন পরীক্ষার প্রথা যোগিগুরুগণ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। নাথ সম্প্রদায় ভুক্ত হওয়ার পরে

নানাবিধ শিক্ষাপ্রাপ্তি হইলে পরিপক্কাবস্থাতে কঠোরতম যোগাভ্যাসের অধিকার নির্ণয়ার্থে এরূপ ব্যবস্থা হইয়া থাকিতে পারে। কর্ণে ভার অর্পণ করিলে কঠোর যোগাভ্যাস জনিত মস্তক-স্পন্দনাদি রোগ প্রশমিত হয়, এরূপও শ্রুত হওয়া যায়।

চুটী কাটা ও কাণ ফাটা ব্যতীত 'উপদেশী' দীক্ষা নামক আর এক প্রকার দীক্ষা যোগীদের মধ্যে প্রচলিত আছে। এই দীক্ষা সাধারণতঃ চুটী কাটার পর হয়, কখন কখন কাণ ফাটার পরও হইয়া থাকে। কেহ চুটী কাটার (অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণের) পূর্ব্বে কোন যোগীর নিকট 'উপদেশ' লাভ করিলেও সন্ন্যাস গ্রহণের পর পুনরায় উপদেশী দীক্ষা গ্রহণের বিধি আছে। উপদেশী দীক্ষাকালে এক রাত্রি নানাপ্রকার অনুষ্ঠান করা হয়। যেমন,—মন্ত্রপূত জ্যোৎ-জাগান (প্রদীপ-প্রজ্বালন), হরপার্ব্বতী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, গণেশ ও গোরক্ষনাথের পূজা, ভাং,মদ্য, মাংস, প্রভৃতি দ্বারা আকাশ ভৈরবের পূজা, মন্ত্র-পাঠ, গান্, ইত্যাদি। যাহারা শুধু উপদেশী, তাহাদেরই তখন সেখানে প্রবেশাধিকার থাকে, অন্যের নহে।

উক্ত তিন প্রকার দীক্ষা যে একই গুরুর নিকট গ্রহণ করিতে হইবে, এরূপ কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই। একজন গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া, অপরের দ্বারা চুটী কাটাইয়া নাদ ও সেলি গ্রহণ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবিষ্ট হওয়া যায়, আবার তৃতীয় গুরুর দ্বারা কর্ণে ছিদ্র করাইয়া দর্শনী-যোগী হইতে পারা যায়। অবশ্য, এই প্রকারের স্বাধীনতা অন্যান্য সম্প্রদায়েও

আছে। গৃহস্থাশ্রমে এক গুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া, সন্ন্যাস গ্রহণের সময় অন্য গুরুর আশ্রয়গ্রহণ কোন সম্প্রদায়েরই রীতি-বহির্ভূত নয়। তদ্ভিন্ন, দীক্ষাগুরুর নিকট অপ্রাপ্ত বা অপ্রাপ্য বিশেষ কোন সাধন-জ্ঞান লাভ করিবার জন্য অন্য কোন বিশেষজ্ঞ মহাপুরুষকে গুরুপদে বরণ করিতেও কোন বাধা নাই। কিন্তু সকল গুরুকেই ভক্তি শ্রদ্ধা ও সেবা করা শিষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। কোন গুরু অপেক্ষা শিষ্য যদি সাধনে অধিক দূর অগ্রসরও হন, তথাপি গুরুকে ছোট মনে করা বা তাঁহার সেবায় ত্রুটি করা শিষ্যের পক্ষে অপরাধ। গুরু পতিত হইলে শিষ্য তাঁহাকে কি ভাবে উদ্ধার করেন, এবং উদ্ধার করিবার পরেও কি ভাবে সেই গুরুভক্তি ও গুরুসেবা অক্ষুণ্ণ রাখেন, গোরক্ষনাথ তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। গুরুর প্রতি অপরাধ করিলে শিষ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী।

কোন সাধক কোন বিশেষ ব্রত সম্পাদনের উদ্দেশ্যে অথবা বিশেষ কোন জ্ঞান বা সিদ্ধিলাভের উদ্দেশ্যে, নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসরের জন্য ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে পারেন, এরূপ আচার গোরক্ষনাথের সম্প্রদায়ে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা প্রকৃত পক্ষে সাম্প্রদায়িক রীতি নহে, রীতির ব্যভিচার মাত্র। বাঙ্গালী-রাজা গোবিন্দচন্দ্র গোরক্ষনাথ-শিষ্য হাড়িসিদ্ধার শিষ্যত্ব গ্রহণ-পূর্ব্বক দ্বাদশ বৎসর উদাসীন যোগী ছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে যে গৃহস্থ নাথ বা যোগী সম্প্রদায় বর্তমান আছে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে কেহ কেহ ব্রত-

সমাপনান্তে, কেহ কেহ বা প্রলোভনে পতিত হইয়া, ঔদাসীন্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রম পুনর্গ্রহণ করিয়াছিলেন, অনেকে তাহাদের সহিত নানা সম্বন্ধে যুক্ত হইয়া তাহাদের সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াছিলেন, এবং অনেকে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই যোগীদের শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ্য সমাজের কঠোর বিধি নিষেধের অতিক্রম-হেতু তৎকর্ত্তৃক বর্জ্জিত হইয়া যোগি সমাজে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যোগিগুরু গোরক্ষনাথ ও তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যদের প্রসাদে নাথ-যোগি সম্প্রদায়কে অবলম্বন করিয়া অনেক বৌদ্ধও দলে দলে শৈবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া হিন্দু সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন এবং সকল ক্ষেত্রে তাঁহারা ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ কর্ত্তৃক গৃহীত না হইলেও তাঁহারা হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত হইয়াই বর্ত্তমান আছেন। সাধু-নাথ-যোগীদের সহিত এই সব গৃহস্থ-নাথ-যোগীদের রীতিনীতি আচার ব্যবহার অনেকাংশে সাদৃশ্য দেখা যায়। বঙ্গদেশের সহিত নাথ-যোগি সম্প্রদায়ের যে বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, তাহা পুরাতন বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ইতিহাস আলোচনা করিলেই উপলব্ধি হয়। সমগ্র ভারতবর্ষেই নাথ-যোগি সম্প্রদায়ের কিরূপ বিস্তৃতি হইয়াছে, তাহা প্রথম অধ্যায়ে সংক্ষেপে সূচিত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে শঙ্করের জ্ঞান ও গোরক্ষনাথের যোগৈশ্বর্য্য লইয়া এক মহাপুরুষ নাথ-যোগি সম্প্রদায়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারই জীবনের সামান্য আভাস দিবার উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থের অবতারণা, এবং তাহারই অবতরণিকা স্বরূপে

সাধারণ ভাবে এই সম্প্রদায় ও তৎপ্রবর্ত্তক গোরক্ষনাথের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ আলোচিত হইল।

শ্রীশ্রীবাবা গম্ভীরনাথের
প্রথম জীবন, গৃহত্যাগ ও দীক্ষা গ্রহণ

যোগিরাজ শ্রীশ্রীবাবা গম্ভীরনাথ যোগিগুরু গোরক্ষনাথের আধ্যাত্মিক বংশধর। বর্ত্তমান যুগে নাথযোগি সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাসিদ্ধপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার জীবনের শেষ কয়েক বৎসর যোগি-সম্প্রদায়ের কেন্দ্রভূমি—যোগিগুরু গোরক্ষনাথের তপোভূমি—গোরক্ষপুরে গোরক্ষনাথ মন্দিরে লোকচক্ষুর সম্মুখে অবস্থান পূর্ব্বক মানব-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ব্রাহ্মীস্থিতি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সমসাময়িক ভারতবিশ্রুত মহাশক্তিধর মহাপুরুষগণ অনেকেই নানাভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন যে,—তত্ত্বজ্ঞানে, যোগৈশ্বর্য্যে ও জীবপ্রেমে—মানবজীবনের সকল বিভাগে—তাঁহার মত একজন পরিপূর্ণ মানুষ জগতে অতি বিরল দৃষ্ট হয়। মানব-জীবনের পরিপূর্ণতার অর্থ কি, তাহা যাঁহারা জন্মজন্মান্তরীণ সাধনার ফলে ও ভগবানের কৃপায় অন্ততঃ কতকপরিমাণেও আপনাদের হৃদয় দিয়া আস্বাদ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে সমর্থ হন। কিন্তু তাঁহারাও এরূপ জীবনের কোন সুস্পষ্ট সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আলেখ্য অঙ্কিত করিতে পারেন না। ভাষার সাহায্যে, লৌকিক জীবন সংক্রান্ত কতকগুলি ঘটনার বর্ণনার দ্বারা, এরূপ জীবনের কোন পরিচয় প্রদান করিতে পারা যায় না।

সাধারণের দৃষ্টিতে যাহা যাহা অলৌকিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এমন কতকগুলি ব্যাপার ও শক্তির খেলা এরূপ জীবনে নিতান্ত সাধারণ ব্যাপারের মত স্বভাবতঃই প্রত্যক্ষ করা যায় বটে; কিন্তু তদ্রূপ কতকগুলি ঘটনা বিবৃত করিলেও সেই জীবনের পূর্ণতা-জনিত সৌন্দর্য্যের কোন পরিচয় দেওয়া হয় না।

সাধারণ বুদ্ধির প্রয়োগ দ্বারা এরূপ একটি আদর্শ-জীবন সম্পূর্ণ চিনিয়া লওয়াও অসম্ভব। বর্ত্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, আমাদের সাধারণবুদ্ধি সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণাদি প্রক্রিয়া অবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্যকারণাদির অনুসন্ধান করিয়া জড়বস্তু সম্বন্ধেই একটা সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারে; কিন্তু যথার্থ জীবন-সম্বন্ধে সেরূপ জীবন্ত ধারণা করিতে পারে না। জীবন-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করার প্রণালী অন্য প্রকার। যে জীবনটিকে চিনিবার জন্য আগ্রহ জন্মে, সেই জীবনে যে সুরটি—যে রাগিণীটি—স্বভাবতঃ সঙ্গীত হইতেছে, সেই জীবন-বীণাটি যে সুরে বাঁধা হইয়া আছে, নিজের জীবনের সুরটি অন্ততঃ বিশেষ সময়ের জন্যও যদি সেই সুরের সহিত মিশাইয়া লওয়া যায়, উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয় গুলি ও অন্তঃকরণবৃত্তি গুলি সংনিয়ন্ত্রিত করিয়া স্বকীয় জীবন-বীণাটিকে যদি অন্ততঃ সাময়িক ভাবেও সেই সুরে বাঁধিয়া লইতে পারা যায়, তবে সেই জীবন-বীণাটিতে অনাহতভাবে সঙ্গীত-রাগিণীটি নিজের জীবন-বীণার তারে প্রতিধ্বনিত ও ঝঙ্কৃত হইয়া, সেই জ্ঞেয় জীবনের যথার্থ পরিচয় প্রদান করে। সুতরাং জীবন দ্বারাই জীবন চিনিতে হয়, বহির্দৃষ্টি-পরায়ণ স্থূল বুদ্ধি দ্বারা নয়। একজন

অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, "আপনি বলিয়া থাকেন,—'সমগ্র ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থান সকল পরিভ্রমণ করিয়াও বাবাজীর মত একজন মহাপুরুষ দেখিলাম না,' আপনার এই উক্তির প্রমাণ কি? আপনি বাবাজীর জীবনে এমন কি দেখিয়াছেন যাহা অন্য কোন মহাপুরুষের জীবনে দেখিতে পান নাই?" তিনি তাহার উত্তরে বলিলেন,—"সে কথা আমার প্রাণ বুঝিয়াছে। কিন্তু আমি তাহা যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা কার্য্যকারণ নির্দ্দেশ করিয়া বুঝাইতে পারি না।" হয়ত তিনি তাঁহার স্বকীয় বিশুদ্ধ জীবন দ্বারা বাবা গম্ভীরনাথের জীবনে পরিপূর্ণ-মানবত্বের যে আদর্শ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা আর কোথাও করেন নাই, সম্ভবতঃ বাবা গম্ভীরনাথের জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার জীবন-বীণাটি যেরূপ সুরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল, এরূপ আর কোথাও হয় নাই। এরূপভাবে দুইটী জীবন, আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে পরস্পরের সংস্পর্শে আসিয়া পরস্পরের প্রাণের স্পন্দন স্ব স্ব প্রাণে অনুভব করিয়া, পরস্পরকে যতদূর জানিতে ও বুঝিতে পারে, ব্যাবহারিক জীবনের সমস্ত বাহ্য ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হইয়াও অনেক সময় একজন অপরজনকে ততদূর জানিতে ও বুঝিতে পারে না। জীবন বাহ্যঘটনা সমূহের সমষ্টিমাত্র নহে। ব্যাবহারিক জীবনের ঘটনাবলী অন্তর্জীবনকে কতকটা প্রকাশ করে বটে, আবার অনেকটা আবৃতও করিয়া থাকে। অন্তর্দৃষ্টি ব্যতীত কাহারও অন্তর্জীবনের সহিত পরিচিত হওয়া সম্ভব নয়।

ভাষা আমাদের সাধারণবুদ্ধিলব্ধ ভাবসকলকেই প্রকাশ

করিতে সমর্থ, হৃদয়ের অন্তস্তলে অনুভূত ভাবসমূহ প্রকাশ করিতে তাহার ক্ষমতা অতি অল্প। কবিগণ আকার, ইঙ্গিত, ছন্দঃ, সুর প্রভৃতির সাহায্যে তাহার কতকাংশ বুঝাইতে চেষ্টা করেন, এবং অধিকাংশই শ্রোতার ও পাঠকের হৃদয় দিয়া অনুভব করিবার জন্য রাখিয়া দেন। যাঁহাদের হৃদয় সে সব ভাব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকে, তাঁহারাই সেই ভাষা ও আকার ইঙ্গিত প্রভৃতি অনুধাবন পূর্ব্বক তদ্‌ভাব-ভাবিত হইয়া স্বানুভব দ্বারা তাহা বুঝিতে পারেন। কেবলমাত্র ভাষার সাহায্যে সাধারণ-বুদ্ধির দ্বারা তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিলে ভাবের বাহিরেই অবস্থিতি হয়, ভিতরে প্রবেশলাভ ঘটে না। অতএব আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নত সোপানে অধিরূঢ় মহাত্মগণ যাঁহাকে একজন পূর্ণ-মহাপুরুষ বলিয়া নিজেদের হৃদয় দ্বারা অনুভব করিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার জীবন-চরিত লিখিয়া—অর্থাৎ বহির্জীবনের ঘটনাবলি বর্ণন করিয়া—সেই জীবনের একটি যথার্থ-আলেখ্য লোকের সম্মুখে উপস্থিত করিবার এবং তাহা সাধারণ বুদ্ধির বোধগম্য করিবার দাবী নিতান্ত অজ্ঞ ব্যতীত কেহ করিতে পারে না।

কিন্তু তথাপি এরূপ মহাপুরুষের জীবনের ঘটনাবলি সম্বন্ধে যথাসম্ভব আলোচনার আবশ্যকতা অনুভূত হয়। লোকমুখে কীর্ত্তিত হইতে হইতে যাঁহার নাম বহুদূরে প্রচারিত হইয়াছে, যিনি অধ্যাত্মসাধনা দ্বারা মানব জীবনের চরম উন্নতি লাভ করিয়াছেন; এবং যিনি উন্নততম অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জীবন যাপন করিয়া

গিয়াছেন বলিয়া অনেকে বলিতেছেন,—তাঁহার বহির্জীবনের কথা জানিবার জন্যও স্বভাবতঃই সাধারণ লোকের একটা আগ্রহ জন্মে। যিনি আদর্শ পুরুষ, তাঁহার বহির্জীবনের কার্য্যকলাপ, কথাবার্ত্তা, আচার ব্যবহার, প্রভৃতি যদি অতি অল্পও হয় এবং অল্প পরিসরের মধ্যেও হয়, তথাপি উহার মধ্য হইতেই আমাদের নিজ নিজ জীবন-গঠনের উপযোগী অনেক উপকরণ লাভ করিতে পারিব, ইহা নিঃসন্দেহ। ইহাদ্বারা তাঁহাকে তত্ত্বতঃ জানা, চেনা ও বুঝা সম্ভবপর হইবে না সত্য, তথাপি তাঁহার সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ অবগত হওয়া যাইবেই। বিশেষতঃ তাদৃশ মহাপুরুষদের জীবনের যথার্থ-ঘটনা গুলি শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে লিখিত না থাকিলে, সে গুলি প্রায়শঃই নানা আকারে আকারিত হইয়া লোকমুখে প্রচারিত হয়। এবং বিভিন্ন মতের লোক নিজ নিজ সংস্কার অনুসারে সত্যমিথ্যা মিশ্রিত করিয়া মহাপুরুষদের সম্বন্ধে এমন সব গল্প রচনা করে, যাহাতে তাঁহাদের সম্বন্ধে সত্যজিজ্ঞাসুদেরও বিবিধ প্রকার ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়া থাকে। শ্রীশ্রীবাবা গম্ভীরনাথের জীবনচরিত লিখিয়া তাঁহার জীবনের সহিত পাঠকবর্গের সম্যক্ পরিচয় করিয়া দেওয়া সম্ভবপর নহে, ইহা জানিয়াও প্রধানতঃ এসব কারণেই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

সাধারণ নিয়ম এই যে, কাহারও জীবন-চরিত আলোচনা করিতে হইলে, তাঁহার জন্মস্থান, জন্মকাল, পিতৃ-পিতামহাদির নাম-গোত্র কার্য্যকলাপ প্রভৃতির পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক, তাহা আরম্ভ করিতে হয়। কিন্তু এই যোগসিদ্ধমহাপুরুষের আদর্শ জীবন-

আলোচনায় সেই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে আমরা বাধ্য হইতেছি। সন্ন্যাসীদের সাধারণ রীতিই এই যে, তাঁহারা নিজমুখে পূর্ব্বাশ্রমের কোন পরিচয় প্রদান করেন না। সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের নূতন জন্মলাভ হইল। তখন হইতে গুরু-প্রদত্ত নামই তাঁহাদের নাম, গুরুই তাঁহাদের পিতা। তখন বংশাবলীর পরিচয় দিতে হইলে গুরুপরম্পরাক্রমে গুরু, পরমগুরু, প্রভৃতিরই নামোল্লেখ করিতে হইবে, গোত্রের পরিচয় দিতে হইলে সম্প্রদায় ও সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষদেরই কথা বলিতে হইবে, জন্মস্থানের কথা বলিতে হইলে গুরু-ধামেরই উল্লেখ করিতে হইবে। আমরাও বাবা গম্ভীরনাথের তদ্রূপ কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যেই প্রথম কয়েক অধ্যায়ের অবতারণা করিয়াছি। দৈহিক ও সাংসারিক সম্বন্ধ সকল অনিত্য ও তুচ্ছ বোধ করিয়া তাহাদের প্রতি বৈরাগ্য বশতঃই সাধকগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, এবং সেই সব সম্বন্ধকে বিস্মৃত হইতেই তাঁহারা চেষ্টা করেন। তখন হইতে ব্যাবহারিক জগতেও আধ্যাত্মিক সম্বন্ধকেই একমাত্র সম্বন্ধ বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করিয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় পূর্ব্ব-জীবনের কোন পরিচয়ের উল্লেখ করিতে কুণ্ঠিত হওয়া তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। যাঁহারা তপোলব্ধ জ্ঞানবলে পূর্ব্বজন্মের ঘটনাবলী স্মরণ করিতে সমর্থ হন, সেই সব জাতিস্মর মহাত্মারা যেমন সাধারণতঃ সেই সকল জন্মান্তরীণ ঘটনার বিশেষ বিবরণ লোক সমাজে প্রকাশ করেন না, নিষ্ঠাবান্ সন্ন্যাসিগণও সেইরূপ পরিত্যক্ত পূর্ব্বাশ্রমের কোন কথা লোক সমাজে বর্ণন করিতে

ইচ্ছা করেন না। তবে, তাঁহাদের পূর্ব্বাশ্রমের পরিচিত অন্যান্য লোক দ্বারা তাঁহাদের সেই পরিত্যক্ত পূর্ব্ব জীবনের পরিচয় লোক সমাজে প্রকাশ হইতে পারে। কিন্তু যে-সব মহাপুরুষ অখ্যাত ও অজ্ঞাত অবস্থায় সংগোপনে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক বিজন বনে বা পর্ব্বতগুহায় একান্ত সাধনে নিমজ্জিত হন, এবং বহুদিন পরে জন্মভূমি হইতে বহুদূরে নূতন নামে ও নূতন ভাবে পরিচিত হইয়া লোকসমাজে আত্ম-প্রকাশ করেন, পূর্ব্বপরিচিত লোকের অভাবে তাঁহাদের পূর্ব্বজীবন প্রায়শঃ অপ্রকাশিতই থাকিয়া যায়।

শ্রীশ্রীবাবা গম্ভীরনাথের জীবনেও তাহাই হইয়াছে। তিনি যখন লোক সমাজে পরিচিত হইয়াছেন, লোকের দৃষ্টি যে সময়ে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, সেই সময়ে তিনি একজন সিদ্ধমহাপুরুষ। তিনি নিজে যে কেবলমাত্র সন্ন্যাসের আদর্শ রক্ষা করা ও শিক্ষা প্রদান করার জন্যই পূর্ব্ব জীবনের কোন কথা বলিতেন না, তাহা নয়, নিজের সম্বন্ধে কোনও কথা প্রকাশ করাই তাঁহার স্বভাবের বিপরীত ছিল। তাঁহার জীবনের শেষভাগে অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালী যখন তাঁহার কৃপায় তাঁহার শিষ্যত্ব-লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বভাবতঃই তাঁহার মুখে তাঁহার জীবনের কিছু কিছু কাহিনী শ্রবণ করিবার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কেহই সে সম্বন্ধে কোন কথা তাঁহার মুখ হইতে বাহির করিতে পারেন নাই। তিনি শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতেন,—'মৈঁ

নহি রাখ্‌না'—'আমি (অভিমান) রাখিবে না' ; তাঁহার নিজের আচরণের মধ্যে সেই উপদেশ এমন জীবন্তমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল যে, সাধারণ ব্যাবহারিক বাক্যালাপের মধ্যেও তাঁহার মুখে 'আমি' 'আমার' প্রভৃতি অভিমানব্যঞ্জক শব্দ উচ্চারিত হইতে শুনা যাইত না। তিনি স্বভাবতঃই গম্ভীর প্রকৃতি ছিলেন, তাহাতে আবার সর্ব্বদাই অন্তর্মুখ থাকিতেন, কথাবার্ত্তাত প্রায় বলিতেনই না, সুতরাং প্রয়োজন ভিন্ন কেবলমাত্র কৌতূহল বশতঃ কোন কথা তাঁহার নিকট উত্থাপন করিতে সকলেই একটা স্বাভাবিক সঙ্কোচ অনুভব করিতেন। এই হেতু তাঁহার সহিত তাঁহার পূর্ব্বজীবন সম্বন্ধে কোন আলোচনা আরম্ভ করিবার সুবিধা তাঁহার শিষ্যগণ পাইতেন না। তত্রাপি এ বিষয়ে যে তাঁহাকে কোন প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, এমন নহে ; কারণ কেহ কেহ এ সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞানলাভ করা প্রয়োজনীয়ই বোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়াও এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাঁহার স্বাভাবিক মৃদু মধুর স্বরে, অথচ দৃঢ়তার সহিত, উত্তর করিতেন— "প্রপঞ্চসে ক্যা হোগা?" অর্থাৎ এসব সাংসারিক বাজে বিষয় জানিয়া আধ্যাত্মিক জীবনে কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? যদিও এই উপদেশের নিগূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ে অবধারণ করা ও তদনুসারে জীবনকে পরিচালিত করার সৌভাগ্য ও সামর্থ্য অনেকেরই হয় নাই,—যদিও তাঁহার অনেক শিষ্যই এমন আদর্শ দেখিয়া এবং এমন উপদেশ শুনিয়াও প্রপঞ্চ নিয়াই

জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন, তথাপি এরূপ উত্তরের পরে তাঁহার নিকটে এ সম্বন্ধে আগ্রহ পূর্ব্বক আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে কাহারই সাহস হইত না। অন্য এমন কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণও পাওয়া যায় নাই, এবং পাওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে বলিয়াও মনে হয় না, যাহা হইতে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের কোন বিশেষ পরিচয় লাভ ঘটিতে পারে। সুতরাং তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বের কোন কথাই নিশ্চয় করিয়া বলিবার অধিকার আমাদের নাই।

তাঁহার এই উপদেশ আমাদের নিকট আপাততঃ এই ফল প্রসব করিয়াছে যে, আমরা প্রপঞ্চ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র উদাসীন না হইলেও, যেরূপ জীবনের প্রপঞ্চভাগও একটি নিখুঁত আধ্যাত্মিক জীবনেরই বাহ্যিক অভিব্যক্তি, সেইরূপ একটি জীবন সম্বন্ধে আমরা অন্ধকারেই রহিয়া গিয়াছি।

তিনি যখন গোরক্ষনাথ-মন্দিরের মোহান্ত বাবা গোপালনাথ-জীকে গুরুপদে বরণ করিবার জন্য গোরক্ষপুরে উপস্থিত হন, তখন যাঁহারা উক্ত মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই একজন বৃদ্ধ সাধু এখনও জীবিত আছেন। তাঁহারা বলেন যে, বাবাজী যখন মন্দিরে প্রথম আসেন, তখন তাঁহার পূর্ণ যৌবন। তাঁহার অপরূপ দেহ সৌষ্ঠব, আচার ব্যবহার, ও কথাবার্ত্তা প্রভৃতির বিশেষত্ব দর্শন করিয়া সকলেই বিমোহিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বিশেষ সম্ভ্রান্ত বংশ সমুদ্ভূত বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন,

তাঁহার দেহকান্তি উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিল। তাঁহার অবয়বসমূহ মাখনের ন্যায় কোমল বোধ হইত, অথচ তাঁহার শরীরে অসাধারণ বল ছিল। তাঁহার দৈহিক গঠনে মহাপুরুষোচিত লক্ষণ সমূহ পরিদৃশ্যমান ছিল। তাঁহার সমুন্নত সুগঠিত দেহ, আজানুলম্বিত শক্তিসমন্বিত বাহুযুগল, দিব্য জ্যোতিঃ সম্পন্ন ঈষদরুণ নেত্রদ্বয়, প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসিকা, কোকনদ সদৃশ সুকোমল ও রক্তবর্ণ করতল ও পদতল, সুগোল ও সুদীর্ঘ অঙ্গুলি সমূহ,—সকলেরই সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাঁহার এই অসাধারণ দেহসৌষ্ঠব, পূর্ণ যৌবনাবস্থায় অসাধারণ গাম্ভীর্য্য, অসাধারণ ধীশক্তি, অসাধারণ বৈরাগ্য ও অসাধারণ ভগবদ্ভক্তির জ্যোতিঃতে মণ্ডিত হইয়া তাঁহার অপূর্ব্ব-শ্রী দর্শকমাত্রেরই হৃদয়ে একটি অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিত। তখনও তিনি কথাবার্ত্তা অতি অল্পই বলিতেন। যে প্রেরণায় উন্মত্ত হইয়া, যে লক্ষ্য সাধন করিবার উদ্দেশ্যে, তিনি ভোগসম্পৎ পরিপূর্ণ গৃহ সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহির্গত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে ভিন্ন অন্য কোন দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপই যেন তিনি স্বীয় শক্তির অপব্যবহার মনে করিতেন। যতদিন আশ্রমে ছিলেন, ততদিন তিনি অনন্যচেতঃ, অনন্যকর্ম্মা ও অনন্যদৃষ্টি হইয়াই সাধনে নিমজ্জিত হইবার জন্য গুরুর উপদেশ ও আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন বলিয়া মনে হইত। সে সময়েও তিনি নিজের পূর্ব্বজীবনের কোন কথা কাহাকেও বলিতেন না। সুতরাং সেই বৃদ্ধ সাধুগণ হইতে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রম সম্বন্ধে কোন বিশেষ সংবাদ পাওয়া যায় না।

জনশ্রুতি এই যে, তিনি কাশ্মীরের অন্তর্গত জম্মু প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনারম্ভে সেখানে নাথযোগি-সম্প্রদায়ের একজন অওঘর মহাপুরুষের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় জন্মে। সেই মহাপুরুষ জম্মুর নিকটে এক শ্মশানে বাস করিতেন। স্বীয় গৃহকর্ম্মান্তে অবসর সময়ে প্রায়ই তিনি সেই যোগিপুরুষের নিকটে যাতায়াত ও তাঁহার সহিত অনন্যচিত্তে ধর্ম্মালোচনা করিতেন। ফলে, সংসারের অনিত্যতা বোধ ও তৎপ্রতি তাঁহার বৈরাগ্য সুদৃঢ় হইল। তখন তিনি সেই মহাপুরুষের নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করেন। মহাপুরুষ তাঁহাকে গোরক্ষপুরের তৎকালীন মোহান্ত বাবা গোপালনাথজিউর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিতে পরামর্শ দেন। সম্ভবতঃ তিনিও বাবা গোপালনাথজিউর শিষ্য ছিলেন। তদনুসারে এক রাত্রে কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি সংসার ত্যাগ করেন। বলা বাহুল্য যে, এই বিবরণও কোন সন্তোষ জনক প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।

গোরক্ষনাথ মন্দিরের বৃদ্ধ যোগিগণ বলেন যে, তিনি যখন প্রথম গোরক্ষপুরে আসিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার বেশভূষা বেশ বাবুর মতই ছিল; পরিধানে রেশমী বস্ত্র ছিল, তিনি রীতিমত শ্মশ্রু-উন্মোচন ও গুম্ফ রক্ষা করিতেন। তাঁহার হাতেও যথেষ্ট টাকা ছিল। সেই টাকা তিনি দানে ও গুরু সেবায় ব্যয় করিতেন। দান করা যেন তাঁহার একটা নেশার মধ্যেই ছিল; কিছু দান করিতে পারিলেই তিনি আনন্দ অনুভব করিতেন। ভবিষ্যৎ-কালেও খুব 'দানশীল' বলিয়া তাঁহার একটা খ্যাতি হইয়াছিল।

ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, গৃহত্যাগের পূর্ব্ব হইতেই দান করা তাঁহার একটা বিশেষ অভ্যাসের মধ্যে ছিল। অর্থহীন-ব্যক্তি সাধারণতঃ এরূপ দানে অভ্যস্ত হইতে পারে না। তাঁহার বেশভূষা, দানশীলতা, হাবভাব প্রভৃতি দেখিয়া তাৎকালিক সাধুগণ তাঁহাকে 'বড়ঘর' হইতে সমাগত বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার লৌকিক ভোগের উপকরণের যে কোন অভাব ছিল, অথবা তাঁহার সংসারে যে কোনরূপ অশান্তির কারণ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা কেহই অনুমান করিতে পারেন নাই। তাঁহার নিকট রাজসিক বা তামসিক ত্যাগের কোন কারণ উপস্থিত হইয়াছিল এরূপ ধারণা কাহারও হয় নাই। লোকে সাধারণতঃ যে সব ভোগ্য বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, তন্মধ্যে অনেক জিনিষই তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে বিদ্যমান ছিল বলিয়া সকলের ধারণা। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টিই ছিল পৃথক্ রকমের। 'প্রপঞ্চসে ক্যা হোগা'—ইহা প্রথম জীবন হইতেই তাঁহার জীবনকে চালিত করিয়াছিল। বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রেয়ী এই কথাই দেব-ভাষায় বলিয়াছিলেন,—'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্।' অর্থাৎ যাহা দ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব না, সেই সব বিত্তসম্পদ ভোগরাগাদি দ্বারা আমি কি করিব? বাল্যকাল হইতেই তাঁহার প্রাণে এমন একটা অভাব জাগিয়াছিল, এমন একটা হাহাকার তাঁহার পাঁজর ভাঙ্গিয়া উত্থিত হইয়াছিল, যাহা জগতে খুব অল্পসংখ্যক ভাগ্যবানেরই হইয়া থাকে। সেই অভাবের প্রকৃতিই এরূপ যে, পৃথিবীর ও স্বর্গের যাবতীয় ভোগ-

সুখে তাহা পূর্ণ করিতে পারে না ; সেই নিদারুণ হাহাকার যাঁহার প্রাণকে মথিত করিয়া একবার উত্থিত হয়, সংসারের সকল প্রকার সুখসম্পৎ তাঁহার নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়, সে সকল তুচ্ছ সুখসম্পদ তাঁহার প্রাণকে আর কোনরূপে আকর্ষণ করিতে পারে না। কঠোপনিষদুক্ত নচিকেতার প্রাণে এই অভাব জাগিয়াছিল বলিয়া ধর্ম্মরাজ যমপ্রদত্ত অপরিমিত ভোগ্যসামগ্রী তাঁহার নিকট তুচ্ছ বোধ হইয়াছিল ; তিনি সে সকল প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছিলেন যে—'এ সব ভোগ্য সম্ভার তোমারই থাকুক, আমাকে আত্মজ্ঞান প্রদান কর।' রাজপুত্র শাক্যসিংহের প্রাণে এই হাহাকার উত্থিত হইয়াছিল বলিয়াই পূর্ণযৌবনে পিতৃসাম্রাজ্য ও সর্ব্ববিধ ভোগবিলাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি বনবাসী হইয়াছিলেন। যাহাদের মন ক্ষুদ্র, তাহাদের নিকটই সংসার একটা বৃহৎ পদার্থ, তাহারাই সাংসারিক ভোগবিলাসের মধ্যে সুখ অন্বেষণ করিতে করিতে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার জ্বালায় জর্জ্জরিত হইতে থাকে। যাঁহাদের মন বড়, যাঁহারা মনুষ্যজীবনের অত্যুচ্চ-অধিকার সম্বন্ধে সজাগ হইয়াছেন, সংসার তাহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য লইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেও তাঁহাদের নিকট অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাঁহারা উপলব্ধি করেন যে, 'যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ। একস্যাপি ন পর্য্যাপ্তং তস্মাৎ তৃষ্ণাং পরিত্যজেৎ ॥'—মানুষ এত বড় যে, পৃথিবীতে যত ব্রীহি, যব, সুবর্ণ, পশু, স্ত্রী প্রভৃতি ভোগ্য বস্তু আছে, তাহা একজন মানুষের সমস্ত তৃষ্ণা নিবারণের পক্ষেও পর্য্যাপ্ত নহে,

সুতরাং সাংসারিক ভোগ তৃষ্ণা পরিত্যাগ করাই উচিত। ভূমাকে না পাওয়া পর্য্যন্ত মানুষের সম্পূর্ণ অভাব আর কিছুতেই পূর্ণ হইতে পারে না, তাহার প্রাণের ভিতরের—অন্তরাত্মার—হাহাকার আর কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না,—'যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি,' অতএব 'ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ'—ভূমাকেই বিশেষ ভাবে জানিতে সমস্ত চেষ্টা নিয়োজিত করা মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। মানুষ সেই ভূমাকে,—যিনি সমগ্রবিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে একাংশ দ্বারা পরিব্যাপ্ত করিয়া বিরাজ করিতেছেন, সেই দেশকালাদির অতীত নিত্যসত্য পরমানন্দময় পরমেশ্বরকে—লাভ করিবার অধিকার লইয়া জন্মপরিগ্রহ করিলেও, বিশুদ্ধচিত্ত সুকৃতিসম্পন্ন মহা-ভাগ্যবান্ অত্যল্প সংখ্যক ব্যক্তি ব্যতীত কেহই এই উচ্চাধিকার সম্বন্ধে সজাগ হয় না এবং স্বীয় জীবনকে তদনুরূপ ভাবে পরিচালিত করিতে প্রয়াস করে না। স্বাধিকার সম্বন্ধে এই অজ্ঞতার দরুণ অধিকাংশ লোকই তুচ্ছ বিষয়-সুখকে সুখ বলিয়া গণ্য করে। কিন্তু ঐ অল্পসংখ্যক মহাত্মগণ স্বকীয় অধিকার চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে আপাতভোগসম্পৎ পরিপূর্ণ সংসারকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বোধে অতিক্রম করিয়া তীব্রসংবেগে ভূমার দিকে ধাবিত হন। বাবা গম্ভীরনাথ মানবাত্মার সেই নিগূঢ় অভাবের তাড়নায়, সেই স্বাধিকার লিপ্সার প্রেরণায়, সেই ভূমার তীব্র আকর্ষণে ভোগসুখময় সংসারকে তুচ্ছবোধে পশ্চাতে ফেলিয়া ভরা যৌবনে সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্ব্বক সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হইলেন।

সেই সময়ে নাথ যোগি সম্প্রদায়ের ধর্ম্মনাথপন্থভুক্ত প্রভাব-

সম্পন্ন মহাত্মা বাবা গোপালনাথজী গোরক্ষপুরে গোরক্ষনাথ-মন্দিরের মোহান্তপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই মন্দিরই নাথ-যোগি সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র। সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক যোগিগুরু গোরক্ষনাথ এখানে তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার যোগাসনের উপরই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া নাথযোগিগণের বিশ্বাস। মন্দির অনেকবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। মুসলমানরাজত্ব কালে একবার সম্রাট্ আলাউদ্দিন এবং আর একবার সম্রাট্ আওরঙ্গজেব এই মন্দির ধ্বংস করেন। পরে 'বুদ্ধনাথ' নামে এক যোগী বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করেন বলিয়া শুনা যায়। তাহার পরে মন্দিরের আরও অনেক প্রকার সংস্কার হইয়াছে, নানা কারুকার্য্যখচিত অট্টালিকাশ্রেণী নির্ম্মিত হইয়াছে, মোহান্ত ও সিদ্ধ মহাত্মাদের সমাধির উপরে মঠ প্রস্তুত হইয়াছে, সাধুসন্ন্যাসীদের সেবার নানাপ্রকার বিধিব্যবস্থা হইয়াছে। সকল প্রকার পরিবর্ত্তনের মধ্যেও যোগিগুরু গোরক্ষনাথের আসন তাঁহার যোগসাধনার সময় হইতেই একই স্থানে একই ভাবে রক্ষিত হইয়াছে। বাবা গম্ভীরনাথের নিজমুখেও এইরূপ শোনা গিয়াছে। গোরক্ষনাথ-মন্দিরের ভূসম্পত্তি যথেষ্ট আছে। নাথজীর প্রণামী হইতেও যথেষ্ট আয় হয়। নাথজীর দৈনন্দিন সেবাপূজায়, সাধুসন্ন্যাসীর পরিচর্য্যায়, আতিথ্যে এবং সাম্প্রদায়িক উৎসবাদিতে এই সব অর্থ ব্যয়িত হয়। মন্দিরের মোহান্ত গোরক্ষনাথের প্রধান-সেবক। সাধারণ গৃহী ও সাধুগণ তাঁহাকে গোরক্ষনাথের পদেই অধিষ্ঠিত বলিয়া মনে করেন, এবং তদনুরূপ পূজা ও সম্মান প্রদান

করিয়া থাকেন। কোন কোন মোহান্ত সিদ্ধপুরুষ বলিয়াও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। নাথজীর পূজা ও আরতির পরে, মোহান্তেরও পূজা এবং আরতি হইয়া থাকে। অসাধারণ সুকৃতিসম্পন্ন পুরুষগণই এই মোহান্তের পদ লাভ করিয়া থাকেন। তবে, ভারতের দুর্ভাগ্যক্রমে অন্যান্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান তীর্থস্থানের অনেক মোহান্তের মত এ মন্দিরেও কোন কোন মোহান্ত বিলাসব্যসনে এই পবিত্র পদকে যে কলঙ্কিত করেন নাই, ইহা বলা চলে না।

বাবা গম্ভীরনাথ, প্রাণে তীব্র বৈরাগ্য ও তত্ত্বজ্ঞানপিপাসা লইয়া, বাবা গোপালনাথজীর শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিলেন। এরূপ মহাপুরুষ-লক্ষণান্বিত উচ্চাধিকারী একনিষ্ঠ সাধককে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া গুরুও অবশ্য নিজকে ধন্য মনে করিলেন। তিনি গুরুর উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক অল্প কিছু-দিন ব্রহ্মচারী ভাবে মন্দিরে অবস্থান করিয়াছিলেন। তখনও অন্যান্য বহির্মুখ সাধুদের সহিত বাক্যালাপে কালক্ষেপ না করিয়া অধিকাংশ সময় আপনার লক্ষ্যবিষয়ের চিন্তা করিতেন, এবং বাকী সময় কায়মনে গুরুর সেবা করিতেন। কয়েক মাস পরে গুরু গোপালনাথজী সাম্প্রদায়িক রীতি অনুসারে তাঁহাকে সন্ন্যাসমার্গে দীক্ষিত করিয়া তাঁহার গলদেশে 'নাদ' ও 'সেলি' পরাইয়া দিলেন, এবং তাঁহাকে 'অওঘর' শ্রেণীভুক্ত করিলেন। তাহার কিছুকাল পরে দেবীপাটনে তিনি বাবা শিবনাথজীর নিকট 'কর্ণফট্' দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া কর্ণে কুণ্ডল ধারণ করিলেন। তিনি

গুরু ও সম্প্রদায়ের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন রূপে এই সব সাম্প্রদায়িক চিহ্ন জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার স্বাভাবিক নিস্তরঙ্গ গাম্ভীর্য্য দর্শন করিয়াই গুরু তাঁহাকে 'গম্ভীরনাথ' নাম প্রদান করিয়াছিলেন। গুরু যে ভাবেই ঐ নাম দিয়া থাকুন না কেন, এই নাম যে তাঁহার জীবনে কতখানি সার্থক ছিল, তাহা তাঁহাকে যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই উপলব্ধি করিয়াছেন। এই প্রকার—ভাবে গম্ভীর, জ্ঞানে গম্ভীর বাক্যে গম্ভীর, কার্য্যে গম্ভীর, প্রতি পদবিক্ষেপে গম্ভীর,—মহাপুরুষ আর দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কোন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক কিছু দূর হইতে তাঁহাকে প্রথম দর্শন করিলে, এই অদৃষ্টপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যই সর্ব্বপ্রথম তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাহাকে চমৎকৃত করিত।

যুবক গম্ভীরনাথ এইরূপে যোগিসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া স্বীয় অভিষ্টসাধনে ব্রতী হইলেন। তখন হইতে সর্ব্ব বিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়া গুরূপদিষ্ট মার্গ অনুসরণ পূর্ব্বক তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের জন্য তিনি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি নিয়োজিত করিলেন; 'প্রপঞ্চসে ক্যা হোগা,' 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্', 'বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব' ইত্যাদি মন্ত্রের তাৎপর্য্য সম্পূর্ণরূপে তাঁহার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিল।

গোরক্ষপুর ত্যাগ
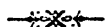
শ্রীশ্রীবাবা গম্ভীরনাথ দীক্ষা গ্রহণের পর কিছুদিন গুরু-সন্নিধানে অবস্থান করিয়া গুরূপদেশানুযায়ী সাধন ভজন করিতে লাগিলেন। গুরুসেবা সাধনের একটি বিশেষ অঙ্গ। শ্রীভগবান্ গীতায় জ্ঞান সাধনের লক্ষণ বর্ণনা করিবার সময় আচার্য্যোপাসনার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন, এবং প্রণিপাত ও সেবা শুশ্রূষার দ্বারা গুরুর প্রসন্নতা উৎপাদন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট তত্ত্বোপদেশ গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ ভাগবতে ভগবান্ বলিতেছেন 'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ'—আচার্য্যকে ভগবান্ বলিয়াই জানিবে। বেদান্তাচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে বেদান্তমতে জ্ঞানসাধনার দুইটি প্রধান অঙ্গ—তত্ত্ব বিচার ও গুরুসেবা। গুরুসেবা ব্যতীত অন্তঃকরণ তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের যোগ্যতা লাভ করে না। যোগিগুরু গোরক্ষনাথ স্বয়ং গুরুসেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। যুবক সাধক গম্ভীরনাথও সকল প্রকার সাংসারিক সম্বন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া গুরুর চরণে দেহমন সমর্পণ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার দুইটিমাত্র কার্য্য রহিল—গুরুসেবা ও ভজন। তিনি ঐকান্তিকতার সহিত এই দ্বিবিধ সাধনে আত্মনিয়োগ করিলেন।

সাধনমার্গে যেসব স্তর অতিক্রম করিতে সাধারণ সাধকের বহুদিন কাটিয়া যায়, যে সব স্তরের সাধনা বহুদিন অভ্যাস করা

তাহাদের পক্ষে আবশ্যক হইয়া থাকে, লোকোত্তর মহাপুরুষগণ অতি অল্প সময়েই সেই সব স্তর অতিক্রম করিয়া গিয়া থাকেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে সাধক যে সব স্তর অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, বর্ত্তমান জন্মে সেই সকল স্তর অতিক্রম করিতে তাঁহার কোনও আয়াসই পাইতে হয় না। অতি সহজে সেই সব স্তরের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি উন্নততর স্তর সমূহে অধিরোহণ করেন। শ্রীভগবান্ গীতায় যোগভ্রষ্টের গতি সম্বন্ধে অর্জ্জুনকে আশ্বাস দিবার সময় বলিয়াছেন,—

'তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥
পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।'

যে সাধক ঐকান্তিকতার সহিত সাধনাভ্যাস করিতে করিতে পরমায়ুর অল্পতা বশতঃ সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করেন, অথবা আকস্মিক কোন প্রলোভন বা প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া যোগমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাঁহার পূর্ব্ব-সাধনা ব্যর্থ হয় না, সেই সাধনার সংস্কার তাঁহার অন্তঃকরণে থাকিয়া যায় এবং তিনি পরজন্মে অনুকূল অবস্থার মধ্যে অনুকূল দেহমন লইয়া জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্বদেহের সংস্কারানুরূপ বুদ্ধিযোগ লাভ করেন ও সম্যক সিদ্ধির জন্য স্বভাবতঃই যথাবিহিত প্রযত্ন করিতে থাকেন। পূর্ব্বজন্মের অভ্যাসজনিত সংস্কারই তাঁহাকে জোর পূর্ব্বক চালিত করিয়া থাকে। সেই সংস্কারের প্রভাবে তিনি জন্মান্তরাভ্যস্ত সাধনস্তর গুলি বিনা আয়াসে

অতিক্রম করিয়া যান এবং তাহার পর হইতে তাঁহার বর্তমান জীবনের সাধনা যথার্থরূপে আরম্ভ হয়।

ঐকান্তিক মুমুক্ষু সাধক গম্ভীরনাথও অল্প দিনই গুরুর দৈহিক সেবায় নিয়োজিত থাকিলেন। গুরুর দৈহিক সেবার অনুরোধে যে অবস্থাপুঞ্জের মধ্যে বাস করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তাহা যখন সাধক গুরূপদিষ্ট যোগসেবার অন্তরায় বলিয়া অনুভব করেন, তখন ঐকান্তিক সাধনাভ্যাসরূপ গুরুর আধ্যাত্মিক সেবাকেই যথার্থ শিষ্য গুরুর দৈহিক সেবা অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয় ও কল্যাণপ্রদ জানিয়া সেই সুবিধারই অন্বেষণ করেন। বাবা গম্ভীরনাথ গুরুর দৈহিক সেবা, দৈহিক সংসর্গ, মৌখিক উপদেশ গ্রহণ, আশ্রমে বাস প্রভৃতি যতদিন প্রয়োজনীয় বোধ করিলেন, ততদিন অন্যান্য সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া স্বকীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত গোরক্ষপুর মঠে অবস্থান করিলেন। কিন্তু সাধনজীবনের এই স্তর অতি অল্প দিনেই তিনি অতিক্রম করিলেন। পূর্ব্বাভ্যাসজনিত সংস্কার তাঁহাকে ভিতর হইতে তাড়না করিতে লাগিল। তিনি একান্ত-বাস ও নিষ্কিঞ্চন ভাবে অবস্থানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে লাগিলেন। ধনভাণ্ডার ও ভোগ্যসম্ভার পরিপূর্ণ নাথজীর আশ্রম, গুরুর বাৎসল্য, বহু সাধুর একত্র অবস্থান, বহু লোক-জনের সমাগম ও সম্মান প্রদর্শন,—এ সকলই তিনি বৈরাগ্য-সাধনের ও একনিষ্ঠ তত্ত্বানুসন্ধানের অন্তরায় বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি আশ্রম ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন

অনেক সাধুর আচার ব্যবহার ও জীবনযাত্রাপ্রণালী এই সংকল্পে ইন্ধন যোগাইতে লাগিল। প্রাচীন কাল হইতে একটি শাস্ত্রীয় উক্তি সাধুসমাজে প্রচলিত আছে,—

'প্রমাদিনো বহিশ্চিন্তাঃ পিশুনাঃ কলহপ্রিয়াঃ।
সন্ন্যাসিনোঽপি দৃশ্যন্তে কলিসংদূষিতাশয়াঃ॥'

—'সন্ন্যাসীদের মধ্যেও প্রমাদযুক্ত, বাহ্য বিষয় চিন্তাপরায়ণ, ক্রূরপ্রকৃতি ও কলহপ্রিয়, অনেক লোক দৃষ্ট হয়; কলিদ্বারা—অধর্ম্মদ্বারা—তাহাদের অন্তঃকরণ দূষিত।' মোহবশতঃ বা কায়ক্লেশভয়ে অথবা অলস ভাবে দায়িত্ববিহীন জীবনযাপন পূর্ব্বক উদরপূরণের উদ্দেশ্যে কিংবা কপটবেশের সাহায্যে ভোগবিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিবার মানসে, অনেক লোক সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। এই দুর্নীতি প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ইহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া যোগিগুরু দত্তাত্রেয় বলিয়াছেন,—

'মুণ্ডী চ দণ্ডধারী বা কাষায় বসনোঽপি বা।
নারায়ণ বদো বাপি জটিলো ভস্মলেপনঃ॥
নমঃ শিবায় বাচ্যো বা বহ্বর্চ্চাপূজকোঽপি বা।
ক্রিয়াহীনোঽথবা ক্রূরঃ কথং সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥
ক্রিয়ৈব কারণং সিদ্ধেঃ সত্যমেতৎ তু সাংকৃতে।
শিশ্নোদরার্থং যোগস্য কথং বা বেশধারিণঃ॥
অনুষ্ঠান বিহীনাস্তু বঞ্চয়ন্তি জনান্ কিল।
[illegible]বষ্টে বিপ্রলাভৈ র্যতন্তে অধমাধমাঃ॥'

মুণ্ডিত মস্তক, দণ্ডধারী, কাষায়বস্ত্র-পরিহিত, নারায়ণ-শব্দ-উচ্চারণকারী, জটাজুটধারী, ভস্মলিপ্ত, 'নমঃশিবায়'-বদনশীল, বহু-দেবমূর্ত্তি-পূজক—এই সকল লক্ষণযুক্ত হইয়াও যদি কেহ অনুষ্ঠান বিহীন অথবা ক্রূর প্রকৃতি বিশিষ্ট হয়, তবে কিরূপে সিদ্ধিলাভ হইবে? হে সাঙ্কৃতে! ক্রিয়াই সিদ্ধির কারণ, ইহা সত্য জানিবে। শিশ্নোদর তৃপ্তির মানসে যাহারা যোগীর বেশ ধারণ করে, তাহাদের সিদ্ধি কিরূপে হইবে? তাহারা অন্নপানাসক্ত হইয়াও লোকের সম্মুখে পান ভোজন ত্যাগ করিয়া এবং লম্বা চওড়া কপট বাক্য উচ্চারণ করিয়া লোকসমাজকে প্রবঞ্চিত করিয়া থাকে। নারদ পরিব্রাজকোপনিষদে পিতামহ ব্রহ্মা বলিতেছেন,—

'তিতিক্ষা-জ্ঞান-বৈরাগ্য-শমাদিগুণ বর্জ্জিতঃ।
ভিক্ষামাত্রেণ জীবী স্যাৎ স যতি র্যতিবৃত্তিহা॥
ন দণ্ডধারণেন ন মুণ্ডনেন ন বেশেণ ন দম্ভাচারেণ মুক্তিঃ।
জ্ঞানদণ্ডো ধৃতো যেন একদণ্ডী স উচ্যতে॥
বাগ্‌দণ্ডঃ কর্ম্মদণ্ডশ্চ মনোদণ্ডশ্চ তে ত্রয়ঃ।
যস্যৈতে নিয়তাঃ দণ্ডাঃ স ত্রিদণ্ডী মহাযতিঃ॥
কাষ্ঠদণ্ডো ধৃতো যেন সর্ব্বাশী জ্ঞানবর্জ্জিতঃ।
স যাতি নরকান্ ঘোরান্ মহারৌরব সংজ্ঞিতান্॥'

তিতিক্ষা (শীত, রৌদ্র, বর্ষা প্রভৃতি এবং নিন্দা, তিরস্কার, অবমাননা প্রভৃতি সহ্য করিবার শক্তি), জ্ঞান (সদসদ্ বিচার), বৈরাগ্য (ঐহিক ও পারত্রিক ভোগ্য বিষয় মাত্রেরই অনিত্যত্ব ও

অশান্তিপ্রদত্ব বিচার পূর্ব্বক তাহাতে বিতৃষ্ণা; ভোগ্যবস্তুর অভাবপ্রযুক্ত বা ভোগ করিবার শক্তির অভাব বশতঃ সংসারে বিরক্তি নয়), এবং শমদমাদি গুণ না থাকিলে, যে ব্যক্তি কেবল যতিবেশে ভিক্ষা দ্বারা জীবন ধারণ করে, সে যতিবৃত্তির বিনাশকারী পাষণ্ড। দণ্ডধারণ, মুণ্ডন, বেশ, বা দম্ভপূর্ব্বক বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের দ্বারা মুক্তি হয় না। যিনি জ্ঞানদণ্ড ধারণ করেন, তিনিই একদণ্ডী বলিয়া অভিহিত হন। বাক্য, কর্ম্ম ও মন যিনি সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়াছেন, সেই মহাযতিই ত্রিদণ্ডী। যে ব্যক্তি জ্ঞানবর্জ্জিত ও ভোগাকাঙ্ক্ষাযুক্ত হইয়া কাষ্ঠদণ্ড ধারণ করে, সে মহারৌরব নামক ভীষণ নরকে পতিত হয়।

এইরূপ বহুসংখ্যক বৈরাগ্যবিহীন বৈরাগী, ভোগী সন্ন্যাসী, কপট যোগী আশ্রম মঠ মন্দির আখ্ড়া প্রভৃতি পবিত্র স্থান সমূহ আশ্রয় করিয়া দেবসেবা ও সাধুসেবায় উৎসর্গীকৃত অন্ন ধ্বংস করিয়া থাকে এবং অলসভাবে বা বৃথা বাগ্বিতণ্ডায় অথবা স্ব স্ব স্বভাবানুরূপ ক্রূর কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করে। এই প্রকারের তথাকথিত সাধু গোরক্ষনাথ মন্দিরেও ছিল। তাহাদের সংসর্গে বাস করিতে তীব্র-বৈরাগ্যবান্ মুমুক্ষু সাধক গম্ভীরনাথ স্বভাবতঃই অত্যন্ত বিতৃষ্ণা বোধ করিতে লাগিলেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি শিষ্য ও ভক্তদিগকে একদিকে যেমন সাধুভক্তি ও সাধুসেবা করিতে উপদেশ দিতেন, অন্যদিকে তেম্নি অজ্ঞাত-চরিত্র সাধুদের সংসর্গ হইতে দূরে থাকিতে বলিতেন। সাধুসেবা সকল শাস্ত্রেই চিত্তশুদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। সাধুর আদর্শ

হৃদয়ে পোষণ করিয়া সাধুদের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি করা ও তাহাদের সেবা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যে সব সাধুবেশধারীর সংসর্গে সেই আদর্শ খর্ব্ব হইয়া যায়, তাহাদের সহিত মেলামেশা করিলে সাধুমাত্রের প্রতিই অশ্রদ্ধা জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে, সুতরাং সাধুভক্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে সেই সকল সাধুর সঙ্গ হইতে দূরে থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। বাবা গম্ভীরনাথের জীবনে ও উপদেশে একটি বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি কখনও কোনও মত বা কোনও সম্প্রদায় বা কোনও ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন রূপ নিন্দা-বাক্য উচ্চারণ করিতেন না, সাধারণ দৃষ্টিতে যাহা নিতান্ত নিন্দনীয়, তাহার সম্বন্ধেও তিনি কখনও নিন্দার ভাবে কথা বলিতেন না। সেই হেতু ভক্তদিগকে কপট সাধুদের অসৎপ্রভাব হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বলিতেন যে "ঐ সব সাধুর সঙ্গে ত তোমার কোনও 'লেনা দেনা' নাই, তাহাদের সহিত মেলামেশা করার প্রয়োজন কি? সাধুবেশী দেখিলে আপনার কল্যাণোদ্দেশ্যে সাধুর আদর্শ স্মরণ করিয়া তাহাদিগকে প্রণাম করা ও কিছু দান করা ভাল।"

এরূপ অবস্থায় নিবিড় সাধনে নিমজ্জিত হইবার মানসে তিনি একদিন প্রশান্ত ভাবে গুরু ও মন্দিরের নিকট প্রণতঃ হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। তিনি বাহির হইবার সময় আর একটি সংকল্প করিলেন যে কেহ অযাচিত ভাবে কোন খাদ্য দ্রব্য উপস্থিত না করিলে তিনি নিরাহারে থাকিবেন, কাহারও নিকট কিছু যাচ্ঞা করিবেন না। শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥'

—'যাহারা অন্যকামনা রহিত হইয়া অনুক্ষণ আমাকেই স্মরণ পূর্ব্বক ভজন করে, সেই একনিষ্ঠ সাধকদের যোগ ও ক্ষেম আমিই বহন করিয়া থাকি—(প্রয়োজনীয় অলব্ধ বস্তু লাভ করার নাম যোগ, ও লব্ধ বস্তু রক্ষা করার নাম ক্ষেম।) একান্ত ভক্তের প্রতি ভগবানের এই আশ্বাসবাণীর সত্যতা তিনি যেন স্বীয় সাধন-জীবনের প্রারম্ভেই পরীক্ষা করিয়া লইতে প্রস্তুত হইলেন। হৃদয়ে এই সংকল্প পোষণ করিয়া তিনি মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া পদব্রজে কাশীধাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দুই দিন অতিবাহিত হইল, কেহ আহার উপস্থিত করিল না, তিনি উপবাসী থাকিয়া ক্লিষ্ট শরীরে কিন্তু স্বচ্ছন্দচিত্তে চলিতে লাগিলেন। নিজে কঠোর পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ না হইলে ভগবান্‌কে ও ভগবদ্-বিধানকে পরীক্ষা করিয়া লওয়া যায় না। তৃতীয় দিবসে এক ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ব্রাহ্মণ গোরক্ষনাথ মন্দিরের সহিত সংশ্লিষ্ট। উভয়ে উভয়কে চিনিতেন। গম্ভীরনাথজী নিরাবিল অবস্থায় সাধন ভজনের উদ্দেশ্যে কাশী চলিয়াছেন, একথা তাঁহাকে জানাইলেন, কিন্তু উপবাসের কথা কিছু জানাইলেন না। যিনি উপবাসে অনভ্যস্ত, তিন দিন উপবাসের পর তাঁহার অনাহারের কথা বাক্যে প্রকাশ করিয়া বলার কোন প্রয়োজন হয় না। ব্রাহ্মণটি তাঁহার প্রকৃতিও অবগত ছিলেন। তিনি বলিলেন যে তাঁহাকে ভোজন করাইবার

জন্য ভগবান্ গোরক্ষনাথই তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন, অতএব কিছু না খাইয়া তিনি যাইতে পারিবেন না। বাবা গম্ভীরনাথ ভোজনে স্বীকৃত হইলেন। ব্রাহ্মণ পথিমধ্যে অন্য খাদ্য অবশ্য যোগাড় করিতে পারিলেন না, প্রচুর পরিমাণে দুধ ও চিড়া ভোজন করাইলেন। ভোজনান্তে বিশ্রম্ভালাপের পর গম্ভীরনাথজী কাশীধাম অভিমুখে চলিলেন, ব্রাহ্মণটি গোরক্ষনাথ মন্দিরে গমন করিলেন। * এইরূপে তিনি প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হৃদয়ে শ্রীশ্রীভগবদ্-বাণীর যাথার্থ্য অনুভব করিলেন।

---

* ঘটনাটি উক্ত ব্রাহ্মণের নিকট জানা গিয়াছে।

কাশী ও ঝুঁসিতে নির্জ্জন সাধন

একতত্ত্বাভ্যাসী সাধক বাবা গম্ভীরনাথ কাশীধামে গমন করিয়া গঙ্গার তীরে একটি ক্ষুদ্র কুটীরে আসন গ্রহণ করিলেন। ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্রভূমি বারাণসী ক্ষেত্রের উপর চিরদিনই তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। এই তীর্থকে অনেক সময় তিনি তীর্থের রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শেষ জীবনে তিনি যখন বহু বাঙ্গালীকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করেন, তখন তাহাদের মধ্যে অনেককে তিনি দীক্ষান্তে কাশীধামে প্রেরণ করিতেন এবং গঙ্গাস্নান ও শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়া গৃহে যাইতে উপদেশ দিতেন। এই মহাতীর্থকেই তিনি সর্ব্বপ্রথম নির্জ্জন-সাধনের জন্য মনোনীত করিলেন। যদিও যে স্থানে তিনি আসন স্থাপন করিয়াছিলেন, সে স্থানকে বাহ্যদৃষ্টিতে নির্জ্জন বলিবার কোন কারণ দেখা যায় না, তথাপি তাঁহার পক্ষে সে স্থান নির্জ্জন ছিল। তিনি সেখানে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। কেহ তাঁহার কুটীরে যাতায়াত করিয়া কোনরূপ বিরক্তি উৎপাদন করিবে, এরূপ কোন কারণ বিদ্যমান ছিল না। নিকটবর্ত্তী লোকের সহিতও তিনি নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত কথাবার্ত্তা বলিতেন না। তাঁহার নিজের প্রয়োজনও অতি অল্পই ছিল। সাধুবেশীদের এই নিষ্কিঞ্চন সাধকের নিকট গমনাগমন করিবার কোন

প্রলোভন ছিল না। অন্য লোকের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার অবসরও সেই অনন্যচিত্ত যোগীর ছিল না। এই অজ্ঞাত অখ্যাত আড়ম্বর বিহীন সাধুর ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে দৃষ্টি প্রদান করা বা সমালোচনা করার প্রয়োজনও কোন গৃহী বা সন্ন্যাসীর ছিল না। সুতরাং এই সজন স্থানও তাঁহার পক্ষে নির্জ্জন সাধনোপযোগী স্থানে পরিণত হইয়াছিল।

তীর্থ মাহাত্ম্যে তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল। স্মরণাতীত কাল হইতে বহু একনিষ্ঠ সাধক এই মহাতীর্থে সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন, এবং বহু মহাপুরুষ সিদ্ধিলাভান্তে জীবন্মুক্ত অবস্থায় এখানে জীবন্মুক্তির বিশেষ আনন্দর আস্বাদনে নিমগ্ন থাকিয়া অথবা 'বহু জনহিতায় বহু জনসুখায় চ' জ্ঞানধর্ম্মামৃত বিতরণ করিয়া বিরাজ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রভাব এখনও ঐকান্তিক সাধকগণ এখানে বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়া থাকেন। উপাসনার দিক্ দিয়া বাবা গম্ভীরনাথ শৈব ছিলেন, এবং কাশীধাম শৈব সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান তীর্থ,—এখানে বিশ্বনাথ স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে বিরাজমান বলিয়া শৈবমাত্রেই বিশ্বাস করিয়া থাকেন। এই মহাতীর্থে সকল সম্প্রদায়ের সকল তীর্থ একত্র বিরাজিত, ইহা হিন্দুদিগের বিশ্বাস। এই সব কারণে যুবক সাধক গম্ভীরনাথ স্বভাবতঃই বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে এখানে সাধন সুকর ও ক্ষিপ্রফলদায়ী হইবে।

কাশীধামে বাবা গম্ভীরনাথ আনুমানিক প্রায় তিন বৎসর নিরবচ্ছিন্ন নিরন্তর ঐকান্তিক সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। শোনা যায় যে,

এই তিন বৎসরের সাধনার ফলেই তিনি অধ্যাত্মরাজ্যে অতি উচ্চ-ভূমিতে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। বেদান্তোক্ত ব্রহ্মানুভূতির আভাস এই সময়েই তিনি লাভ করিয়াছিলেন। যোগৈশ্বর্য্য সম্বন্ধে তিনি উদাসীন থাকিলেও—কিছু কিছু যোগৈশ্বর্য্যও তাঁহার লাভ হইয়াছিল। সাধক স্বেচ্ছায় প্রকাশ না করিলেও শক্তি ও জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে গোপন থাকে না। লোকালয়ের সন্নিকটে এরূপ নিবিড় ভাবে কেহ সাধনে নিযুক্ত থাকিলে, তাঁহার দিকে লোকের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হয়। তৎসঙ্গে তিনি যে জ্ঞান ও শক্তি অর্জ্জন করেন, তাহার প্রভাবও অনেকে অনুভব করিয়া থাকে।

অতএব দুই তিন বৎসর সাধনার পরে তাঁহার পক্ষে কাশীধাম আর নির্জ্জন রহিল না। অথচ তখনও তিনি গভীরতর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতেছিলেন। সুতরাং তিনি কাশীধাম পরিত্যাগ করিলেন, এবং অধিকতর নির্জ্জন স্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে এলাহাবাদ গমন করিলেন। সেখানে প্রয়াগরাজের ঠিক অপর পারে, জাহ্নবীর তীরে ঝুঁসি নামক স্থানে সাধনের উপযুক্ত কয়েকটি নির্জ্জন গুফা (গুহা) তিনি প্রাপ্ত হইলেন। তন্মধ্যে যে গুফাটি গঙ্গার সহিত প্রায় সংলগ্ন, পারের উপর হইতে যাহার প্রতি লোকের দৃষ্টিই নিপতিত হয় না, অন্যান্য সাধকগণ যেরূপ গুফা সাধারণতঃ পছন্দ করেন না, সেই গুফাটি তিনি মনোনীত করিলেন। গুফাটি এখনও বর্ত্তমান আছে। এই গুফায় তিনি দুই বৎসর কি

তদপেক্ষা কিছু বেশী দিন গভীর সাধনায় নিমজ্জিত ছিলেন। মুকুটনাথ নামক জনৈক যোগী তখন তাঁহার সেবা করিতেন বলিয়া শোনা যায়। এই সাধনার পর তাঁহার সাধ্যসাধন বিষয়ে জানিবার বিশেষ কিছু অবশিষ্ট রহিল না। এই সাধনার ফলেই তিনি তত্ত্বসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ব্রহ্মবিৎ হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। এখন এই জ্ঞান স্বভাবে পরিণত করিয়া সাধনার পূর্ণতা সম্পাদন করা ও সর্ব্বতোভাবে জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া তোলাই অবশিষ্ট রহিল।

পরিব্রাজক ভাব ও নর্ম্মদা পরিক্রমণ

এই অবস্থায় তিনি পরিব্রাজক ভাব অবলম্বন করেন। পরিব্রাজক ভাব সাধকদিগের সাধনার একটি বিশেষ অঙ্গ। বাবা গম্ভীরনাথ সন্ন্যাসজীবনের পক্ষে পর্য্যটনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেন। পরবর্ত্তী কালে একবার শিবরাত্রির সময় কয়েকজন সাধু গোরক্ষপুর হইতে নেপালে পশুপতিনাথ দর্শনে যাইতেছিলেন। তিনি তাঁহার যুবক সন্ন্যাসী শিষ্য বাবা শান্তিনাথজীকে তাঁহাদের সঙ্গে পর্য্যটনে বাহির হইতে আদেশ করেন। তাঁহার অন্যতর সন্ন্যাসী শিষ্য বাবা নিবৃত্তিনাথ তখনও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। তিনিও তাঁহাদের সঙ্গী হইতে অনুমতি প্রার্থনা করিলে, বাবাজী সানন্দচিত্তে অনুমতি প্রদান করিয়া বলিলেন যে, এই বয়সেই তীর্থ ভ্রমণ করা উচিত। তাঁহারা যখন যাত্রাকালে প্রণাম করিতে গেলেন, তখন বাবাজী তাঁহাদিগকে 'মুক্তিনাথ', 'কৈলাস' ও 'মানস সরোবরে' যাইবার জন্যও আদেশ দিলেন। কয়টি রাস্তা আছে, কোন্ রাস্তায় কি সুবিধা ও কি অসুবিধা আছে, কোন্ রাস্তা কতটুকু বিপৎসঙ্কুল, কোথায় কোথায় বিশ্রাম করিতে হইবে, কোথায় কিরূপ ভিক্ষা মিলিবে, কোথায় কিনিয়া খাইতে হইবে, সঙ্গে কি লইতে হইবে, কোথায় কি ভাবে, কি ভাষায় পরিচয় প্রদান করিতে হইবে, ইত্যাদি সকল

বিষয়ে বিস্তৃত উপদেশ প্রদান করিয়া অবশেষে পর্য্যটনের উপকারিতা সম্বন্ধে তিনি বলিলেন,—“ভ্রম ছুট্ জানা চাহিয়ে।”

পর্য্যটনে অনেক প্রকার ভ্রম, সংশয় ও বিপর্য্যয় নষ্ট হয়। পর্য্যটকগণ, বিবিধ দেশের, বিবিধ সমাজের, বিবিধ জাতির, বিবিধ প্রকৃতিবিশিষ্ট লোকের সংস্পর্শে আসিতে বাধ্য হওয়ায় তাহাদের আহার বিহার আচার ব্যবহার মতামত প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা প্রকার বৈচিত্র্য দর্শন করিয়া, অনেক প্রকার সংকীর্ণতা ও ভ্রান্ত ধারণা হইতে মুক্তিলাভ করেন। বিষয়ীদিগের বিষয়মত্ততা ও তাহার পরিণাম সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতালাভ করিয়া, এবং বিষয় সংস্পর্শের বহুবিধ দোষ স্বচক্ষে দর্শন করিয়া সাধক বিষয়-ভোগে বিতৃষ্ণ ও বৈরাগ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। পর্য্যটনের সময় একদিকে যেমন অনেক প্রকার শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, অন্যদিকে তেমনি অনেক প্রলোভনও সম্মুখে উপস্থিত হইয়া থাকে। এই ক্লেশস্বীকার যত অভ্যস্ত হয় এবং প্রলোভনকে যত জয় করা যায়, চিত্ত ততই দৃঢ়রূপে লক্ষ্যে সংলগ্ন হয়, আত্ম-বিশ্বাস ততই বর্দ্ধিত হয়, ভবিষ্যতে পতনের সম্ভাবনাও ততই অল্প হয়। ভিক্ষা প্রভৃতি উপলক্ষে অনেক নীচ ব্যক্তির নিকট হইতে নানারূপ অনাদর, অপমান ও লাঞ্ছনা আসিয়া অধ্যাত্ম জীবনের প্রধান শত্রু অভিমানকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে থাকে। অনেক সময় ভীষণ বিপদ হইতে নিতান্ত অভাবনীয় উপায়ে মুক্তিলাভ করিয়া অনন্যাশ্রয় পর্য্যটক গুরু ও ভগবানের নিত্যসান্নিধ্যে ও অবিরাম-প্রবাহিনী করুণাধারায় সুদৃঢ়বিশ্বাসী হইয়া থাকেন। একাকী

নিরাশ্রয় ভাবে বিপৎসঙ্কুল পথে চলিতে চলিতে চিত্ত নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ভগবান্‌কেই দৃঢ়রূপে আঁকড়াইয়া ধরিতে অভ্যস্ত হয়। নিষ্কিঞ্চন অবস্থায় নিতান্ত অপরিচিত স্থান সমূহে ভ্রমণ করিবার সময়ও যখন দেখা যায় যে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া যাইতেছে, কখন কি ভাবে কোথা হইতে কি জুটিয়া যায়, তাহাও অনেক সময় বুঝিতে পারা যায় না,—তখন ভগবান্ যে যোগক্ষেম বহন করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে সমস্ত সংশয় বিদূরিত হয়। নানা দৃশ্য-দর্শনের পিপাসা মানুষের একটি স্বাভাবিক বৃত্তি। প্রধান প্রধান স্থান সমূহ দর্শন করিলে সেই ঔৎসুক্যও নিবারিত হইয়া যায়।

এইরূপে, পর্য্যটন দ্বারা নানা প্রকার ভ্রম বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বলিয়াই পর্য্যটন সাধনের এক অবস্থায় বিশেষ উপকারী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিশেষতঃ পর্য্যটনকালে অনেক দৃঢ়-বৈরাগ্যবান্, নিয়ত-ভজনশীল, একনিষ্ঠ, আত্মসমাহিত সাধক ও সিদ্ধ মহাপুরুষের সংসর্গ লাভ হওয়ায় মুমুক্ষুতা ও সাধনে ঐকান্তিকতা অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। 'যুবা বয়সে' পর্য্যটন শেষ করিয়া তৎপরে সমাধিযোগ অভ্যাস করিলে সাধন সুকর হয়। বাবা গম্ভীরনাথ এই হেতু স্বীয় শিষ্যগণকে তীর্থযাত্রা ও পর্য্যটনে উৎসাহিত করিতেন। তিনি নিজেও ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য সাধনজীবনে পরিব্রাজক ভাব গ্রহণ পূর্ব্বক কয়েক বৎসর তীর্থদর্শন ও দেশপর্য্যটন করিয়াছিলেন, এবং সাধুর জমায়েত সহ জীবন্মুক্ত অবস্থাতেও অনেক তীর্থে গমন করিয়াছিলেন।

তিনি ভারতবর্ষের অনেক সুপ্রসিদ্ধ তীর্থে ও তপোভূমিতে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই পদব্রজে গমন করিতেন। তবে, তিনি যে সর্ব্বদা চলিতেই থাকিতেন, তাহা নয়; সাধনার উপযোগী স্থানসমূহে কোথাও এক মাস, কোথাও দুই মাস, কোথাও চারি মাস বা ছয় মাস পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া সাধনে ডুবিয়া যাইতেন, আবার চলিতে আরম্ভ করিতেন। অবস্থিতির জন্য কোথাও সুবিধামত গুফা পাইলে, তাহার মধ্যে আসন পরিগ্রহ করিতেন, নচেৎ অধিকাংশ সময় বৃক্ষতলে বা মুক্ত-আকাশতলেই অবস্থান করিতেন। তাঁহার সম্বলের মধ্যে একখানি কম্বল, একটি "খাপ্‌রা" এবং পরিধানে একখানি কৌপীন ছিল। কেশজাল অবজ্ঞাত হইয়া প্রাকৃতিক নিয়মবশে জটার আকার ধারণ করিতেছিল। অবস্থিতিকালে বা ভ্রমণকালে কোন অবস্থাতেই তাঁহার গাম্ভীর্য্য ও অন্তর্মুখীনতার ব্যতিক্রম হইত না। তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদাই তত্ত্বে নিবদ্ধ থাকিত, বাহিরে হাত পা যেন কলে চলিত। বাহিরের যাহা কিছু যৎসামান্য কর্ম্ম কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা হইত, কিন্তু অন্তঃকরণ সতত অন্তর্য্যামীর চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকিত। কথাবার্ত্তা নিজে ত প্রায় কখনই বলিতেন না, তপস্যা ও গাম্ভীর্য্যের প্রতিমাস্বরূপ তাঁহার মূর্ত্তিখানি দেখিয়া আগন্তুকেরাও অবাক্ হইয়া দর্শনই করিত, কোন কথাবার্ত্তার অবতারণা করিতে সাহসী হইত না। কাশীতে ও ঝুঁসিতে সাধনকালে এবং এই পারিব্রাজ্যের সময় তাঁহার আহারাদি কিরূপ ছিল এবং কি ভাবে নির্ব্বাহ হইত, তাহার কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না।

প্রয়াগ রাজ হইতে তিনি নর্ম্মদার দিকে গমন করেন। নর্ম্মদা আর্য্য ঋষিগণের পবিত্রতম সপ্ত নদীর মধ্যে একটী। প্রতিদিন স্নান তর্পণ সন্ধ্যা বন্দনাদির সময় হিন্দুগণ যে সব তীর্থের আবাহন করেন, নর্ম্মদা তাহাদের অন্যতম। ইহার উভয়তীরে অগণিত তীর্থ ও সাধনক্ষেত্র বিদ্যমান আছে। আর্য্য-সভ্যতা বিস্তারের প্রথম হইতেই বহু মুনি ঋষি ইহার তীরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক বাস করিয়াছিলেন। এই নদীর উভয় তীরবর্ত্তী তপস্যার অনুকূল স্থান সমূহে অসংখ্য মহাপুরুষ সাধন-ভজনে ও সৎকর্ম্মে জীবন সার্থক করিয়া মানবত্বের চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। নর্ম্মদার উৎপত্তিস্থল হইতে সমুদ্রসঙ্গম পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান এরূপ মহিম মণ্ডিত যে, নর্ম্মদা পরিক্রমণ মোক্ষের অনু-কূল অতিশয় পবিত্রকর্ম্ম বলিয়া হিন্দু সাধকগণ বিশ্বাস করেন। মৎস্য পুরাণে নর্ম্মদা মাহাত্ম্যে এরূপ লিখিত আছে,—

পুণ্যা কনখলে গঙ্গা কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী।
গ্রামে বা যদি বারণ্যে পুণ্যা সর্ব্বত্র নর্ম্মদা॥
ত্রিভিঃ সারস্বতং তোয়ং সপ্তাহেন তু যামুনম্।
সদ্যঃ পুণাতি গাঙ্গেয়ং দর্শনাদেব নার্ম্মদম্॥
স দেবাসুর গন্ধর্ব্বা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
তপস্তপ্ত্বা মহারাজ সিদ্ধিং চ পরমাং গতাঃ॥ ইত্যাদি।

গঙ্গা কনখলে বিশেষভাবে পবিত্র। সরস্বতী কুরুক্ষেত্রে বিশেষভাবে পবিত্র। কিন্তু নর্ম্মদা গ্রামে বা অরণ্যে সর্ব্বত্রই সমানভাবে পবিত্র। সরস্বতীর জল তিন দিনে মানুষকে

পবিত্র করে, যমুনার জল সাত দিনে এবং গঙ্গাজল স্নানমাত্রে পবিত্রতা আনয়ন করে, কিন্তু দর্শনমাত্রেই নর্ম্মদা-সলিল পবিত্রতা সম্পাদন করে। দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব, ঋষি ও তপস্বিগণ নর্ম্মদাতীরে তপশ্চরণ করিয়া মুক্তিলাভ করিয়া গিয়াছেন। নর্ম্মদা পরিক্রমায় পদব্রজে ইহার একতর তীর দিয়া উৎপত্তিস্থান হইতে সমুদ্রসঙ্গম পর্য্যন্ত গমন করিতে হয় এবং অপর তীর দিয়া সমুদ্রসঙ্গম হইতে উৎপত্তিস্থান পর্য্যন্ত প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। আদর্শ-সাধক বাবা গম্ভীরনাথ নর্ম্মদা-তীরে পৌঁছিয়া যথাস্থান হইতে নর্ম্মদা পরিক্রমায় ব্রতী হইলেন। এই ব্রত সমাপন করিতে তাঁহার প্রায় চারি বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। অনবরত চলিতে থাকা তাঁহার স্বভাব ছিল না এবং সাধনের অনুকূলও ছিল না। বিশেষতঃ কেবলমাত্র পদ-ব্রজে নদীটার দুই পাড় ঘুরিয়াই কার্য্য শেষ করা পরিক্রমার উদ্দেশ্য নয়; তাহাতে তীর্থের মাহাত্ম্য সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করাও সম্ভব হয় না। যে আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবাহ বিশেষ বিশেষ স্থানে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে, বহির্ম্মুখীন চিত্তবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমূহকে সংযত করিয়া আত্মাভিমুখীন ভাবে অবস্থান করিলেই তাহা নিজের হৃদয়ে সুস্পষ্টরূপে অনুভব করা যায়। চঞ্চল চিত্তে চঞ্চল ইন্দ্রিয়গ্রাম লইয়া দৌড়াদৌড়ি করিয়া যাঁহারা তীর্থভ্রমণের কর্ত্তব্যটি 'যেন তেন প্রকারেণ' সারিয়া ফেলেন, তাঁহারা তীর্থমাহাত্ম্য কিছুই বুঝিতে পারেন না। মহাভারতে মহর্ষি পুলস্ত্য ভীষ্মদেবকে বলিতেছেন,—

"যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতম্।
বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥
প্রতিগ্রহাদপাবৃত্তঃ সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অহঙ্কার নিবৃত্তশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥
অকলঙ্কো নিরারম্ভো লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥
অক্রোধনশ্চ রাজেন্দ্র সত্যশীলো দৃঢ়ব্রতঃ।
আত্মোপমশ্চ ভূতেষু স তীর্থফল মশ্নুতে ॥

যাঁহার হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও মন সুসংযত; এবং বিদ্যা, তপশ্চর্য্যা ও কীর্ত্তি সুসংযত, (অর্থাৎ যিনি কখনও বিদ্যা ও তপঃশক্তির অপপ্রয়োগ করেন না, এবং যিনি কোনরূপ অসৎ কর্ম্ম দ্বারা কীর্ত্তি অর্জ্জন করেন না), তিনিই তীর্থফল লাভ করেন। প্রসন্নচিত্তে প্রদত্ত বা অহিংসা পূর্ব্বক উপার্জ্জিত নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অতিরিক্ত কিছু যিনি গ্রহণ করেন না, যিনি যদৃচ্ছলাভে সন্তুষ্ট ও অহঙ্কারশূন্য, যিনি শাঠ্যবিহীন, দম্ভবিহীন, জিতেন্দ্রিয়, ও পাপপ্রবৃত্তি বর্জ্জিত, যিনি ক্রোধহীন, সত্যশীল, দৃঢ়ব্রত ও সর্ব্বভূতে মৈত্রী সম্পন্ন, তিনিই তীর্থের সম্যক্ মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেন।

কি ভাবে তীর্থ ভ্রমণ করিতে হয়, কি ভাবে তীর্থভ্রমণ করিলে যথার্থ কল্যাণ লাভ হয়, তাহার আদর্শ বাবা গম্ভীরনাথ নিজে তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। যে সব মহাপুরুষ ভাবি জীবনে লোকগুরুর আসন ও "লোকসংগ্রহের"

ভার গ্রহণ করেন, তাঁহাদের জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ যে কোন কার্য্য আলোচনা করিলেই এই ধারণা জন্মে যে, প্রথম হইতেই তাঁহাদের চরিত্র যেন কোন অজ্ঞাত শক্তির প্রেরণায় জনসাধারণের আদর্শ হইয়া বিকাশ প্রাপ্ত হইতে থাকে। বাবা গম্ভীরনাথ চলিতে চলিতে যখন দেখিতেন যে, কোন স্থান পূর্ব্বগত সিদ্ধ-মহাত্মাদের তপঃপ্রভাবে বিশেষ মাহাত্ম্য-সমন্বিত এবং বর্ত্তমানেও সাধনের বিশেষ অনুকূল, তখন সেখানে সাধনে ডুবিয়া যাইতেন; অবস্থানুসারে হয়ত একমাস, দুইমাস বা ততোঽধিক কাল সেখানে ধ্যান ধারণা সমাধিতে নিবিষ্ট থাকিতেন; তারপর আবার চলিতে আরম্ভ করিতেন। তাঁহার নিবিড় সাধন ও তীর্থভ্রমণ উভয় কর্ম্মই একসঙ্গে চলিত। নর্ম্মদার উৎপত্তি স্থল শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ মহাতীর্থ অমরকণ্টকে তিনি অপেক্ষাকৃত অধিক সময় সমাধি-অভ্যাসে অতিবাহিত করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি প্রায় চারি বৎসরে নর্ম্মদা পরিক্রমা শেষ করিয়াছিলেন।

নর্ম্মদা পরিক্রমার পর তিনি আরও বহু তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। কোন্ কোন্ স্থানে গিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নহে। যে সব স্থানের কথা জানা গিয়াছে, তন্মধ্যে কোন্ কোন্ স্থানে এই পরিব্রাজক ভাবে গিয়াছিলেন এবং কোন্ কোন্ স্থানে জীবন্মুক্ত অবস্থায় গিয়াছিলেন, তাহা ঠিক্ না জানায়, এক সঙ্গেই পরে সে বিষয়ের উল্লেখ করা যাইবে। দীক্ষার পর ১২।১৩ বৎসর তাঁহার এই ভাবেই অতিবাহিত হইয়াছিল।

পর্য্যটনের সময় তিনি অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন ও অনেক 'অলৌকিক' ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সাধারণ দৃষ্টিতে যাহা অলৌকিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এরূপ অনেক ঘটনা জগতে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই ঘটিয়া থাকে। সাধারণতঃ যাহা আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয়ীভূত হয় না, অথবা আমাদের স্থূলেন্দ্রিয়লব্ধ সাধারণজ্ঞানের দ্বারা যাহার কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হই না, তাহাকেই আমরা 'অলৌকিক' আখ্যা প্রদান করিয়া থাকি। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এরূপ লৌকিক ও এরূপ অলৌকিকের মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা অঙ্কিত করা চলে না। আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি ও ইন্দ্রিয় শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনেক অলৌকিক ব্যাপার লৌকিকের অন্তর্ভুক্ত হইতে থাকে। যোগিগণ ও জ্ঞানিগণ যোগ ও জ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়াই এরূপ অনেক শক্তি ও জ্ঞান লাভ করেন, যাহা তদ্রূপ-অনুশীলন-বিহীন সাধারণ লোকে নিতান্ত অপ্রাকৃত বা অলৌকিক বোধ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ আমরা যে সব ব্যাপার ও যে সব পদার্থ দর্শন করিয়া থাকি, তৎসম্বন্ধেও যদি অধিকাংশ লোক সত্যজ্ঞানের অভাব নিবন্ধন কোন ভ্রান্ত-ধারণা পোষণ করে, তবে সেই ভ্রান্ত-ধারণাকেই অনেক সময় আমরা লৌকিক জ্ঞান বলিয়া থাকি, এবং কোন তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি তৎসম্বন্ধে সত্যজ্ঞান উপদেশ করিলে তাহা অলৌকিক জ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করি। আবার স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতা, কাম, লোভ, অহঙ্কার, মিথ্যাচার, প্রভৃতির ফলে এবং উপযুক্ত অনুশীলনের

অভাবে আমাদের ইচ্ছা শক্তি ও ইন্দ্রিয় শক্তি সাধারণতঃ নিতান্ত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল থাকে বলিয়া, এই ক্ষীণ ও দুর্ব্বল শক্তিকেই আমরা মন ও ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক শক্তি বলিয়া ভুল ধারণা করি; এবং যেরূপ শক্তির বিকাশ আমরা সাধারণ লোকের মধ্যে সচরাচর দেখিতে পাই না, তাহা কোথাও দেখিলেই অলৌকিক বা অস্বাভাবিক ভাবিয়া চমকিত হই। যাঁহারা দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের বিশুদ্ধি সম্পাদন এবং জ্ঞান ও যোগের বিশেষ অনুশীলন দ্বারা জ্ঞানশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির সমুচিত শোধন ও বিকাশ সাধন করেন, তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও কার্য্যকলাপ প্রাকৃতিক বিধানের বহির্ভূত না হইলেও সাধারণ লোকের চক্ষে তাহা অলৌকিক প্রতীয়মান হয়। সাধারণ লোকের চিত্তে এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়া তাহাদের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটাইতে পারে এবং তাহাদিগকে স্বাধিকারানুরূপ আত্মানুশীলনে উদাসীন ও অলৌকিক শক্তি লাভে প্রলুব্ধ করিতে পারে, অথবা ঐ সব শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রতি দেবতাবুদ্ধি করিয়া তাহারা আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস হারাইতে ও তাঁহাদের নিকট আত্মবিক্রয় পূর্ব্বক পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইতে পারে, এই আশঙ্কায় মহাপুরুষগণ তাঁহাদের অনুশীলনলব্ধ অসাধারণ জ্ঞান ও শক্তি উপযুক্ত শিষ্যের নিকট ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হন না। বাবা গম্ভীরনাথও, যেরূপ জ্ঞান ও শক্তি অলৌকিক বলিয়া বোধ হইতে পারে, সেরূপ কিছু কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না। সুতরাং তাঁহার অধিকাংশ অসাধারণ অভিজ্ঞতা অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে।

তাঁহার অসাধারণ ত্যাগী ও বীর্য্যবান্ শিষ্যদ্বয়,—বাবা শান্তিনাথ ও বাবা নিবৃত্তিনাথ, যে দিন কৈলাস ও মানস সরোবর পর্য্যটনান্তে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের নানারূপ অভিজ্ঞতার কথা শ্রীগুরুচরণে নিবেদন করিতেছিলেন, এবং কোন কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা দ্বারা নিজেদের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া নিতেছিলেন, সেইদিন তাঁহাদের জ্ঞান বৃদ্ধিকল্পে কথাপ্রসঙ্গে দু'একটি অলৌকিক ঘটনার বিষয় বাবাজী তাঁহাদের নিকট উল্লেখ করিয়াছিলেন। উক্ত শিষ্যদ্বয়ের নিকট শ্রুত একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে।

নর্ম্মদার তীরে হাটিতে হাটিতে একদা দৈবাৎ তিনি একটি নির্জ্জন কুটীরের সমীপবর্ত্তী হইলেন। একজন ব্রহ্মচারী ঐ কুটীরে থাকিয়া সাধন ভজন করিতেন। তিনি তখন উপস্থিত ছিলেন না। বাবা গম্ভীরনাথ কুটীরটি ও চতুষ্পার্শ্ব নির্জ্জন ও সাধনের অনুকূল দেখিয়া সেখানে আসন গ্রহণ করিলেন। তিনি তিন দিন সেখানে ছিলেন। প্রতিদিনই তিনি দেখিতেন যে, একটি প্রকাণ্ড সর্প ফণা বিস্তার করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকে, তৎপর তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া যায়। এরূপ সর্প তিনি পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই। সর্পটির অদ্ভুত আকৃতি ও বিস্ময়কর ব্যবহার দর্শন করিয়া তিনি সমাধিস্থ হইয়া যাইতেন। তৃতীয় দিবসে ব্রহ্মচারী প্রত্যাগত হইলে কথা-প্রসঙ্গে ব্রহ্মচারী বাবাজীর নিকটে বলিলেন যে সেখানে

সর্পরূপী এক মহাত্মা বাস করেন, বাবাজীও তখন ব্রহ্মচারীকে তদ্দৃষ্ট সর্পের অদ্ভুত বিবরণ জানাইলেন। ব্রহ্মচারী অবাক্ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'আমি এই সর্পটিকে দেখিবার উদ্দেশ্যেই এখানে কুটীর বাঁধিয়া ১২ বৎসর যাবৎ প্রতীক্ষা করিতেছি। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত ইহার দর্শন পাই নাই। আর আপনি আগন্তুকরূপে আসিয়া তিনদিনই এই মহাত্মার দর্শন পাইলেন। আপনি বড় ভাগ্যবান্।' এই সর্পটি কোন্ সূত্রে ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক পরিজ্ঞাত হইয়াছিল, মহাত্মা হইলে কি হেতু কি অভিপ্রায়ে বা কি উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত—তাঁহাকে সর্পরূপ গ্রহণ করিতে হইয়াছে, ব্রহ্মচারীর সঙ্গেই বা তাহার এমন কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে যে তাহার দর্শনলাভের উদ্দেশ্যে তিনি বার বৎসর তপোরত হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাঁহার দর্শন পাইলেই বা ব্রহ্মচারীর কি কৃতার্থতা লাভ হইবে, এত নিকটে থাকা সত্ত্বেও দর্শন ঘটিতেছে না কেন, বাবা গম্ভীরনাথকে প্রতিদিন দর্শন করিতে আসা ও প্রদক্ষিণ করারই বা কি কারণ থাকিতে পারে, এরূপ অনেক প্রশ্নই স্বভাবতঃ মনে উদিত হয়। বাবাজীর উক্ত শিষ্যদ্বয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া এসব প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলেও এসব বিষয়ের যথাযথ রহস্য তিনি প্রকাশ করিতেন কিনা সন্দেহ। তিনি যদি কথাপ্রসঙ্গে হঠাৎ কোন অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া ফেলিতেন, তবে তৎসম্বন্ধে অন্যান্য প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে তিনি হয় লৌকিক ভাবেই তাহার ব্যাখ্যা

দিয়া কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতেন, অথবা নীরব থাকিতেন; ইহাই তাঁহার শিক্ষার প্রণালী ছিল। ব্রহ্মচারীর সহিত বিশেষ সম্বন্ধযুক্ত কোন মহাত্মা কোন বিশেষ কারণে সর্পরূপে সেখানে অবস্থান করিতেছেন, ইহা ব্রহ্মচারী পরিজ্ঞাত ছিলেন বা বিশ্বাস করিতেন। এইসব অসাধারণ বিষয়ে ইহা অপেক্ষা নিগূঢ়তর তত্ত্ব নিগূঢ়শক্তি বাবা গম্ভীরনাথের নিকট হইতে আদায় করা কঠিন ছিল।

এই প্রকার আরও দু'একটি ঘটনা তিনি বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু এমন সময়ে, এমন উপলক্ষে এবং এমন ভাবে তিনি এ সব বিষয় বলিতেন যে, ইহাদের অলৌকিকতা প্রখ্যাপনের ভাব তাহাতে কিছুমাত্র থাকিত না। এ সব দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়া আমাদের দৃষ্টি ও ব্যবহার যাহাতে আমরা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি, আমাদের জীবন যাহাতে সত্য ও মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিতে পারি, অন্যান্য উপদেশের ন্যায় এসব ঘটনা উল্লেখের তাৎপর্য্যও সর্ব্বদা তাহাই থাকিত। পুরাণাদি শাস্ত্রেও এজাতীয় ঘটনার তাহাই তাৎপর্য্য। আমরা ব্যাঘ্র-সর্পাদি জানোয়ারদিগকে হিংস্রস্বভাব জানিয়া তাহাদের সম্বন্ধে হিংস্রভাব পোষণ করিয়া থাকি, অনেক জন্তুকে মলিন জানিয়া ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া থাকি, অনেক প্রাণীর জীবন তুচ্ছ জানিয়া তাহাদিগকে খেলার ছলেও হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হই না। ইহাতে আমাদের নিজেদের চিত্তেই হিংসা, ভয়, ঘৃণা, নিষ্ঠুরতা, অভিমান প্রভৃতি অসদ্‌বৃত্তিসমূহ ক্রমশঃ প্রবল হইয়া জীবনের

পূর্ণতা সাধনের পক্ষে ভীষণ অন্তরায় হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা যদি জানি যে ভগবান্ সর্ব্বভূতে অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজিত আছেন, ভগবান্ বিশেষ কার্য্যসাধন উপলক্ষে কূর্ম্ম বরাহাদিরূপেও অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, এবং কোন কোন মহাপুরুষও আমাদের অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় কোন কোন বিশেষ কারণে কখন কখন ব্যাঘ্র সর্পাদি জন্তুর মূর্ত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক বিচরণ করেন, তবে এই জ্ঞান ঐসব অসদ্‌বৃত্তিকে দমন করিয়া রাখে, চিত্তের প্রসন্নতা ও পবিত্রতা সম্পাদন করে, এবং জীবনকে সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের পথে পরিচালিত করে। ভগবানের সকল বিধি ব্যবস্থার কারণ ও উদ্দেশ্য যেমন সাধারণ মানবীয় বুদ্ধির অগোচর, তত্ত্বজ্ঞানী ও শক্তিমান্ মহাপুরুষদের অনেক ক্রিয়াকলাপের কারণ ও উদ্দেশ্য তেমনি সংকীর্ণবুদ্ধি বহির্মুখ সাধারণ মনুষ্যগণ বুঝিতে অক্ষম হয়। সুতরাং আমাদের বিচার-বুদ্ধি যদি সেই সব গবেষণায় ধাবিত না হইয়া আমাদের সম্বন্ধে মহাপুরুষদের কার্য্য ও বাক্যের তাৎপর্য্য কি, তাহা নির্ণয় পূর্ব্বক, আমাদের জীবন পরিচালনে সাহায্য করে, তবেই এ ক্ষেত্রে বিচারশক্তির সার্থকতা হয়।

কপিলধারায় অন্তরঙ্গ যোগসাধনা

বাবা গম্ভীরনাথ পরিব্রাজক ভাবে নানা স্থানে পর্য্যটন করিবার পর যখন কোন নিভৃত গুহায় সুনির্দ্দিষ্ট আসনে দীর্ঘকালব্যাপী তীব্রতর অভ্যাস যোগে নিরত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার বৃদ্ধ গুরুদেব বাবা গোপালনাথজী দেহত্যাগ করেন। তাঁহার প্রথম শিষ্য বাবা বলভদ্রনাথ তৎপরিত্যক্ত মোহান্তপদে অভিষিক্ত হইলেন। এই সময়ে বাবা গম্ভীরনাথ একবার গুরুর সমাধিদর্শনের জন্য গোরক্ষপুর মন্দিরে আসিয়া কয়েক মাস অবস্থান করিয়াছিলেন। তখন মোহান্ত ও জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা বাবা বলভদ্রনাথের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁহাকে একমাস কি দেড়মাস মন্দিরের পূজার ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু যাঁহার চিত্ত নিরবচ্ছিন্ন সমাধিসুখ সম্ভোগের জন্য উৎকণ্ঠিত, তিনি কি লোকসঙ্গে ও লৌকিককর্ম্মে আপনাব সময় ও শক্তি নিয়োজিত রাখিতে পারেন? যিনি গভীর ধ্যানে মানবজীবনের চরম জ্ঞান ও চরম আনন্দের আস্বাদ লাভ করিয়াছেন, অথচ সর্ব্বাবস্থায় সেই জ্ঞান ও আনন্দকে অনাবৃত ও অবিক্ষিপ্ত রাখিতে শিক্ষা করেন নাই, সংসারে সমস্ত বৈচিত্র্য ও কোলাহলের মধ্যে সেই সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ ও আনন্দ-স্বরূপের বিকাশ দর্শন করিয়া ভিতর ও বাহির—সমাধি ও ব্যুত্থান—এক করিয়া ফেলিতে

সমর্থ হন নাই, তিনি কি সেই নিরাপদ চরম ভূমিতে অচলা স্থিতি লাভ করিবার পূর্ব্বে, বাহ্য সংসারের সহিত কোন লৌকিক সম্বন্ধ সহ্য করিতে পারেন? আশ্রমে বাবা গম্ভীরনাথ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন এবং অচিরেই সকলের সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরুদ্দেশ যাত্রা করিলেন।

তিনি নিরাবিল যোগাভ্যাসের অনুকূল স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে গয়ার সমীপবর্ত্তী ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের সানুদেশে কপিল-ধারায় উপস্থিত হইলেন। এই স্থানটি তাঁহার বড়ই পছন্দ হইল। মানুষের হাতে পড়িয়া স্থানটির বাহ্যাকৃতি এত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে, বাবা গম্ভীরনাথের প্রথম দর্শন কালে ইহার অবস্থা কেমন ছিল, তাহা অনুভব করিবার জন্য একটু কল্পনাশক্তির আশ্রয় লইতে হয়। বর্ত্তমানে সেখানে পরমহংস রতনগিরি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের পাকাবাড়ী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের নিবিড়তার সঙ্গে কৃত্রিমতার আড়ম্বর যোগ করিয়া দিয়াছে, কয়েকজন সাধু নিয়তভাবে সেই আশ্রমে বাস করায়, এবং সহর হইতে মাঝে মাঝে সেখানে লোকজন যাতায়াত করায়, স্থানটীকে এখন সম্পূর্ণ নির্জ্জন বলা চলে না। কিন্তু বাবা গম্ভীরনাথ যখন নিরবচ্ছিন্ন যোগাভ্যাসের জন্য এই স্থানটি মনোনীত করেন, তখন এ সব কিছুই ছিল না। দুই একজন বৈরাগ্যবান্ নির্জ্জনপ্রিয় সাধক ব্যতীত অন্য লোক অতি অল্পই সেখানে গমনাগমন করিত। স্থানটির প্রাকৃতিক অবয়ব সন্নিবেশ যেমন মনোরম, তেমনি সাধনের অনুকূল। তিন দিকে উচ্চ ও অনুচ্চ নানাশ্রেণীর

পাহাড়ের প্রাচীর স্থানটিকে পরিবেষ্টন করিয়া তাহার নির্জ্জনতা ও গাম্ভীর্য্যকে নিরাপদ ও সৌন্দর্য্য মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে, তন্মধ্যে ব্রহ্মযোনি সর্ব্বোচ্চ। অন্যদিক দিয়া একটি সঙ্কীর্ণ গিরিপথ বক্রগতিতে অগ্রসর হইয়া লোকালয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে। স্থানটি দুরারোহ গিরিশৃঙ্গের উপরে অবস্থিত নয়, অথচ নিম্নের সমতল ভূমি হইতে অনেক উচ্চে; দুর্গম জঙ্গলাকীর্ণ নয়, অথচ মাঝে মাঝে বৃক্ষচ্ছায়া সুশোভিত; ছোট বড় বৃক্ষ শ্রেণী লতা-পল্লব-সমাচ্ছন্ন শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া সূর্য্য কিরণ প্রবাহের কোমলতা সম্পাদনের জন্য দণ্ডায়মান আছে; পার্ব্বত্য হিংস্র পশুও তাহাদের নিম্নে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়, হিংসাবিহীন নির্ভীক সাধুসন্ন্যাসীও বিশ্রাম লাভ করেন। সেখানে শৈত্যেরও তীক্ষ্নতা নাই, উত্তাপেরও প্রাখর্য্য নাই; সমীরণ সতত মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হইয়া স্নেহ-মধুর হস্তে ব্যজন করিতে করিতে চলিতেছে, কেহ তাহার সেবা গ্রহণ করিতেছে কিনা সেদিকে দৃষ্টি প্রদান করিবার অবসর তাহার নাই। একটি ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী কি যেন কি শান্তিপ্রদ মন্ত্র সুললিত ছন্দে আপন মনে গাহিতে গাহিতে এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া ফিরিয়া সমতল ভূমির দিকে অনবরত অগ্রসর হইতেছে। এই নির্ঝরিণীই কপিলধারা। পিপাসায় জল প্রদান করিয়া, সঙ্গীতালাপে অবসাদ ও সন্তাপ বিদূরিত করিয়া, স্নান আচমন শৌচাদি ক্রিয়ার জন্য স্বচ্ছসলিলের সরবরাহ করিয়া, দেহমনের মালিন্য ধৌত করিয়া, এবং অন্যান্য নানাবিধ উপায়ে স্নেহময়ী তপস্বিনী কপিলধারা সাধকদিগকে ও

সমাগত অতিথিদিগকে সেবা করিয়া থাকে। ব্যাঘ্রাদি জন্তু সকলও তাহার সেবা হইতে বঞ্চিত হয় না। কপিলধারার নিকটে,—সমতল ভূমির অনেকটা কাছে—কপিলেশ্বর শিবের মন্দির বিদ্যমান আছে। সেই মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে কয়েকটি উচ্চ বৃক্ষ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া মন্দিরটিকে সুশীতল করিয়া রাখিয়াছে।

যদিও বর্ত্তমানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা, লোকচলাচলবৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে স্থানটীর নির্জ্জনতা ও গাম্ভীর্য্যের এবং প্রাকৃতিক নগ্ন-সৌন্দর্য্যের অনেকটা হানি হইয়াছে, তথাপি এই স্থানটি যে সাধনার বিশেষ উপযুক্ত, শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিদের পক্ষে তাহা ধারণা করিতে এখনও কোন কল্পনার আবশ্যকতা হয় না। একজন বহির্মুখ ব্যক্তিও যদি শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে নিবিষ্টমনে ক্ষণকাল এখানে কোন বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া, মস্তকোপরি সুনীল আকাশ, চতুষ্পার্শ্বে উচ্চনীচ পর্ব্বত শ্রেণী, কপিলধারার মৃদু মধুর সঙ্গীত, অশ্বত্থ বৃক্ষের একতান সর্‌সর্ ধ্বনি, নিম্নদেশে সমতল ভূমির পদার্থরাজির ক্ষুদ্রতা প্রভৃতি উপভোগ করিতে থাকেন, তবে স্থানের স্বাভাবিক প্রশান্ত গম্ভীর উদাসভাব ক্রমশঃ হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসে, প্রাণ উদাস হইতে থাকে, চক্ষু আপনা আপনি নিমীলিত হইয়া আসে, সমস্ত চিত্ত আত্মসমাহিত হইতে চায়। এই স্থানটী পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কিরূপ ছিল, তাহা যদি কল্পনা নেত্রে দর্শন করিয়া লওয়া যায়, তবে ধারণা হয় যে, স্থানটি বাবা গম্ভীরনাথের ন্যায় মহাযোগীর সাধনারই সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিল

বিশেষতঃ গয়াক্ষেত্র হিন্দুদিগের একটী প্রধান তীর্থ ও তপোভূমি। সেখানে গয়াসুরের মস্তকোপরি বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ড-দান একটী প্রধান পারলৌকিক ক্রিয়া। হিন্দুমাত্রেই বিশ্বাস করেন যে, যাহার উদ্দেশ্যে গয়ায় পিণ্ডদান করা যায়, সেই মৃতব্যক্তির জীবাত্মা প্রেতযোনি হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়, সে কোন বিশেষ পাপের ফলে নীচ যোনিতে জন্মিয়া থাকিলে, তাহা হইতে শীঘ্র মুক্তি লাভ করে, এবং সে যেখানেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকুক না কেন, এবং যে অবস্থাতেই অবস্থান করুক না কেন, সেখানেই এই পিণ্ডদানের ফলে সে সুখ অনুভব করে ও তাহার কষ্টের লাঘব হয়। বাবা গম্ভীরনাথও এই বিশ্বাস সমর্থন করিতেন, এবং গয়ায় পিণ্ডদান করিতে উপদেশ দিতেন।

জগদ্‌গুরু বুদ্ধদেব বুদ্ধগয়ায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, ইহা সর্ব্বজন বিদিত। কলিপাবনাবতার চৈতন্যদেবের হৃদয়-প্রস্রবণ-বিনিঃসৃত যে ভক্তি ও প্রেমের বন্যা বঙ্গদেশ ও দাক্ষিণাত্য প্লাবিত করিয়াছিল, গয়াতেই তাহা তাঁহার হৃদয় ভেদ করিয়া প্রথম প্রবাহিত হয়। যাঁহার সাধনা ও উপদেশ নবীন বঙ্গের হৃদয়ে ভক্তিভাব ও সাধুসঙ্গলিপ্সা বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া দিয়াছে এবং যাঁহার প্রভাবে বঙ্গভূমি ভক্তিভূমি বলিয়া পরিচিত হইয়া সাধুসমাজের বিশেষ স্নিগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে, সেই মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও গয়াতেই কপিলধারার সমীপবর্ত্তী আকাশ-গঙ্গাপাহাড়ে সদ্‌গুরুকৃপা লাভ ও তীব্র সাধন ভজন করিয়াছিলেন।

কত মহাযোগী মহাজ্ঞানী গয়ার নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্যস্থান-

সমূহে সাধন ভজনে নিমজ্জিত হইয়া মানবজীবনের চরম কল্যাণ লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। যাঁহারা সিদ্ধিলাভান্তে জীবের প্রতি করুণাবশতঃ লোকালয়ে লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক প্রকাশ্যভাবে জ্ঞান ও ধর্ম্মের জ্যোতি বিকিরণ করেন, লোকে তাঁহাদেরই কথা জানে, এবং তাঁহাদেরই মধ্যে কোন কোন অসাধারণ-প্রভাব-সম্পন্ন মহাত্মার নাম ও কার্য্যকলাপের বিবরণ, ইতিহাস, কাব্যকলা সাহিত্য প্রভৃতিতে স্থান লাভ করে। কিন্তু যে সকল লোকোত্তর মহাপুরুষ লোকশিক্ষার বাসনাকেও বাসনা বলিয়া পরিত্যাগ করেন, করুণাকেও বন্ধন মনে করিয়া চিত্ত হইতে বিদায় করেন, তাঁহারা লোকচক্ষুর অন্তরালে পার্ব্বত্য গুহাদিতে অবস্থান করিয়াই চিরজীবন আত্মানন্দ সম্ভোগ করিতে থাকেন, এবং ধ্যান-সমাধিতে নিমগ্ন থাকিতে থাকিতেই যথাকালে দেহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিদেহ মুক্তিলাভ করেন ; তাঁহাদের সাধনা ও তত্ত্ব-জ্ঞানের শক্তি জগতের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিধান অনুসারে অলক্ষিত ভাবে অপরাপর সকল মানুষের অন্তঃকরণের উপর,—মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় জীবনের উপর—জাগতিক জীবন প্রবাহের গতির উপর— অনিবার্য্য প্রভাব বিস্তার করিলেও, তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রায়শঃ কিছুই জানিবার উপায় থাকে না, তাঁহাদের খোঁজ খবরও প্রায় কেহই গ্রহণ করেন না।

ভারতবর্ষের সাধন জীবনের আদর্শ যেরূপ, তাহাতে লোকসমাজে পরিচিত যথার্থ মহাপুরুষ অপেক্ষা, অপরিচিত, নিরন্তর সাধননিরত,

সমাধি-আনন্দে বিভোর, যথার্থ মহাপুরুষের সংখ্যা অধিক বলিয়াই অনুমান হয়। গয়ার শৈলাঞ্চলে এরূপ জ্ঞাত ও অজ্ঞাত অনেক সাধক সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। হিমালয় ব্যতীত গয়ার পর্ব্বত শ্রেণীর মত সাধনার অনুকূল স্থান অতি বিরল। তাই অসংখ্য সাধক লোকের জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে চিরকাল এসব স্থানে সাধন করিয়া আসিতেছেন। বাবা গম্ভীরনাথও এই স্থানকেই তাঁহার সাধনার চরম অবস্থায় নিগূঢ়তম যোগাভ্যাসের জন্য মনোনীত করিলেন।

বাবা গম্ভীরনাথ যখন বিশেষ যোগাভ্যাসের জন্য কপিলধারার আসন গ্রহণ করিলেন, তখন সেখানে আশ্রমাদি ত দূরের কথা, কোন গুফা বা পর্ণকুটীরও ছিল না। তিনি দিবস রজনী উম্মুক্ত আকাশতলে ঐকান্তিক সাধন ভজনে অতিবাহিত করিতেন। কখন কখন ব্রহ্মযোনি প্রভৃতি উচ্চ পর্ব্বতোপরি গমন পূর্ব্বক সমাধিনিমগ্ন হইতেন, কখন বা পর্ব্বতগাত্রে অথবা স্বভাবনির্ম্মিত গহ্বরে সমাসীন হইয়া আত্মসমাহিত ভাবে অবস্থান করিতেন, প্রায়শঃ কপিলধারাতেই কোন বৃক্ষতলে বা আকাশতলে ধ্যানস্তিমিত লোচনে আত্মানন্দ সম্ভোগে ডুবিয়া থাকিতেন। শীত গ্রীষ্ম তাঁহার নিকট সমান ছিল। বর্ষার বারিধারা শিরোপরি বর্ষিত হইতেছে, যোগিরাজ স্থিরাসনে প্রসন্নচিত্তে নিশ্চলভাবে বসিয়া আছেন, কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ ছিলেন,—সঙ্গে কোন সাধু বা সেবকও থাকিত না। পরিধানে একখানি মাত্র কৌপীন, গাত্রে একখানি মাত্র কম্বল, এবং

দ্রব্যসম্ভারের মধ্যে একটি খর্পর (বা নারিকেল নির্ম্মিত পাত্র বিশেষ) ও একটি ফৌরী (যোগদণ্ড বিশেষ)।

কিন্তু এরূপ অনন্যচেতা সাধকদের 'যোগক্ষেম বহনের' ব্যবস্থা ভগবান্ পূর্ব্বেই করিয়া রাখেন। তিনি গয়ায় যাইবার অত্যল্প কাল পরেই আকু কুর্ম্মী নামক এক নিম্ন জাতীয় দরিদ্র ব্যক্তি তাঁহার দর্শন লাভ করে। সে কাষ্ঠাদি সংগ্রহের জন্য কপিলধারা প্রভৃতি পার্ব্বত্য স্থানে গমনাগমন করিত। এই নিষ্কিঞ্চন ধ্যাননিষ্ঠ সাধুকে দর্শন করিয়া সে—কি জানি কাহার প্রেরণায়—স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার সেবা করিতে আরম্ভ করে। এই নীচকুলোদ্ভব ধনহীন জ্ঞানহীন লোকটি কোন অলক্ষ্যশক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়াই যেন সাধুর কি প্রয়োজন, তাহা বুঝিতে পারিত,—এবং তাঁহার কোন আদেশ বা ইঙ্গিতের অপেক্ষা না করিয়া আপনা আপনি ধ্যানমগ্ন সাধুর ধূনীর জন্য কাষ্ঠ সংগ্রহ করিত, ধূনী জ্বালাইয়া রাখিত, আহারের জন্য ফলমূল দুগ্ধাদি আয়োজন করিয়া আনিত, এবং অন্যান্য বিবিধ উপায়ে মহাযোগীর শরীরটীর সময়োপযোগী স্বাচ্ছন্দ্যবিধানে চেষ্টা করিত। এই গরীব বেচারীর পরিবারও নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না। তাহারা দুই ভাই, উভয়ের স্ত্রী ও কয়েকটি পুত্রকন্যা ছিল। দুই ভাইকে কেবলমাত্র শারীরিক পরিশ্রম দ্বারাই পরিবারের ভরণপোষণ করিতে হইত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আকু এই মহাপুরুষের সেবায় তাহার অনেক সময় ও শক্তি নিয়োজিত করিত। ইহাই তাহার সকল কর্ত্তব্যের মধ্যে যেন শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইল।

তাহার দেখাদেখি তাহার ভাই মুন্নিও আসিয়া সাধুসেবায় যোগদান করিল। ক্রমে সমস্ত আক্কু পরিবার বাবা গম্ভীরনাথের একনিষ্ঠ সেবক হইয়া উঠিল। তাহারা তাঁহার সেবা করিত, তাহাদের সুখ-দুঃখের কথা আপন মনে তাঁহার নিকট বলিয়া যাইত,—তিনি শুনিতেছেন কিনা, বা শুনিলেও কোন প্রতিবিধান করিবেন কিনা, তদ্বিষয়ে কোনরূপ চিন্তা করাই যেন তাহারা প্রয়োজন মনে করিত না,— কোন বিপদে পড়িলে তাঁহার নিকট নিবেদন করিয়াই নিশ্চিন্ত হইত। বাবা গম্ভীরনাথেরও পরবর্ত্তী জীবনের ব্যবহারে বোধ হইত যে, তিনি যেন আপনাকে আক্কু-পরিবারের নিকট চির-ঋণে আবদ্ধ মনে করিতেন। তিনি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই পরিবারের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ স্নেহদৃষ্টি রক্ষা করিয়াছেন; ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পরে প্রদত্ত হইবে।

দুইমাস কি ততোধিক কিছু সময় এইরূপে অতিবাহিত হইলে পর, একজন যোগধর্ম্মপিপাসু সাধক তাঁহার সঙ্গ লাভ করেন। ইনি বাবা নৃপৎনাথ। তিনি তখন গার্হস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় সদ্‌গুরুর অন্বেষণ করিতেছিলেন। বাবা গম্ভীরনাথের দর্শন লাভ করিয়া তিনি দীক্ষাপ্রার্থী হন। কিন্তু বাবাজী শিষ্য করিতে সম্পূর্ণ অসম্মত। বীরসাধক নৃপৎনাথও ভগ্নমনোরথ না হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহাকেই গুরুপদে বরণ করিয়া, গুরুসেবাই মোক্ষের উপায় বোধে তাঁহার সেবা করিতে আরম্ভ করিলেন। তদবধি নৃপৎনাথ কদাচিৎ তাঁহার সঙ্গ ছাড়া হইয়াছেন। বাবাজী যখন সাধনে নিমগ্ন, নৃপৎনাথ তখন তাঁহার

দেহের রক্ষণে ও স্বাচ্ছন্দ্যবিধানে ব্যাপৃত। তিনি তাঁহার আহারাদির ব্যবস্থা ত করিতেনই, অধিকন্তু তাঁহার সাধনে কোনরূপ বিঘ্ন না হয়, তদুদ্দেশ্যে বীরসেবক নৃপৎনাথ অনেকসময় ভৈরবের বেশ ধারণ পূর্ব্বক ত্রিশূল হস্তে হিংস্রজন্তু বিতাড়িত করিতেন, লোকজন আসিয়া নির্জ্জনতা ভঙ্গ করে বা কোনরূপ উদ্বেগ জন্মায় এই আশঙ্কায় প্রয়োজন বোধে কখন কখন আগন্তুক-দিগকেও ভীতিপ্রদর্শন করিতেন। গুরুজী তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইলে নৃপৎনাথ তাঁহার ছায়ার মত সাথে সাথে যাইতেন। তিনি যখন যেখানে যেভাবে থাকিতেন, নৃপৎনাথ তখন সেখানে তদুপযোগী সেবার বিধান সহ উপস্থিত। নৃপৎনাথ যেমন আদর্শ মহাযোগীর সেবায় অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, নিজেও তেমনি আদর্শ সেবক ছিলেন। 'দুরাপা হল্পতপসাং সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মনাম্',—সর্ব্বকুণ্ঠাবিরহিত ব্রহ্মধামের যাত্রীদিগকে সেবা করিবার অধিকার অল্পতপা ব্যক্তিগণ লাভ করিতে পারে না। এরূপ সেবার অধিকার জন্মজন্মান্তরীণ বহুতপস্যার ফল।

নৃপৎনাথ আদর্শ গুরুর আদর্শ সেবক ছিলেন। তবে, তাঁহার রুদ্রভাব কিছু বেশী ছিল। শ্রদ্ধালু আগন্তুকদিগের প্রতি রুদ্রভাব প্রকাশের জন্য মাঝে মাঝে তিনি গুরুকর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হইতেন। কিন্তু কোমলপ্রাণ প্রেমিক সাধককে নিরাবিল সাধনের সুযোগ-প্রদান করিবাব জন্য সম্ভবতঃ সেবকের কতকটা রুদ্রভাবের প্রয়োজন ছিল। ১৩।১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কায়মনোবাক্যে সেবা করার পরও বাহ্যতঃ গুরুদেব সেবককে কোনরূপ মন্ত্রদীক্ষা প্রদান

করেন নাই। ইহাতে নিষ্কাম সেবকের মাহাত্ম্য আরও অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছিল, এবং এই নিষ্কাম সেবাদ্বারা বাস্তবিকই নৃপৎনাথ কৃতার্থ হইয়াছিলেন। সাধন জীবন শেষ হইবার পরে অপরাপর অনেক সাধুর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে যেন বাধ্য হইয়াই গুরুজী নৃপথনাথকে বাহ্যতঃ দীক্ষা প্রদান করেন।

আক্কু ও নৃপৎনাথের দ্বারা সেবিত হইয়া কিছুকাল বাবাজী স্বচ্ছন্দভাবে কপিলধারায় সাধনে নিমগ্ন থাকেন। তৎপর গ্রহণ উপলক্ষে তিনি একবার কাশীতে গমন করেন। তখন তিনি নাথসম্প্রদায়ের গোরখ্‌টিলাতেই কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময় বাবা শুদ্ধনাথ তাঁহার অনন্যসাধারণ ভাবগম্ভীর তেজোমণ্ডিত মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং সেবকরূপে তাঁহার সঙ্গে গয়ায় আসেন। শুদ্ধনাথও তদবধি নৃপৎনাথের সহকারী রূপে কায়মনোবাক্যে বাবাজীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। এইরূপে তিনি বহুকাল গুরুসেবা-দ্বারা আত্মশুদ্ধি লাভ করিয়া, নৃপৎনাথের দীক্ষার কয়েকমাস পরে, বাবাজীর চেলা হওয়ার অধিকার পান। বাবাজীর সাধন-জীবনে এই তিন জনই প্রধান সেবক। তিন জনেরই সৌভাগ্য অনন্যসাধারণ। তন্মধ্যে আক্কু বহুদিন পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করিয়াছিল। বাবাজীর মহাসমাধির ৫।৬ মাস পূর্ব্বে বাবা নৃপৎনাথের তিরোধান হয়। বাবা শুদ্ধনাথ এখনও জীবিত আছেন, এবং তাঁহার নিকট হইতেই বাবাজীর সাধন জীবন-সম্বন্ধে অধিকাংশ তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আর

দুইজন ধনী গৃহস্থও গয়ায় সাধনের সময় বাবাজীর সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। একজন গয়ার মাধোলাল গয়ালি, আর একজন পাটনার মতিলাল ঘোষ। মাধোলালের সহিত পরিচয়ের পর কপিলধারায় গুফা নির্ম্মাণ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ব্যয়ের ভার প্রায় তিনিই বহন করিয়াছেন।

কপিলধারা পাহাড়ের নিম্নে খর্পর ভৈরব নামক স্থানে নৃপৎনাথ ও শুদ্ধনাথ ক্ষুদ্র একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া লইয়াছিলেন। সেখানেই তাঁহারা আহার, শয়ন ও বিশ্রাম করিতেন। বাবা শুদ্ধনাথ সেই স্থানে ক্ষুদ্র একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া এখনও সশিষ্য বাস করিতেছেন। বাবা গম্ভীরনাথ পাহাড়ের উপরে নিষ্কিঞ্চন, নিরালম্ব ও নিরাশ্রয় ভাবে ধ্যানমগ্ন থাকিতেন, আর সেবকদ্বয় যখন যাহা প্রয়োজন তাহা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতেন এবং অবসর সময়ে নীচে আসিয়া বিশ্রাম লাভ করিতেন। এই ভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হইতে থাকিলে, ক্রমেই লোকপরম্পরায় 'খুব বড় মহাত্মা' বলিয়া কৌতূহলী লোকসমাজে তাঁহার নাম প্রচারিত হইতে থাকে। ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের চতুষ্পার্শ্বে নিভৃত স্থান সমূহে যে সকল সাধক পরমার্থান্বেষণে নিরত ছিলেন, তাঁহারাও তাঁহার প্রভাব অনুভব করিয়া তাঁহাকে বিশেষ ভাবে ভক্তিশ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পবিত্র সান্নিধ্যে চিত্ত সহজে সমাহিত হইবে, এই আশায় অনেক মহাত্মা রাত্রিকালে নিজ নিজ আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে আসিয়া আসন গ্রহণ করিতেন এবং তাঁহার সহিত ভজনে যোগ

দিতেন। দিবাভাগে অনেক শ্রদ্ধাবান্ গৃহী সকামভাবে বা নিষ্কামভাবে তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া আসিতে লাগিলেন। তিনি কখন কখন লোকদৃষ্টি পরিহার করিবার জন্য সুগভীর নির্জ্জন প্রদেশে চলিয়া যাইতেন, কখন কখন নৃপৎনাথ লোকজনের যাতায়াতে বাধা প্রদান করিতেন, কখন কখন বা তিনি নির্ব্বাক নিষ্পন্দ হইয়া আপন ভাবে অবস্থান করিতেন এবং ভক্তিমান্ দর্শনলিপ্সুগণ দর্শন ও প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেন।

বাবা শুদ্ধনাথ বলিয়াছেন যে, এই সময় মাধোলাল পাণ্ডা একটি ভীষণ মোকর্দ্দমায় জড়িত হইয়া পড়েন। মোকর্দ্দমায় পরাজয় ঘটিলে, তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়, অথচ জয়লাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনাও আপাতদৃষ্টিতে লক্ষিত হইতেছিল না। এরূপ অবস্থায় স্বভাবতঃই সংসারী লোকের হৃদয়ে আত্যন্তিক দীনতার সঞ্চার হয় এবং ভগবদ্ভক্তি ও সাধুভক্তিও অতিমাত্রায় বর্দ্ধিত হয়। তিনি বাবা গম্ভীরনাথের অসাধারণ তপঃপ্রভাবের সংবাদ অবগত হইয়া দীনভাবে ও আর্ত্তির সহিত তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহার সেবায় দেহ, প্রাণ ও মন ঢালিয়া দিলেন। আর্ত্ত এবং অর্থার্থী ভক্তও যদি স্বীয় কামনাপূর্ত্তির উদ্দেশ্যে অকপট ও ব্যাকুল হৃদয়ে ভগবানের বা ভগবদ্গতপ্রাণ মহাপুরুষের চরণে আত্মসমর্পণ করেন, তবে ভগবানের ও মহাপুরুষের কৃপায় কেবল-মাত্র তাঁহার কামনারই পূর্ত্তি হয় না, অধিকন্তু তাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধি লাভ করিয়া আর্ত্তি ও অর্থপিপাসা হইতে মুক্ত হয় এবং অহৈতুকী ভক্তির অধিকারী হয়। বাবা গম্ভীরনাথ কখনও কোন অলৌকিক

যোগশক্তি প্রকাশ করিতেন না, সুতরাং প্রকাশ্যভাবে কোন অলৌকিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া তিনি যে সকাম সেবকের হৃদ্গত প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন, তাহা সম্ভব ছিল না। কিন্তু তিনি দয়ার্দ্র চিত্তে ভক্ত মাধোলালের প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, এবং একদিন তাঁহাকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া সহজভাবে—'আচ্ছাই হোগা' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন ও বিষাদগ্রস্ত হইতে নিষেধ করিলেন। যথাসময়ে মাধোলাল নিতান্ত অপ্রত্যাশিতরূপে হাইকোর্টে জয়লাভ করেন। এই জয়লাভ যে মহাপুরুষের কৃপা ও আশীর্ব্বাদেরই ফল, তৎসম্বন্ধে তাঁহার মনে কোন সন্দেহই উদিত হইল না। তদবধি মাধোলাল বাবাজীর একজন বিশিষ্ট অনুগত ভক্ত হইলেন, তাঁহার সেবার ভিতরে যে সকাম ভাব ছিল, তাহা বিদূরিত হইল, তিনি নিষ্কাম ভাবে বাবার সেবায় নিযুক্ত হইলেন এবং যে কোন উপায়ে তাঁহার কিছু স্বাচ্ছন্দ্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হইলেই তিনি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেন।

কিছুকাল পরে বাবাজীর নিবিড় সাধনার জন্য কপিলধারায় একটি যোগগুহা প্রস্তুত করিয়া দিবার সংকল্প তাঁহার মনে উদিত হইল। তদ্বিষয়ে তিনি বাবাজীর অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, এবং বাবাজীও অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। কি ভাবে গুহা নির্ম্মাণ করিতে হইবে, সেবকের আগ্রহে তৎসম্বন্ধেও বাবাজী উপদেশ দান করিলেন। তদনুসারে মাধোলাল বাবাজীর নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাঁহার উপদেশানুযায়ী সুন্দর একটি যোগগুহা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া

যোগমঠের বহির্ভাগ

আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করিতে লাগিলেন। এই গুহার সন্নিকটে একটি বেদীও নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং বেদীর মধ্যস্থলে একটি বিল্ববৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল। বাবাজী স্বহস্তে সেই বেদীর উপর কয়েকটি ত্রিশূল প্রোথিত করিয়াছিলেন। বেদীর চারি কোণে চারিটি আসন স্থাপিত হইয়াছিল। উক্ত যোগগুহা এবং তৎসংলগ্ন বেদী প্রভৃতি এখনও বর্ত্তমান আছে। এই গুহায় যোগিরাজ গম্ভীরনাথ নিয়মিত ভাবে ১২।১৩ বৎসর ঐকান্তিক যোগসাধনে নিমগ্ন ছিলেন।

হঠপ্রদীপিকায় যোগমঠের যেরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়, সম্ভবতঃ সেই প্রণালীতেই তিনি এই গুহা নির্ম্মাণের উপদেশ দিয়াছিলেন।

স্বল্পদ্বার মরন্ধ্রগর্ত্তপিটকং নাত্যুচ্চনীচায়তম্,
সম্যগ্ গোময়সান্দ্রলিপ্ত মমলং নিঃশেষবাধোজ্ঝিতম্।
বাহ্যে মণ্ডপকূপবেদিরুচিরং প্রাকারসম্বেষ্টিতম্,
প্রোক্তং যোগমঠস্য লক্ষণমিদং সিদ্ধৈ র্হঠাভ্যাসিভিঃ॥

যোগমঠ ক্ষুদ্রদ্বার বিশিষ্ট, রন্ধ্রগর্ত্তাদি শূন্য, স্বল্পায়তন, নাতিউচ্চ, নাতিনিম্ন, গোময়লিপ্ত ও পরিষ্কার হইবে; যোগবিঘ্নকর কোন জীব বা বস্তু সেখানে থাকিবে না; বহির্ভাগ মণ্ডপ, কূপ ও বেদী দ্বারা শোভিত হইবে, এবং প্রাচীরের বেষ্টন থাকিবে। হঠযোগাভ্যাসী সিদ্ধগণ যোগমঠের এইরূপ লক্ষণ বর্ণন করিয়া থাকেন।

এই স্থানটি স্বভাবতঃই যোগমঠের লক্ষণযুক্ত, তাহাতে যোগগুহা নির্ম্মিত হইয়া ইহার পূর্ণাঙ্গতা সম্পাদন করিল।

যোগগুহা প্রস্তুত হইলে তিনি প্রথম কিছুদিন গভীর ধ্যান ও গুহ্য যোগাঙ্গাভ্যাসের জন্য গুহায় প্রবেশ করিতেন, এবং অন্য সময় বাহিরে পূর্ব্ববৎ অবস্থান করিতেন। মাঝে মাঝে গুহার ভিতরে গভীর ধ্যানে এমন ভাবে নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন যে, দিনরাত্রির মধ্যে একবারও গুহার বাহিরে আসিতেন না। কখন কখন একদিন কি দুইদিন অন্তর একবার মাত্র বাহিরে আসিতেন। অনেক সময় সেবকেরা আহার্য্য ও পানীয় সংগ্রহ পূর্ব্বক বাহিরে প্রতীক্ষা করিতেন, তিনি কখন বাহির হইবেন ঠিক নাই। সমাধিভঙ্গে যখন তিনি বাহির হইতেন, তখন খাদ্যাদি কিছু গ্রহণ করিতেন, এবং দর্শনার্থী কেহ উপস্থিত থাকিলে দর্শন দিতেন। তৎপরে কিছুদিন সপ্তাহে মাত্র দুইবার করিয়া বাহিরে আসিতেন। তখনও আহারাদির ব্যবস্থা এইরূপ চলিতে লাগিল। এইভাবে কয়েকমাস অতিক্রান্ত হইলে তিনি নিয়ম করিলেন যে সদাসর্ব্বদা গুহার মধ্যেই তিনি সাধনে নিমগ্ন থাকিবেন, সপ্তাহে কেবলমাত্র মঙ্গলবার বৈকালে একবার বাহিরে আসিয়া কয়েক ঘণ্টা অবস্থান করিবেন। সেবকেরা বলেন যে এই নিয়মে তিনি দুই বৎসর সাধন করিয়াছিলেন। সে সময়ে সেবকেরা প্রতিদিন একপোয়া পরিমাণ দুগ্ধ তাঁহার গুহার ভিতরে রাখিয়া আসিতেন। গুহার ভিতরে দুইটি প্রকোষ্ঠ ; অন্তঃপ্রকোষ্ঠে তিনি ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। সেবকগণেরও তখন তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না। তাঁহারা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে গুহার বহিঃপ্রকোষ্ঠে ভিতরের দরজার সম্মুখে দুগ্ধটুকু

রাখিয়া দিতেন। ধ্যান যখন একটু শিথিল হইত, তখন তিনি তাহা পান করিতেন। মলমূত্র ত্যাগেরও কোন প্রয়োজন হইত না।

গয়াবাসী অনেকেই এই সময়ে তাঁহাকে অলোকসামান্য মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। মঙ্গলবার অপরাহ্নে তাঁহার দর্শন প্রত্যাশায় বহুসংখ্যক লোক নিজেদের শক্তি অনুসারে ফল, মূল, মিষ্ট প্রভৃতি সেবার উপযোগী দ্রব্য সামগ্রী লইয়া গুহার বাহিরে বেদীর নিকটে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত। তিনি সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে গুহা হইতে বহির্গত হইয়া বেদীর উপরে স্বহস্তে প্রোথিত ত্রিশূলের নীচে একটি আসনে উপবেশন করিতেন। কখন কখন কিছু ফল গ্রহণ করিতেন ও তামাক সেবন করিতেন। কথাবার্ত্তা প্রায় কখনও বলিতেন না। তবে, ঈষৎ স্নিগ্ধ মধুর দৃষ্টিতে সমাগত দর্শকবৃন্দের মন প্রাণ ভিজাইয়া দিতেন। কাহারও আনীত কোন জিনিষ একটু স্পর্শ করিলে তাহারা আপনাদের ভাগ্যকে সহস্র ধন্যবাদ দিয়া কৃতার্থ হইয়া যাইত। অধিকাংশ সময় ঐসব জিনিষের প্রতি একটু গ্রহণ সূচক দৃষ্টিপাত করিয়া উপস্থিত সকলের মধ্যে তাহা প্রসাদরূপে বণ্টন করিয়া দিতে ইঙ্গিত করিতেন। তাঁহার নয়ন প্রান্ত হইতে তেজ, শান্তি ও করুণা যুগপৎ বিকীর্ণ হইয়া উপস্থিত লোকদিগকে বিমোহিত ও অভিভূত করিয়া ফেলিত। তিনি কোন উপদেশ বা আশ্বাসবাণী মুখে উচ্চারণ না করিলেও, তাঁহার মূর্ত্তিখানিই যেন সকল কর্ম্ম ও কোলাহলের অতীত, সকল দুঃখ ও জ্বালার অতীত, সকল ভেদ ও ভয়ের অতীত, আনন্দময়, শান্তিময়, অমৃতময় কোন রাজ্যের

বার্ত্তা বহন করিয়া আনিত, এবং অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য উপস্থিত সকলেরই হৃদয় তাঁহার সান্নিধ্যে সংসারের যাবতীয় দুর্ব্বাসনা ও জ্বালাযন্ত্রনা ভুলিয়া সুশীতল হইয়া যাইত। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন যোগৈশ্বর্য্য তিনি কখনও প্রকাশ করিতেন না।

কোন লৌকিক কামনা লইয়া যাহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত, তাহারাও তাঁহার লোকাতীত ভাবগম্ভীর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রায়শঃ সে কামনার কথা ভুলিয়া যাইত, কামনার তরঙ্গ অত্যন্ত প্রবল হইয়া মাঝে মাঝে হৃদয়কে আঘাত করিলেও তাহা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিতে সাহস বা প্রবৃত্তি হইত না। যদি কেহ কখন কামনার বেগ ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার নিকট তাহা নিবেদন করিতে চেষ্টা করিত, তাহা হইলেও তিনি পূর্ব্ববৎ নীরবই থাকিতেন, তাঁহার মুখে চোখে কোন প্রকার ভাবান্তর লক্ষিত হইত না; এমন কি, তাঁহার কানে সে কথা প্রবেশ করিয়াছে কিনা তাহাও বুঝা যাইত না। কিন্তু তাহাতেও তাহাদের আগমন ও নিবেদন ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া তাহারা মনে করিত না। এইরূপে কয়েক ঘণ্টা বাহিরে অবস্থান করিয়া আবার এক সপ্তাহের জন্য তিনি যোগগুহায় প্রবেশ করিতেন; দর্শকবৃন্দও কেহ কেহ প্রাণের আনন্দে তাঁহার লোকোত্তর-চরিত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে, কেহ কেহ বা নীরবে তাহা সকল হৃদয় দিয়া অনুভব করিতে করিতে, স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইত।

সপ্তাহান্তে নির্গমনের নিয়ম পালন পূর্ব্বক প্রায় দুই বৎসর কাল সাধন করিবার পরে, তিনি পক্ষান্তে একবার মাত্র গুহার

বাহিরে আসিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তিনি প্রত্যেক অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় বাহিরে আসিতেন। যখন অহর্নিশ ধ্যাননিবিষ্ট অবস্থায় অতিবাহিত হইত, সে সময়ে দিন ক্ষণ তিথি নক্ষত্র ও কালাকাল বিচারের যে কোন সম্ভাবনাই ছিল না, তাহা সহজেই অনুমেয়। এরূপ অবস্থায় নিয়মিত দিনে বাহিরে আসা বা অন্য কোন নিয়ম রক্ষা করা বিস্ময়কর বোধ হইতে পারে। কিন্তু তীব্র ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন বিশুদ্ধসত্ত্ব মহাত্মগণ ধ্যানে নিবিষ্ট হইবার প্রাক্‌কালে যদি কোন সংকল্প রাখিয়া দেন, তবে সেই পূর্ব্বসংকল্প অনুসারেই যথাসময়ে আপনা আপনি কাজ হইয়া থাকে; সেই বহুদিন পূর্ব্বের সংকল্পই বহুদিন পরের ক্রিয়ার নিয়ামক কারণ হয়। বাবা গম্ভীরনাথের গুহা প্রবেশের সময়ে সম্ভবতঃ তদ্রূপ কোন সংকল্প থাকিত, সুতরাং তদনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট দিনে তিনি বাহির হইতে পারিতেন। হয়ত তাঁহার শরীররক্ষা ও যোগসাধন সৌকর্য্যের জন্য এরূপ সংকল্পের প্রয়োজনীয়তা ছিল; হয়ত বা ভবিষ্যতে লোকানুগ্রহের নিমিত্ত যে তাঁহাকে কতক পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করিতে হইবে, তজ্জন্য মাঝে মাঝে বহির্জগতের সহিত তাঁহার সম্পর্ক রাখা আবশ্যক ছিল, অথবা হয়ত সেই সাধনাবস্থাতেও তিনি বাহ্যতঃ ঔদাসীন্যের প্রতিমূর্ত্তি হইলেও অন্তরে লোকশিক্ষা ও লোকহিত সাধনে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন না, এবং সেই হেতু ব্যাবহারিক জগতের সহিত তিনি সকল সম্বন্ধ ছেদন করিতে ইচ্ছা করিতেন না। যে কোন কারণেই হউক, কার্য্যতঃ দেখা যাইত যে, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট দিনে বাহিরে আসিয়া

দর্শনবুভুক্ষু জনগণকে কয়েক ঘণ্টার জন্য সঙ্গদানে কৃতার্থ করিবার নিয়মটি লঙ্ঘিত হইত না।

কয়েক বৎসর পক্ষব্যাপী গুহানিবাসের অভ্যাসের পর তিনি মাসব্যাপী গুহানিবাসের অভ্যাস আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য ব্যবস্থা অবশ্য তখনও একরূপই চলিতে লাগিল। গুহায় অবস্থান কালে, দিবারাত্রে আহার এক পোয়া মাত্র দুগ্ধ, মলমূত্র ত্যাগের অপ্রয়োজনীয়তা, মাসান্তে বাহিরে আসিয়া কয়েক ঘণ্টার জন্য বেদীতে উপবেশন, সমাগত জনগণের প্রতি কৃপাদৃষ্টিদান এবং তাহাদের আনীত ফলাদি হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ পূর্ব্বক উপস্থিত সকলকে প্রসাদ-বিতরণ,—এই ভাবেই তাঁহার কাল অতিবাহিত হইতে লাগিল।

অবশেষে একবার তিনি গুহায় প্রবেশ করিয়া তিন মাসের মধ্যে আর বাহিরে আসিলেন না। এই তিন মাস নিয়ত অবিচ্ছেদে সমাধি নিরত থাকার পরে যখন তিনি গুহা হইতে বহির্গত হইলেন, তখন তাঁহার বিধিপূর্ব্বক যোগাভ্যাসের শেষ হইল। তাহার পর আর তিনি নিয়ম পূর্ব্বক গুহানিবাসী হন নাই। তখন হইতে অনিয়মে কখন তিনি গুহায় অবস্থান করিতেন, কখন বা বাহিরে থাকিতেন। অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই সময়ে তিনি মানবজীবনের চরম সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন; ব্রাহ্মী স্থিতির আদর্শ তাঁহার জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাঁহার ভিতর বাহির এক হইয়া গিয়াছিল। তদবধি তিনি দেহস্থ থাকিয়াও নিত্য নিরন্তর ব্রহ্মভূত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সম্যক্ সিদ্ধি ও পরিপূর্ণ মানবত্ব

কাশীধামে ও ঝুঁসিতে কয়েক বৎসর তীব্র সাধনার ফলেই যোগিরাজ গম্ভীরনাথ ব্রহ্মবিৎ হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার পরিচিত সাধুদের বিশ্বাস। তখন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার দ্বারা তাঁহার সকল-সংশয় তিরোহিত হইয়াছিল, সর্ব্ববিধ বাসনা নির্ম্মূল হইয়াছিল, দেহাত্মবোধ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়াছিল, সংসারের পরপার সম্বন্ধে তাঁহার অপরোক্ষজ্ঞান লাভ হইয়াছিল—এইরূপ অনুমান করিবার হেতু বিদ্যমান আছে। কিন্তু সমাধিতে ব্রহ্মের উপলব্ধিই সাধনার চরম-অবস্থা নয়, এই অবস্থা লাভ করিলেই মানবজীবনের সম্যক্ পরিপূর্ণতা সম্পাদিত হয় না। সংসারের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপে সন্তাপিত মানব তাহা হইতে মুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে যে অমৃতের অনুসন্ধানে বহির্গত হয়, ব্রহ্মদর্শন ঘটিলেই সেই অমৃতের আস্বাদন হয় বটে, কিন্তু শুধু তাহাতেই মানব জীবনের চরম-সফলতা লাভ হয় না,—ইহা অপেক্ষাও মানবের উন্নত-তর, পূর্ণ-তর অবস্থা লাভের অধিকার আছে।

মানুষ যে কত বড়, সে যে কত উচ্চ অধিকার লইয়া মানবদেহ গ্রহণ পূর্ব্বক সংসারক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছে,

তাহার হৃদয়-রত্নাকরের মধ্যে যে কত রত্ন লুক্কায়িত আছে; অজ্ঞানতা বশতঃ তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না বলিয়াই সে অন্ন লইয়া কাড়াকাড়ি মারামারি করে, অন্নের জন্য দাসত্ব ও ভিক্ষুকত্ব স্বীকার করে, অন্ন পাইলেই সাময়িক ভাবে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। গুরু ও ভগবানের চরণে যিনি আত্ম-সমর্পণ পূর্ব্বক সুদৃঢ় বিশ্বাস, ভক্তি ও বিচারের সাহায্যে মনোরূপ মন্থন দণ্ডকে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে পরিচালিত করিয়া হৃদয়সমুদ্র মন্থন করেন, তিনি স্বকীয় অতলস্পর্শ হৃদয়রত্নাকরের অন্তস্তল হইতে নিত্য নূতন রত্ন লাভ করিয়া চমৎকৃত হইতে থাকেন; কিন্তু যতই নূতন নূতন অচিন্তিতপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য ও আনন্দ হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহার উপলব্ধি গোচর হইতে থাকে, তাঁহার আশা ততই আরও বলবতী হয়, আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস ততই প্রবল হয়, স্বকীয় হৃদয়ের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ততই অধিক বিস্ময়াত্মক জ্ঞান লাভ হয়। তখন ঐ সকল ঐশ্বর্য্যকেও অকিঞ্চিৎকর বোধ করিয়া নূতন-তর ও পূর্ণ-তর ঐশ্বর্য্য ও আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে তিনি মন্থন কার্য্যও ক্রমশঃ অধিকতর আগ্রহের সহিত চালাইতে থাকেন।

হৃদয় হইতে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানন্দ রূপ অমৃত উত্থিত হইলেও এই মন্থন কার্য্য শেষ হয় না, সমস্ত হৃদয় অমৃতময় হইয়া যাওয়া চাই, সমস্ত দেহেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ সর্ব্বাবস্থায় ব্রহ্মভাবে ভাবিত ও ব্রহ্মরসে রসিত হইয়া থাকা চাই, জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে

একই ব্রহ্মতত্ত্ব সর্ব্বত্র দর্শন করা চাই। সমাধি অবস্থায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলেই, ব্রহ্ম ও আত্মার পারমার্থিক অভেদ অনুভব করিলেই সেই পরিপূর্ণ ব্রহ্মভাব লাভ হইল না, সমাধি অবস্থায় অদ্বৈতসিদ্ধি ও ব্যুত্থান অবস্থায় দ্বৈতদর্শন হইতে থাকিলে, জ্ঞান সম্পূর্ণ পরিপাকপ্রাপ্ত হইল না, ধ্যানাবস্থা ও জাগ্রদবস্থায় দৃষ্টির পার্থক্য থাকিলে জীবনের সম্পূর্ণ ঐক্য সম্পাদিত হইল না এবং আনন্দ অব্যাহত হইল না। যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মভাব সম্পূর্ণরূপে স্বভাবে পরিণত না হয়, যে পর্য্যন্ত সমাধিলব্ধ 'ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা' সর্ব্বাবস্থায় সমান পরিমাণে উজ্জ্বল না থাকে, সে পর্য্যন্তই তীব্র অভ্যাসযোগের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান থাকে।

ব্রহ্মোপলব্ধির পূর্ব্বের সাধন ও পরের সাধনে বিশেষ পার্থক্য এই যে, পূর্ব্বের সাধনে প্রত্যাহার ও ধারণার অভ্যাস দ্বারা অন্তঃকরণের বিষয়াকারতা দূরীভূত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয়, কিন্তু একবার ব্রহ্মের অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার লাভ হইলে তৎপর আর বিশেষ চেষ্টা করিয়া চিত্তকে এই অবস্থায় আনয়ন করা দরকার হয় না, ব্রহ্মস্মৃতি প্রবল থাকায় সঙ্কল্প মাত্রই চিত্ত আপনা আপনি বৃত্তিরহিত হইয়া ব্রহ্মভাবে ভাবিত ও ব্রহ্মাকারে আকারিত হয়। কিন্তু এই সমাধির অবস্থাকেই স্বভাবে পরিণত করিতে হইলে, জাগ্রদবস্থাতে দেহেন্দ্রিয়ের ব্যাপারের মধ্যেও চিত্তকে ব্রহ্মভাবযুক্ত রাখিতে হইলে, সর্ব্বাবস্থায় আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মানন্দ থাকিতে হইলে, বহুদিন নিত্য নিরন্তর জ্ঞান ও যোগের অন্তরঙ্গ সাধনে নিরত থাকার প্রয়োজন হয়।

মহোপনিষৎ, যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি শাস্ত্রে জ্ঞান সাধনার পথটিকে মোটামুটী সাতটি স্তরে বা ভূমিকায় বিভক্ত করা হইয়াছে।

জ্ঞানভূমিঃ শুভেচ্ছাখ্যা প্রথমা পরিকীর্ত্তিতা।
বিচারণা দ্বিতীয়া স্যাৎ তৃতীয়া তনুমানসা॥
সত্ত্বাপত্তিশ্চতুর্থী স্যাৎ ততোঽসংসক্তিনামিকা।
পদার্থাভাবনী ষষ্ঠী সপ্তমী তূর্য্যগা স্মৃতা॥

(১) শুভেচ্ছা, (২) বিচারণা, (৩) তনুমানসা, (৪) সত্তাপত্তি, (৫) অসংসক্তি, (৬) পদার্থভাবনী (৭) তূর্য্যগা—এই সাতটি ভূমিকার মধ্যে চতুর্থ ভূমিতেই সাধক ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ব্রহ্মবিৎ হন। প্রথম তিনটি ভূমি ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উত্তরোত্তর উন্নততর সাধন-সোপান, শেষ তিনটি ভূমিতে তীব্রতর ও গভীরতর সমাধি-অভ্যাস দ্বারা জ্ঞানের পরিপাক হয়, ব্রহ্মদর্শন স্বভাবে পরিণত হয়, জীবন্মুক্তির উত্তরোত্তর উন্নততর অবস্থা-লাভ ও তজ্জনিত বিশেষ আনন্দের আস্বাদ হয়।

চতুর্থী ভূমিকা জ্ঞানং তিস্রঃ স্যুঃ সাধনং পুরা।
জীবন্মুক্তেরবস্থাস্তু পরাস্তিস্রঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

যখন সাধারণভাবে সদসদ্ বিচারের ফলে ঐহিক ও পারলৌকিক সর্ব্ববিধ ভোগ্য বিষয়ই অনিত্য ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া ধারণা হয়, এবং শমদমাদির অভ্যাসের ফলে চিত্ত অনেক পরিমাণে শুদ্ধ হওয়ায় সংসার হইতে মুক্তিলাভ করাই জীবনের লক্ষ্য বলিয়া নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারা যায়, মোক্ষলাভ ব্যতীত আর কিছুতেই সকল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ও

অভীপ্সিত আনন্দের সম্ভোগ সম্ভবপর নয় জানিয়া যখন অন্তঃকরণ আকুল হইয়া মোক্ষেরই পথ খুঁজিতে আরম্ভ করে, তখনই জ্ঞানের প্রথম ভূমি—শুভেচ্ছা বা মুমুক্ষা—লাভ হইল। এই শুভেচ্ছা বা মুমুক্ষা জগতে অল্পসংখ্যক মহাভাগ্য মনুষ্যেরই লাভ হইয়া থাকে। শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন,—'মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।' সেই শুভেচ্ছা লইয়া জ্ঞান-ভিক্ষু সাধক গুরুর শরণাপন্ন হন। যে জ্ঞানামৃত লাভ করিলে তাঁহার প্রাণের পিপাসা পরিতৃপ্ত হইবে, যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া তিনি সেই জ্ঞানামৃত পান করিতে সমর্থ হইবেন, সেই জ্ঞানামৃতের অনুসন্ধানে যে পথে তাঁহাকে চলিতে হইবে, গুরুদেব কৃপা করিয়া তৎসম্বন্ধে তাঁহার অধিকার অনুসারে উপদেশ প্রদান করিতে থাকেন; তখন সাধক ভক্তি বিশ্বাসের সহিত গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিয়া এবং গুরুর নির্দ্দিষ্ট পথে জীবন পরিচালিত করিয়া দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধির বিশুদ্ধি সম্পাদন পূর্ব্বক, অনুকূল যুক্তি-তর্ক-বিচারের সাহায্যে,—গুরূপদিষ্ট তত্ত্ব ও সাধ্যসাধন রহস্য সম্বন্ধে সকল সন্দেহ ও ভ্রান্তি নিরাকরণ করিতে যত্নবান হন,—সদাচার, উপাসনা, গুরুসেবা, বৈরাগ্যাভ্যাস, অধ্যাত্ম-জ্ঞাননিষ্ঠা প্রভৃতি জ্ঞানলাভের অনুকূল সাধনের সহিত গুরুর শরণাপন্ন হইয়া এইরূপ শ্রবণ মননে নিরত হওয়াই জ্ঞানসাধনার দ্বিতীয় সোপান—ইহার নাম বিচারণা। বিচারণার সাধন দ্বারা গুরূপদিষ্ট বিষয় সমূহ যে পর্য্যন্ত নিজের বুদ্ধিতে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত না হয়, যে পর্য্যন্ত

সেই সব তত্ত্ব সম্বন্ধে বুদ্ধিগত সমস্ত সন্দেহ তিরোহিত না হয়, সে পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ভূমি অতিক্রম করা যায় না। বিচারণাসম্ভূত নিঃসংশয় তত্ত্বজ্ঞানকে পরোক্ষ জ্ঞান বলা হয়।

তারপর নিঃসংশয়চিত্তে ঐকান্তিকতার সহিত নিদিধ্যাসনাভ্যাস দ্বারা অন্তঃকরণ রাগদ্বেষ ও অশুভসংস্কার এবং চাঞ্চল্য হইতে মুক্ত হইয়া, সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় বস্তু সাক্ষাৎকার করিবার যোগ্যতা লাভ করে ;—এই সাধনাবস্থাই তনুমানসা নামক তৃতীয় ভূমি। তৃতীয় ভূমির সাধনে সিদ্ধিলাভ করিলেই, অর্থাৎ নিদিধ্যাসনাভ্যাস দ্বারা চিত্ত বৃত্তিরহিত হইয়া ধ্যেয়াকারে আকারিত হইবার সামর্থ্যলাভ করিলেই ধ্যেয় ব্রহ্মস্বরূপের অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার হয়, ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্যানুভূতি হয়, জগৎপ্রবাহ স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হয়। ব্রহ্ম বা আত্মাকেই এক অদ্বিতীয় সত্যবস্তু বলিয়া উপলব্ধি হয়। ইহাই চতুর্থ ভূমি এবং সত্ত্বাপত্তি নামে অভিহিত।

"অদ্বৈতে স্থৈর্য্যমায়াতে দ্বৈতে প্রশমমাগতে।
পশ্যন্তি স্বপ্নবল্লোকং চতুর্থীং ভূমিকামিতাঃ॥"

এই চতুর্থ ভূমি লাভ করিলেই যোগী ব্রহ্মবিৎ বলিয়া কথিত হন। তখনই তিনি মুক্তির আস্বাদ করেন। চতুর্থ ভূমিতে স্থিতিলাভ করিলে আর সংসারবন্ধনের ভয় নাই। আর তাঁহাকে জন্মমৃত্যুর অধীন হইতে হয় না।

কিন্তু তখনও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তিনি বিক্ষেপের হাত সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। ধ্যানাবস্থায় যে

আনন্দ তিনি অনুভব করেন, ব্যুত্থান অবস্থায় তিনি তাহা হইতে বঞ্চিত হন। আবার, সে ধ্যানাবস্থাও সকল সময় নিরাবিল থাকে না, আপনা আপনি ধ্যান ভঙ্গ হইয়া যায়। কর্ম্মজগতের সহিত যোগাযোগ থাকিলে তাহার ঘাতপ্রতিঘাতও তাঁহার অন্তঃকরণকে স্পর্শ করে। সুতরাং অন্তঃকরণ সকল অবস্থায় সমাহিত ও ব্রহ্মভাবযুক্ত না থাকিলে, জীবিতকালের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে ব্রহ্মজ্ঞানে ও ব্রহ্মানন্দে ভরপূর থাকা সম্ভব হয় না। এই হেতু চতুর্থ ভূমিতে স্থিতিলাভ করার পরও সাধনাভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান থাকে। চতুর্থ ভূমি ও পরবর্ত্তী ভূমিসমূহের মধ্যে জ্ঞানের দৃঢ়তা এবং আনন্দের গভীরতার পার্থক্যও যথেষ্ট আছে। চতুর্থ ভূমিতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় বটে, কিন্তু তাহা পরিপাকপ্রাপ্ত হয় না, সুতরাং সর্ব্বাবস্থায় স্থির থাকে না; ব্রহ্মানন্দেরও সম্ভোগ হয় বটে, কিন্তু তাহা গভীরতার চরম সীমায় পৌঁছে না। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম ভূমিকা সমূহে ক্রমশঃ জ্ঞানের অধিকতর পরিপাক ও আনন্দের পরিপূর্ণতা হইতে থাকে। সপ্তম ভূমিতে জ্ঞান ও আনন্দ চরম সীমায় পৌঁছে।

'অগম্যা বচসাং শান্তা সা সীমা যোগভূমিষু।'

—সেই অবস্থা বাক্য ও চিন্তার অতীত, এবং তাহাই যোগের চরম সীমা। চতুর্থ ভূমি হইতে পঞ্চম ভূমিতে আরোহণ করিতেই বহুদিন তীব্র অভ্যাসযোগের প্রয়োজন হয়। পঞ্চম ভূমিতে আরূঢ় যোগীকে ব্রহ্মবিদ্‌বর বলা হয়। ষষ্ঠ ও সপ্তম ভূমিতে আরূঢ় যোগী যথাক্রমে—ব্রহ্মবিদ্ বরীয়ান্ ও ব্রহ্মবিদ্ বরিষ্ঠ

বলিয়া অভিহিত হন। এসব ভূমির বিশেষ লক্ষণ জানিতে হইলে যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচ্য।

বাবা গম্ভীরনাথ জ্ঞানের প্রথম ভূমিতে আরোহণ করিয়াই গোরক্ষপুরে গুরুসন্নিধানে আসিয়াছিলেন, এবং গোরক্ষনাথ-মন্দিরে গুরুসন্নিধানে থাকিয়া অল্পকালের মধ্যেই—দ্বিতীয় ভূমিতে স্থিতিলাভ করিয়াছিলেন। তৃতীয় ভূমির নিদিধ্যাসন-অভ্যাসের উদ্দেশ্যে তিনি গোরক্ষপুর পরিত্যাগ করেন, এবং কাশীধামে ও ঝুঁসিতে কয়েক বৎসর নিত্য নিরন্তর সাধন করিয়াই তিনি তৃতীয় ভূমিতে সিদ্ধিলাভ ও চতুর্থ ভূমিতে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি চতুর্থ ভূমিতে অবস্থিত থাকিবার চেষ্টা লইয়াই নর্ম্মদা পরিক্রম ও তীর্থ পর্য্যটন করেন। তখনও তিনি ব্রহ্মবিদ্ বটেন, কিন্তু পরিপূর্ণ নহেন। তখনও ব্রহ্মবিদ্‌বর, ব্রহ্মবিদ্ বরীয়ান্ ও ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ হইতে তাঁহার বাকী ছিল। এই জন্যই গয়াতে স্থির আসনে কয়েক বৎসর তাঁহাকে তীব্র অভ্যাসযোগে নিরত থাকিতে হইয়াছিল। সম্ভবতঃ পর্য্যটনকালের অভিজ্ঞতা হইতেই এইরূপ অভ্যাসযোগের প্রয়োজনীয়তা তাঁহার বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল।

বার তের বৎসর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিয়ত জ্ঞান ও যোগের অন্তরঙ্গ সাধনের অনুশীলন দ্বারা বাবা গম্ভীরনাথ সাধনের চরম অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, মানবজীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সে অবস্থায় জ্ঞান কিরূপ হয়, আনন্দ ও প্রেম কিরূপ হয়, ইচ্ছার গতি ও শক্তি কিরূপ হয়, ঈশ্বর,

জীব ও জগতের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, লৌকিক ব্যবহার যতটুকু থাকে, তাহাই বা কিরূপ আকার প্রাপ্ত হয়,— এসব বিষয়ে অধ্যাত্মশাস্ত্র সকল নানাভাবে আভাস দিতে চেষ্টা করিয়াছেন ; কিন্তু সে অবস্থা সম্যক্‌রূপে বর্ণন করা, সাধারণের পরিচিত কোন অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া সে অবস্থাকে সাধারণ বুদ্ধির গোচর করা, অসম্ভব বলিয়াই শাস্ত্র সে অবস্থাকে 'অগম্যা বচসাং', 'অনির্ব্বচনীয়া' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। দেহ সম্বন্ধে তাঁহার ভাব কিরূপ হয়, শ্রীমদ্‌ভাগবতের একস্থলে তাহার নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়,—

দেহং চ নশ্বরমবস্থিতমুত্থিতং বা সিদ্ধো ন পশ্যতি
যতোহধ্যগমৎ স্বরূপম্।
দৈবাদুপেতমথ দৈববশাদপেতং বাসো যথা
পরিকৃতং মদিরামদান্ধঃ ॥

মাতাল মদের নেশায় ও তজ্জনিত আনন্দে বিভোর হইলে তাহার অঙ্গে বস্ত্র থাকুক বা খসিয়া পড়ুক, সে দিকে যেমন তাহার দৃষ্টিই আকৃষ্ট হয় না, সেইরূপ সিদ্ধ বা জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ আত্মস্বরূপে স্থিতিলাভ করিয়া ও আত্মানন্দে বিভোর হইয়া নশ্বর দেহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হন ; দেহ—শায়িত, উপবিষ্ট, দণ্ডায়মান বা চলনশীল অবস্থায় থাকুক, দৈববলে তাহা রক্ষিত কিংবা বিনষ্ট হউক, তিনি তাহা লক্ষ্যই করেন না। তখন তিনি

"অন্তঃশূন্যো বহিঃশূন্যঃ শূন্যকুম্ভ ইবাম্বরে।
অন্তঃপূর্ণো বহিঃপূর্ণঃ পূর্ণকুম্ভ ইবার্ণবে ॥"

সমাধি অবস্থাতে ত এক অদ্বিতীয় সর্ব্ববিধ ভেদরহিত সত্যজ্ঞানানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব বোধ থাকে না, ধ্যাতা এবং ধ্যেয়েরও কোন পার্থক্য অনুভূত হয় না ; সাধক স্বয়ং নিজেকে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়াই অনুভব করেন ; কিন্তু জীবন্মুক্তপুরুষ জাগ্রদবস্থায় কিরূপ দর্শন করেন, এবং প্রাণিজগতের সহিত তাঁহার কি প্রকার সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়, তৎসম্বন্ধে গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে,—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি ।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥

যোগযুক্তাত্মা পুরুষ আপনাকে সকলের মধ্যে ও সকলকে আপনার মধ্যে দর্শন করেন, এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী হন। সুতরাং তিনি ধ্যানাবস্থায় নিমীলিতনেত্রে যেরূপ 'ভিতর-বাহির'—বর্জ্জিত ব্রহ্মদর্শন করেন, জাগ্রদবস্থায় উন্মীলিতনেত্রেও সেইরূপ ভিতরে এবং বাহিরে ব্রহ্মদর্শন করেন ।

তিনি লোকদৃষ্টিতে দেহযুক্তভাবে পরিবর্ত্তনশীল জগতে বিচরণ করিলেও তত্ত্বজ্ঞানে জগৎ অতিক্রম করিয়া সর্ব্বদা ব্রহ্মেই অবস্থান করেন।

"ইহৈব তৈ র্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥"

যাঁহাদের মন সাম্যে স্থিতিলাভ করিয়াছে, তাঁহারা এই সংসারে বিচরণ করিয়াও সংসারকে জয় করিয়া অবস্থান করেন। সাম্য বলিতে ব্রহ্মভাবই বুঝায়, যেহেতু ব্রহ্মই সম ও নির্দ্দোষ ;

সুতরাং তাঁহারা ব্রহ্মেই অবস্থিত। যাঁহারা সর্ব্বত্র ব্রহ্মই দর্শন করেন, তাঁহাদেরই মন সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্রহ্ম সর্ব্ববিধ-দোষবর্জ্জিত। সুতরাং মন সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে জগতে কোন দোষই লক্ষিত হয় না; যাহা কিছু অনুভূত হয়, সমস্তই আনন্দময়। আনন্দই যেন বিচিত্রমূর্ত্তিতে জগদ্রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। সুতরাং সমদর্শীর দৃষ্টিতে সংসারে বৈচিত্র্য থাকিলেও কোন বৈষম্য থাকে না, সুখ দুঃখের কোনরূপ ঘাতপ্রতিঘাতও থাকে না। অতএব সমদর্শী মহাপুরুষগণ সংসারে থাকিয়াও আনন্দময় ও জ্ঞানময় ব্রহ্মেই সর্ব্বদা বিহার করেন। এই হেতু তাঁহাদিগকে ব্রহ্মবিহারী বলা হইয়া থাকে। তিনি দর্শন করেন যে,—

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম পশ্চাদ্ ব্রহ্ম দক্ষিণত শ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধং চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্॥

(মুণ্ডকোপনিষৎ)

'অমৃতস্বরূপ এই ব্রহ্মই সম্মুখে, ব্রহ্মই পশ্চাতে, ব্রহ্মই দক্ষিণে, ব্রহ্মই উত্তরে, ব্রহ্মই ঊর্দ্ধে, ব্রহ্মই নিম্নে; বরেণ্যতম এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই এই বিশ্বরূপে আত্মবিস্তার করিয়া বিরাজমান।'

'অহমেবাধস্তাদহমুপরিষ্টাদ্ অহং পশ্চাদ্ অহং পুরস্তাদ্ অহং দক্ষিণতোঽহ মুত্তরতঃ অহমেদং সর্ব্বমিতি। ......স বা এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্ আত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড্ ভবতি তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।' (ছান্দোগ্যোপনিষৎ)।

'আমিই নিম্নে, আমিই ঊর্দ্ধে, আমিই পশ্চাতে, আমিই

সম্মুখে, আমিই দক্ষিণে, আমিই উত্তরে, আমিই এই সব।... তিনি এইরূপ দর্শন করিয়া, এইরূপ মনন করিয়া, এইরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া, আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ ও স্বরাট্ হন; সকল লোকে তাঁহার স্বেচ্ছানুরূপ অব্যাহত আচরণ হইয়া থাকে (অর্থাৎ তাঁহার ঈশ্বরত্ব লাভ হয়)।

তিনি দেহধারী হইয়াও দেহাভিমানের সম্পূর্ণ অভাব বশতঃ দেহসম্পর্কশূন্য হইয়াই বিরাজিত থাকেন, তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় কিছুই থাকে না। 'অশরীরং বাবসন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ'—অশরীর (শরীরাভিমান শূন্য) হইয়া বিরাজিত থাকেন বলিয়া প্রিয়ভাব বা অপ্রিয়ভাব তাঁহাকে স্পর্শ করে না— (ছান্দোগ্যোপনিষৎ)। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

'ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসম্মূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥'

ব্রহ্মবিদ্ প্রিয়লাভে হর্ষযুক্ত হন না, অপ্রিয় সংযোগেও উদ্বেগপ্রাপ্ত হন না; তিনি স্থিরবুদ্ধি ও অসংমূঢ় হইয়া ব্রহ্মেই অবস্থান করেন।

যে মুক্তপুরুষ কেবলমাত্র জ্ঞানেই সর্ব্বত্র ব্রহ্মাত্মভাব অনুভব করিয়া সমদর্শী ও নির্ব্বিকার হইয়াছেন তাঁহারও জীবনে সম্পূর্ণতার কিঞ্চিৎ অভাব আছে বলিতে হয়; মানুষের জাগতিক জীবন যতদূর পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে, তাহা তিনি লাভ করিয়াছেন বলা যায় না। তিনি তত্ত্বজ্ঞানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, পরম সত্যের অপরোক্ষ অনুভূতি দ্বারা নিজে সকল

জ্বালা হইতে চিরমুক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার প্রাপ্তব্য, ত্যক্তব্য, কর্ত্তব্য বা জ্ঞাতব্য আর কিছুই নাই, তিনি নিজে পরমানন্দময় হইয়া গিয়াছেন, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই বটে। কিন্তু কোন কোন শাস্ত্রের ও মহাপুরুষের সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্মতত্ত্বে মনবুদ্ধি বিলীন করিয়া রাখিলেই এবং তত্ত্বনিষ্ঠ বুদ্ধিতে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' জানিলেই জীবনের চরম সার্থকতা লাভ হইল না। গীতায় এই মতই ব্যক্ত হইয়াছে এবং ইহা নির্দ্দেশ করিবার জন্যই শ্রীভগবান্ গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগব্যাখ্যান্তে যুক্তযোগীর অন্যান্য সকল লক্ষণ বর্ণনা করিয়া সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন,—

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥

—যে যোগী বিশ্বের সকল প্রাণীর সুখদুঃখ নিজের বলিয়া অনুভব করিয়া সকলকে নিজের সহিত সমান দর্শন করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠতম যোগী, ইহাই আমার স্থিরসিদ্ধান্ত।

শ্রীভগবান্ দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন যে, শ্রেষ্ঠতম যোগী কেবলমাত্র ব্রহ্মবুদ্ধিতেই সর্ব্বত্র সমদর্শী হন না, তিনি কেবলমাত্র সকল জীবের পারমার্থিক ঐক্য দর্শন করিয়া ব্যবহারবর্জ্জিত ও সমাধিস্থ হইয়া অবস্থান করাই মানবজীবনের চরম সার্থকতা মনে করেন না, ব্যবহারিক ভাবেও তিনি সমদর্শী হন, সকল জীবের ব্যবহারিক সুখদুঃখ নিজের হৃদয়ে অনুভব করিয়া তিনি সকলের সহিত সমপ্রাণ হন। বিশ্বপ্রাণের সহিত তাঁহার প্রাণের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, বিশ্বপ্রাণের প্রত্যেক স্পন্দন যেন তিনি নিজের

প্রাণে অনুভব করেন। একই বিশ্বপ্রাণের বিচিত্র রকম স্পন্দন বিভিন্ন জীবের প্রাণে সুখদুঃখাদিরূপে স্পন্দিত হইতেছে, বিভিন্ন জীবের প্রাণে অনুভূত সুখদুঃখ একই প্রাণসমুদ্রের বিভিন্ন তরঙ্গভঙ্গী মাত্র। যিনি বিশ্বপ্রাণকেই নিজের প্রাণ বলিয়া অনুভব করেন, তাঁহার ব্যক্তিগত কোন সুখদুঃখ থাকে না, তিনি নিজের জন্য কোন বিষয় লাভ করিতে বা কোন বিষয় ত্যাগ করিতে সমুৎসুক হন না; কিন্তু সকল জীবের সুখদুঃখই তাঁহার সুখদুঃখ, সকল জীবের সুখদুঃখ ভোগের মধ্য দিয়াই যেন তাঁহার ভোগ হইতেছে। সেই হেতু নিজের কোন আকাঙ্ক্ষা না থাকিলেও পরের কল্যাণের জন্য তিনি উৎসুক হন, পরের সুখে সুখী ও পরের দুঃখে দুঃখী হন। তাঁহার শত্রুমিত্র নাই, আত্মীয় অনাত্মীয় নাই, দূর নিকট নাই, সকলেই তাঁহার দৃষ্টিতে সমান, এবং সকলেরই সুখদুঃখ তিনি নিজের বলিয়া অনুভব করেন, এবং সর্ব্বভূত হিতেরত হইয়া সকলেরই কল্যাণের জন্য যত্নবান্ হন। তিনি প্রেমে ভরপূর হইয়া থাকেন, তাঁহার অহৈতুকী ভালবাসা বিশ্বব্যাপী হয়। ভগবান্ বশিষ্ঠও রামচন্দ্রকে জীবনে সেই আদর্শ প্রতিফলিত করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন,—

'মানসীর্ব্বাসনাঃ পূর্ব্বং ত্যক্ত্বা বিষয় বাসনাঃ।
মৈত্র্যাদি বাসনা রাম গৃহাণামলবাসনাঃ॥'

হে রাম! বাহ্য ও আন্তর সকল বিষয়ের বাসনা—ঐহিক ও পারলৌকিক, স্থূল ও সূক্ষ্ম, সকল প্রকার ভোগের বাসনা,—লোক-

বাসনা, শাস্ত্র বাসনা ও দেহ বাসনা,—অহংকার বলদর্পাদি আসুর-সম্পদরূপ বাসনা—ইত্যাদি সর্ব্ববিধ অবিদ্যামূলক বাসনা সম্পূর্ণ-রূপে বর্জ্জন করিয়া মৈত্রী প্রভৃতি নির্ম্মল বাসনা গ্রহণ কর।

শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহে সম্যক্‌সিদ্ধ ও পরিপূর্ণ মানবত্বে প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষের এই সকল লক্ষণ বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত থাকিলেও কোন মহাপুরুষ এইরূপ পূর্ণ জ্ঞানে, পূর্ণ আনন্দে ও পূর্ণ প্রেমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন কিনা, তাহা সাধারণ বুদ্ধিতে নির্দ্ধারণ করা সম্পূর্ণই অসম্ভব। তাঁহার বাহিরের আচরণ দেখিয়া, হাবভাব লক্ষ্য করিয়া এবং কথাবার্ত্তা শুনিয়া শাস্ত্রদৃষ্টিতে চিন্তা করিলে সূক্ষ্মবুদ্ধি ব্যক্তি কতকটা ধারণা করিতে পারেন বটে, কিন্তু সে ধারণা যে সম্যক্‌রূপে সত্যই হইবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। জ্ঞান ও আনন্দ স্বসম্বেদ্য—কাহারও হৃদয়াভ্যন্তরস্থিত জ্ঞান ও আনন্দ অপর কেহ বুদ্ধিবিচার দ্বারা নিশ্চয় রূপে বুঝিতে সক্ষম হন না। তবে তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণ নিজ নিজ আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও অনুভবের সাহায্যে পরস্পরের জ্ঞান ও আনন্দের পরিমাণ ও গভীরতা কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন এবং পরস্পরের আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেকটা দৃঢ়তার সহিত সাক্ষ্য দান করিবার অধিকারী হন। প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ মহাপুরুষগণ যদি বাবা গম্ভীরনাথের আধ্যাত্মিক অবস্থার পরিচয় লোকসমাজে প্রচার না করিতেন, তাঁহারা যদি তাঁহাকে জ্ঞানে, প্রেমে, শক্তিতে ও আনন্দে চরম উৎকর্ষে উপনীত বলিয়া স্থাপন না করিতেন, তবে আমাদের পক্ষে দৃঢ় নিশ্চয়তার

সহিত ইহা বলা সম্ভব হইতনা যে, তিনি মানবজীবনের পরিপূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত (অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ) হইয়াছিলেন। কোন বিশিষ্টমহাপুরুষের আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্বন্ধে সাধারণ-বুদ্ধিবিশিষ্ট মনুষ্যের নিকট তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষগণই প্রকৃষ্ট প্রমাণ—তাঁহাদের বাক্যই আপ্তবাক্য।

অনেক মহাপুরুষ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ভাষায় বাবা গম্ভীর-নাথকে সম্যক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। বাবাজী যখন গয়ায় সাধনে নিরত, সেই সময়ে গোস্বামী মহাশয় তাঁহার অনেক শিষ্যের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন—"বাবা বড় প্রেমিক, এবং খুব শক্তিসম্পন্ন মহাত্মা; হিমালয়ের নীচে এরূপ আর দেখা যায় না। পাহাড়ে কত বাঘ, সাপ, হিংস্র জন্তু রহিয়াছে; বাবার শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া কেহই ইঁহার অনিষ্ট করে না।"* গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী বলিয়াছেন,—"বাবা গম্ভীরনাথজীর সম্বন্ধে গোঁসাই বলিয়াছিলেন 'হিমালয়ের নীচে আর এখন এরূপ শক্তিশালী মহাপুরুষ নাই। ইনি ঐশ্বর্য্যভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়া এখন মাধুর্য্যে ডুবিয়া গিয়াছেন। ইনি পলকে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় করিতে সমর্থ।" গোস্বামী মহাশয়ের অন্যতম শিষ্য শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহ ঠাকুরতা বলিয়াছেন—"ঠাকুর যখন সুকিয়া ষ্ট্রীটে রাখাল বাবুর বাড়ীতে ছিলেন, তখন একদিন বলিয়াছিলেন,—'অভিমন্যু—অভিমান। সপ্তরথী তাহাকে নষ্ট করেন। আমি প্রতিদিন এই সাতজনকে স্মরণ করি এবং তাঁহারা দয়া করিয়া প্রকাশিত

হন। (১) গয়ার নাগাজি (বাবা গম্ভীরনাথ), (২) অযোধ্যার মাধোদাস, (৩) নবদ্বীপের চৈতন্যদাস বাবাজী, (৪) ত্রৈলঙ্গ স্বামী, (৫) মেছুয়া বাজারের সন্ন্যাসী, (৬) দার্জ্জিলিঙের লামা সন্ন্যাসী (৭) পরমহংসজি (মানস সরোবরের) *। প্রথিতনামা মহাপুরুষ স্বামী সচ্চিদানন্দ বলিয়াছেন,—'উন্ হি ত সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর হ্যাঁয়।' এবং তিনি একবার একটি যুবককে বাবা গম্ভীরনাথের শিষ্য জানিয়া তাহাকে দৃঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে 'তুম্ ত আসল পাকড়্ লিয়া'। ব্রজ বিদেহী মহাপুরুষ রামদাস কাঠিয়াবাবা তাঁহাকে 'নিত্য যুক্ত যোগী' বলিয়া কীর্ত্তন করিতেন। বহু শিক্ষিত বাঙ্গালীর গুরু মহাত্মা ভোলানন্দ গিরি তাঁহাকে নিরতিশয় ভক্তি করেন, এবং অনেক সময় তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক প্রামাণিক মহাপুরুষ নানা ভাবে নানা বাক্যে ও ব্যবহারে বাবা গম্ভীরনাথের অলোকসামান্য জ্ঞান, প্রেম ও শক্তির কথা লোকসমাজে ঘোষণা করিয়াছেন ও করিতেছেন।

কিন্তু এই সব আপ্ত বাক্য স্বীকার করিয়া লইলেও আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধি যতটুকু যায়, তৎটুকু বিচারশক্তি প্রয়োগ করিয়া আলোচ্য জীবনটিকে সাধ্যানুসারে আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিবার জন্য প্রযত্নশীল হওয়া আমাদের পক্ষে অসঙ্গত নহে। যুক্ত যোগীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা আমরা পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি না বটে, উপনিষৎ, গীতা, যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি

---

* মহাত্মা বাবা গম্ভীরনাথ পৃষ্ঠা ৫, ৯, ৩১।

এ

প্রামাণিক শাস্ত্রে সম্যক্ সিদ্ধ মহাত্মার জ্ঞান, প্রেম ও শক্তির কথা যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কিনা, তৎ সম্বন্ধে আপ্তবাক্য স্বীকার করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই বটে; কিন্তু শ্রেষ্ঠতম জীবন্মুক্তের বাহ্যলক্ষণ—তাঁহার বৃত্তি, হাবভাব আচার ব্যবহার প্রভৃতি—সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণনা ঐ সব শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বাহ্যিক পর্য্যবেক্ষণ দ্বারাও কতকটা আমরা মিলাইয়া দেখিতে পারি। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে মহাপুরুষ কখন কি উদ্দেশ্যে কি করেন, কোন্ কথা কিভাবে বলেন, কি উদ্দেশ্যে কোন্ উপদেশ দেন, তাহাও আমরা অনেক সময় বুঝিতে পারি না; তাঁহার অধিকাংশ কার্য্যকলাপ দর্শনের সৌভাগ্যও আমাদের হয় না; অল্প কিছু দেখিয়াই একটা সিদ্ধান্ত করাও নিতান্ত অর্ব্বাচীনতার পরিচায়ক। আবার জীবন্মুক্তের বাহ্যলক্ষণ যেরূপ হয়, তাহার সহিত কোন ব্যক্তির বাহ্য লক্ষণ অনেকটা মিলিলেই যে জীবন্মুক্ত বলিয়া নিশ্চয় জানা যায়, তাহাও নয়। তথাপি শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে যথাসম্ভব বিচার-শক্তি ও পর্য্যবেক্ষণ শক্তির প্রয়োগ করা আমাদের কর্ত্তব্য। তদ্দ্বারা আমাদের চিত্ত বিশুদ্ধ হইবে, বিচারশক্তির স্ফুরণ হইবে এবং ক্রমশঃ মহাপুরুষের অন্তর্জীবনও আমাদের নিকট প্রকাশিত হইবে। সুতরাং আপ্তবাক্য স্বীকার করিয়া লইয়া সেই দৃষ্টিতে জীবন্মুক্তের লক্ষণ পর্য্যবেক্ষণে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের পক্ষে সঙ্গত।

মহোপনিষদে জীবন্মুক্তের লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

মৌনবান্ নিরহংভাবো নির্মানো মুক্তমৎসরঃ।
যঃ করোতি গতোদ্বেগঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥
সর্ব্বত্র বিগতস্নেহো যঃ সাক্ষিবদবস্থিতঃ।
নিরিচ্ছো বর্ত্ততে কার্যে স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥
যেন ধর্ম্মমধর্ম্মং চ মনোমননমীহিতম্।
সর্ব্বমন্তঃ পরিত্যক্তং স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥
আপতৎসু যথাকালং সুখদুঃখেম্বনারতঃ।
ন হৃষ্যতি গ্লায়তি যঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥
হর্ষামর্ষভয়ক্রোধকামকার্পণ্য দৃষ্টিভিঃ।
ন পরামৃশ্যতে যোঽন্তঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥
ঈপ্সিতানীপ্সিতে ন স্তো যস্যান্তর্ব্বর্ত্তিদৃষ্টিষু।
সুষুপ্তবদ্ য শ্চরতি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥
অধ্যাত্মরতিরাসীনঃ পূর্ণঃ পাবন মানসঃ।
প্রাপ্তানুত্তমবিশ্রান্তির্ন কিঞ্চিদিহ বাঞ্ছতি।
যো জীবতি গতস্নেহঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥
রাগদ্বেষৌ সুখং দুঃখং ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ফলাফলে।
যঃ করোত্য নপেক্ষ্যৈব স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥
কট্বম্ল লবণং তিক্ত মমৃষ্টং মৃষ্টমেব চ।
সমমেব চ যো ভুঙ্‌ক্তে স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥
জরামরণমাপচ্চ রাজ্যং দারিদ্র্যমেব চ।
রম্যমিত্যেব যো ভুঙ্‌ক্তে স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥

উদ্বেগানন্দরহিতঃ সময়া স্বচ্ছয়া ধিয়া ।
ন শোচতি ন চোদেতি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥
জন্মস্থিতিবিনাশেষু সোদয়াস্তময়েষু চ ।
সমমেব মনো যস্য স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥
ন কিঞ্চন দ্বেষ্টি তথা ন কিঞ্চিদপি কাঙ্ক্ষতি ।
ভুঙ্‌ক্তে যঃ প্রকৃতান্ ভোগান্ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥
শান্তসংসার কলনঃ কলাবানপি নিষ্কলঃ ।
যঃ সচিত্তোঽপি নিশ্চিত্তঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥
যঃ সমস্তার্থজালেষু ব্যবহার্য্যপি নিস্পৃহঃ ।
পরার্থেম্বিব পূর্ণাত্মা স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ইত্যাদি

যিনি মৌনবান্, অহংভাববর্জ্জিত, অভিমান শূন্য ও মাৎসর্য্যবিহীন এবং যিনি উদ্বেগরহিত হইয়া অবস্থান করেন, তিনি জীবন্মুক্ত। যিনি সর্ব্বত্র মমতাশূন্য হইয়া সাক্ষীর ন্যায় অবস্থান করেন, এবং নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া উপস্থিত কার্য্য সম্পাদন করেন, তিনি জীবন্মুক্ত। সকল ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, সঙ্কল্প, চিন্তা ও চেষ্টা যাঁহার চিত্ত হইতে বিদায় লইয়াছে, তিনি জীবন্মুক্ত। যদৃচ্ছাক্রমে যে কোন সময়ে যে কোন সুখ বা দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলে যিনি উদাসীন ভাবে তাহা গ্রহণ করেন, হৃষ্টও হন না বিষণ্ণও হন না, যাঁহার চিত্ত হর্ষ বিষাদ ভয় কাম ক্রোধ বা দৈন্য দ্বারা কখনও সংস্পৃষ্ট হয় না, যাঁহার ঈপ্সিত বা অনীপ্সিত কিছুই নাই, যাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদাই অন্তর্মুখীন, যিনি ব্যবহার ক্ষেত্রে সুষুপ্তের মত আচরণ করেন, তিনি জীবন্মুক্ত। যিনি সর্ব্বদা আত্মরতি

হইয়া অবস্থান করেন, যিনি পূর্ণ, যাঁহার ইচ্ছা কল্যাণময়ী, অনুত্তম আনন্দ স্বরূপে বিশ্রাম লাভ করায় যাঁহার আকাঙ্ক্ষণীয় কিছুই নাই, যিনি দেহাদি সর্ব্ববিষয়ে বিগতস্নেহ হইয়া জীবন ধারণ করিয়া আছেন তিনি জীবন্মুক্ত। ব্যবহারিক জগতে কিছুরই অপেক্ষা না করিয়া কেবলমাত্র লোক শিক্ষার জন্য যিনি প্রয়োজনানুসারে কখন কখন রাগদ্বেষ, সুখদুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও ফলাফলের সহিত সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তিনি জীবন্মুক্ত। কটু, তিক্ত, মিষ্ট প্রভৃতি বিভিন্ন রস এবং জরা, মৃত্যু, বিপদ্, সম্পদ্, দারিদ্র্য প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থা যিনি সমানভাবে রম্য বলিয়াই ভোগ করেন, যাঁহার সাম্যাবস্থিত স্বচ্ছ অন্তঃকরণে উদ্বেগ নাই, আনন্দ নাই, শোক নাই, ঔৎফুল্ল্য নাই, জন্ম, স্থিতি ও বিনাশে যাঁহার মানসিক অবস্থার কোন বিকার হয় না, যাঁহার হেয় বা উপাদেয় কিছুই নাই, যাহা যখন আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাই যাঁহার উপভোগ্য, সেই মহাপুরুষই জীবন্মুক্ত। যাঁহার নিকট সংসার প্রবাহ থাকিতেও নাই, যিনি কলাবান্ হইয়াও নিষ্কল, সচিন্ত হইয়াও নিশ্চিন্ত, নানা বিষয়ের অধিকারী হইলেও যাঁহার কিছুই নাই, নানা বিষয় লইয়া ব্যবহার করিলেও যিনি নিস্পৃহ ও নিঃসঙ্গ বলিয়া বস্তুতঃ ব্যবহার বর্জ্জিত, সেই পরিপূর্ণাত্মা মহাপুরুষই জীবন্মুক্ত। ইত্যাদি।

শ্রীভগবান্ গীতার—দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে, ষষ্ঠাধ্যায়ে যুক্তযোগীর লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে, দ্বাদশাধ্যায়ে প্রিয়তম ভক্তের লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে, চতুর্দ্দশাধ্যায়ে

গুণাতীতের লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে এবং অন্যান্য বহুস্থলে জীবন্মুক্তের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও বাহ্যাবস্থার বিস্তৃত বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন।

যাঁহারা বাবা গম্ভীরনাথের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহারা অল্প সময়ের জন্যও তাঁহার বৃত্তি লক্ষ্য করিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা একটু মনোযোগের সহিত তাঁহার হাব ভাব, চলন, উপবেশন, বাক্যালাপ ও কার্য্যকলাপ এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়ের দৃষ্টি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিয়াছেন যে এই সব লক্ষণ যেন জীবন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বাবা গম্ভীরনাথরূপে তাঁহাদের নয়নের সম্মুখে সমুপস্থিত। পূর্ব্বোল্লিখিত প্রত্যেকটি লক্ষণ অতি পরিস্ফুট রূপে বাবা গম্ভীরনাথের জীবনে অভিব্যক্ত দেখিতে পাওয়া যাইত। তিনি একাকী থাকিতেন বা বহুলোকপরিবৃত থাকিতেন, নির্জ্জন পর্ব্বতে বা বনে থাকিতেন অথবা কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে থাকিতেন, তাঁহার সমীপবর্ত্তী জনসঙ্ঘ ভক্তিযুক্ত চিত্তে তাঁহার উপদেশের প্রতীক্ষায় থাকিত, অথবা হিংসা দ্বেষ যুক্ত চিত্তে পরস্পরের সহিত বিবাদ বিসংবাদে নিযুক্ত থাকিত, তিনি সুস্থদেহে সেবক বেষ্টিত হইয়া ভোগসম্পৎ-পরিপূর্ণ স্থানে অবস্থান করিতেন কিংবা ব্যাধিজর্জ্জরিত দেহে সেবকবিহীন হইয়া হিংস্রজন্তু পরিপূর্ণ স্থানে অবস্থান করিতেন, তাঁহাকে যখন যেখানে যে অবস্থাতেই দেখা যাইত না কেন, কোন অবস্থাতেই তাঁহার সৌম্যপ্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তির কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইত না, কোন অবস্থাতেই তাঁহার নিশ্চিন্ত প্রসন্ন আত্মসমাহিত ভাবের কোনরূপ বিকার লক্ষিত হইত না, কোন

শ্রীশ্রীযোগিরাজ গম্ভীর নাথজী

অবস্থাতেই বাহ্যিক ব্যাপারের কোন দাগ তাঁহার চিত্তে লাগিতেছে বলিয়া মনে করা যাইত না। সর্ববাবস্থাতেই তিনি যেন কোন ঊৰ্দ্ধতন লোকে অবস্থান করিতেন, যেখানে নিরানন্দের লেশ নাই ভয় ভাবনার প্রবেশাধিকার নাই, চাঞ্চল্যের অবসর নাই। যে সব বিষয় ও ব্যাপার সাধারণ লোকের নিকট অত্যন্ত বাস্তব তাহাই যেন তাঁহার সজাগ দৃষ্টির সম্মুখে স্বপ্নের মত ভাসিতেছে বলিয়া বোধ হইত। তাঁহার ভাব দেখিয়া স্বভাবতঃই মনে হইত যে তিনি এমন কিছু লাভ করিয়াছেন,—

'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥'

তাঁহার মূর্ত্তি কিয়ৎকাল নিরীক্ষণ করিলেই ধারণা হইত যে তিনি যেন নিজের মহিমায় পরিপূর্ণ স্বরূপে সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অন্তরে বাহিরে পরিপূর্ণতারই বিকাশ দর্শন করিতেছেন।

একদিকে যেমন তিনি ঔদাসীন্যের ও প্রশান্ততার চরম সীমায় বিরাজ করিতেন, অন্যদিকে তেমনি তিনি প্রেমের অবতার ছিলেন। একদিকে তিনি যেমন অহংভাব পরিশূন্য ছিলেন অন্যদিকে তিনি সর্ব্বব্যাপক 'অহং' নিয়া বিরাজমান থাকিতেন। মহোপনিষদে ত্রিবিধ অহংকারের উল্লেখ আছে।

'অহং সর্ব্বমিদং বিশ্বং পরমাত্মাহমচ্যুতঃ।
নান্যদস্তীতি সংবিত্ত্যা পরমা সা হ্যহংকৃতিঃ॥
সর্ব্বস্মাদ্ ব্যতিরিক্তোঽহং বালাগ্রাদপ্যহং তনুঃ।
ইতি যাঃ সংবিদো ব্রহ্মন্ দ্বিতীয়াহংকৃতিঃ শুভা॥

পাণিপাদাদিমাত্রোঽহম্ মহমিত্যেষ নিশ্চয়ঃ।
অহংকার স্তৃতীয়োঽসৌ লৌকিকস্তুচ্ছ এব সঃ॥'

'এই সমগ্র বিশ্বই আমি, আমি সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী পরমাত্মা, আমি ভিন্ন আর কিছুই নাই,—এইরূপ অহংজ্ঞানই শ্রেষ্ঠতম অহংকার। আমি সকল পদার্থ হইতে ব্যতিরিক্ত এবং কেশাগ্র হইতেও সূক্ষ্ম,—এইরূপ অহংকার মধ্যম। হস্তপদাদিযুক্ত দেহই আমি,—এইরূপ লৌকিক ও তুচ্ছ অহংকার নিকৃষ্ট।'

বাবা গম্ভীরনাথ লৌকিক অহংকার হইতে বহুদিন পূর্ব্বেই মুক্ত হইয়াছিলেন। 'নেতি নেতি'-বিচাররূপ ব্যতিরেকী সাধনা ও নিদিধ্যাসন-অভ্যাস দ্বারা তিনি সর্ব্বাতিরিক্ত চিৎস্বরূপ 'অহং' এর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। তৎপর অন্বয়ী সাধনা দ্বারা তিনি সর্ব্বাত্মভাবরূপ পরমা অহংকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবপ্রেম—সর্ব্বজীবহিতে রতি—এই পরমা অহংকৃতিরই বিকাশরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। তাঁহার প্রেমের অচিন্ত্যপ্রভাবে ব্যাঘ্রসর্পাদি হিংস্রজন্তুও জিঘাংসাবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার সন্নিধানে বাস করিত। তিনি সকল প্রাণীকে অভয়প্রদান করিয়াই নিজে নির্ভয় হইয়াছিলেন। তিনি কোন প্রাণীকেই উদ্বেগ প্রদান করিতেন না, তাঁহাকেও কেহ উদ্বেগ প্রদান করিতে পারিত না। তিনি যে পরবর্ত্তী জীবনে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং বহু নরনারীকে দীক্ষা প্রদান পূর্ব্বক তাহাদের তাপিত প্রাণ শীতল করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার প্রেমময় স্বভাবেরই অভিব্যক্তি।

সম্যক্ সিদ্ধি ও ঈশ্বরত্ব

বাবা গম্ভীরনাথের নিত্যনির্ব্বিকার আত্মসমাহিত ভাব, সর্ব্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধি ও সর্ব্বজীবে প্রেমের সহিত তাঁহার পূর্ণ-যোগৈশ্বর্য্যও লাভ হইয়াছিল বলিয়া সাধুগণ বিশ্বাস করেন। তিনি বেদান্ত-শাস্ত্রবিহিত জ্ঞান সাধনার সহিত যোগশাস্ত্রবিহিত রাজযোগ এবং হঠযোগেরও অভ্যাস করিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই। নিজেও কখন কখন কথাপ্রসঙ্গে ইহার ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে, হঠযোগের ভিতরেই রাজযোগ ও জ্ঞানযোগে সম্যক্ সিদ্ধিলাভ করিবার উপযোগী অতি নিগূঢ় সাধন-রহস্য বিদ্যমান আছে; কিন্তু সেই সাধনার অধিকারী অতি বিরল দৃষ্ট হয়। তিনি নিজের সম্বন্ধে স্পষ্টরূপে অবশ্য কখন কোন কথাই বলেন নাই। কিন্তু কোন কোন তত্ত্বদর্শী মহাত্মা এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, বাবা গম্ভীরনাথ যোগসাধনায় সম্যক্ সিদ্ধিলাভ করিয়া অণিমাদি যোগৈশ্বর্য্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, এবং কোন কোন মহাত্মা তাঁহাকে সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর বলিয়াও কীর্ত্তন করিয়াছেন।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহার শিষ্যদের নিকট বলিতেন যে, 'বাবা গম্ভীরনাথ পলকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতে সমর্থ।'

এই মন্তব্যের তাৎপর্য্য অবশ্য এই যে, তিনি যোগৈশ্বর্য্যের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এ বিষয়েরও কোনরূপ সাক্ষ্যপ্রদান করিবার অধিকার আমাদের মত স্থূলদর্শী জীবদের নাই ও থাকিতে পারে না, এবং সম্যক্‌-সিদ্ধ মহাযোগিগণও সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ক্ষমতা বা ঈশ্বরত্ব লাভ করেন কিনা, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ অসম্ভব, কারণ কোনও যুগে কোন মহাপুরুষ এরূপ ক্ষমতার পরিচয় কার্য্যতঃ প্রদর্শন করেন নাই। এরূপ ঈশ্বরত্বের পরিচয় স্থূলদর্শীদের দৃষ্টির সমীপে কার্য্যতঃ উপস্থিত করা যে অসম্ভব, কেবল সাধনসিদ্ধ যোগৈশ্বর্য্যসম্পন্ন জীব কেন, স্বয়ং নিত্যসিদ্ধ পরমেশ্বর অবতীর্ণ হইয়াও যে এরূপ পরিচয় উপস্থিত করিতে পারেন না, ইহা বিচারশীল ব্যক্তিগণ একটু বিচার করিলেই বুঝিতে পারেন। সুতরাং জ্ঞান ও যোগের পরাকাষ্ঠার উপনীত জীব ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত হন কিনা, এবং হইলেই বা কি ভাবে হন, তাহা শাস্ত্রদৃষ্টিতে ও দার্শনিক বিচারেই হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক।

এ বিষয়ে শাস্ত্রব্যাখ্যাতা আচার্য্যদিগের মধ্যেও আপাত-দৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ মতভেদ দৃষ্ট হয়। কোন কোন আচার্য্যের অভিমত এই যে, সম্যক্‌ সিদ্ধ মহাপুরুষের সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ও অণিমা-লঘিমাদি ঐশ্বর্য্য অধিগত হইতে পারে বটে, কিন্তু জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারিণী শক্তি একমাত্র নিত্যসিদ্ধ পরমেশ্বরেই নিত্য বিদ্যমান, তাহা কোন জীবের হইতে পারে

না। জীব জ্ঞানে মায়াতীত হইতে পারেন, কিন্তু শক্তিতে মায়াধীশ হইতে পারেন না। এই একমাত্র বিষয়েই মুক্ত জীব ও পরমেশ্বরের পার্থক্য থাকে।

ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে 'জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্' সূত্রে—(৪।৪।১৭) মহর্ষি বেদব্যাস এই মত প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া ভাষ্যকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আচার্য্য প্রবর শঙ্কর এই সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন, "জগদুৎপত্ত্যাদি ব্যাপারং বর্জ্জয়িত্বা অন্যদণিমাদ্যাত্মকং ঐশ্বর্য্যং মুক্তানাং ভবিতুমর্হতি, জগদ্ব্যাপারস্তু নিত্যসিদ্ধস্যৈব ঈশ্বরস্য।"—জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় ব্যতীত অন্য সকল অণিমাদি ঐশ্বর্য্য মুক্তপুরুষদের হইয়া থাকে, জগদ্ব্যাপারের ক্ষমতা একমাত্র নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরেরই আছে। তাঁহার যুক্তি সংক্ষেপতঃ এইরূপ। শ্রুতিতে অনাদিসিদ্ধ ঈশ্বরই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা জগৎকারণ বলিয়া পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছেন। ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা তাঁহার সমান কেহই হইতে পারে না, এবং তাঁহার সঙ্কল্প অনুসারেই জগদ্ব্যাপার চিরকাল সুশৃঙ্খল ভাবে নির্ব্বাহিত হইয়া আসিতেছে। কোন যোগসিদ্ধ মুক্তপুরুষ তাঁহার সমান যোগৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া তাঁহার সমকক্ষ হইলে, তিনি ঈশ্বর-সঙ্কল্পের প্রতিকূলে আপনার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া জগদ্-ব্যাপার ওলট্পালট্ করিবারও চেষ্টা করিতে পারেন, এবং সমান শক্তিসম্পন্ন দুই বা ততোধিক ইচ্ছার সংঘর্ষে জগদ্ব্যাপার বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িবার কথা। যোগশক্তিধর মহাপুরুষগণও

এক এক জন এক এক প্রকার ইচ্ছা করিয়া এবং পরস্পারের বিরুদ্ধে নিজ নিজ শক্তি প্রয়োগ করিয়া জগতে ভীষণ সংঘর্ষ ও বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করিতে পারেন। একজন হয়ত ইচ্ছা করিবেন যে, জগৎ যেমন চলিতেছে তেমনি চলুক, অন্য একজন হয়ত ইচ্ছা করিবেন যে, এখন প্রলয় আরম্ভ হউক, আবার তৃতীয় একজন হয়ত ইচ্ছা করিবেন যে, এখনই জগৎকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করা হউক। তখন জগদ্‌ব্যাপার কিরূপ হইবে, তাহা অভাবনীয়। অনাদিকাল হইতে জগদ্‌ব্যাপার যে একই নিয়মে সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ব্যাপারের চিরন্তন বিধান যে কখনও উল্লঙ্ঘিত হইতেছে না, ইহাতেই প্রতিপন্ন হয় যে, তাহা একই ইচ্ছার অধীন, একই বিশ্ববিধাতার ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত, তাহার উপর হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা আর কাহারও হয় না। সুতরাং যোগসিদ্ধ মহাপুরুষগণ যত ঐশ্বর্য্যই লাভ করুন না কেন, তাঁহারা ঈশ্বরেচ্ছার অধীনই থাকেন, ঈশ্বরেচ্ছার অধীন থাকিয়াই তাঁহারা নিজেদের যোগলব্ধ ঐশ্বর্য্যের ব্যবহার ও সম্ভোগ করিতে পারেন, তাঁহারা তত্ত্বদৃষ্টিতে ঈশ্বরেচ্ছা বুঝিয়া তদনুকূলে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করেন বলিয়াই তাঁহাদের ইচ্ছা অব্যাহত হয় এবং সেই হেতুই ইচ্ছার বিফলতা জনিত দুঃখ কখনও তাঁহারা অনুভব করেন না। অতএব এই মতে মুক্তজীবও শক্তি হিসাবে ঈশ্বরের তুলনায় ক্ষুদ্র। জীবন্মুক্ত পুরুষ তত্ত্বজ্ঞানে ও পরমানন্দসম্ভোগে ঈশ্বরের সমান হইতে

পারেন এবং পরমার্থ দৃষ্টিতে ঈশ্বর ও জগৎ হইতে বিভিন্ন হইয়া মায়াতীত আনন্দময় রাজ্যে বিরাজ করেন বটে, কিন্তু তিনি শক্তিতে ঈশ্বরের সমান হইতে পারেন না, জগদ্‌ব্যাপারের উপর আধিপত্য করিতে পারেন না।

যোগশাস্ত্রের মতে যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ সর্ব্বশক্তিমত্তা বা ঈশ্বরত্বও লাভ করিতে পারেন, তখন সমস্ত ভূতপ্রকৃতি তাঁহার বশীভূত হয় এবং তিনি জগদ্‌ব্যাপারের উপর আধিপত্য লাভ করেন। যোগসূত্রে বিভূতিপাদের ৪৪ সূত্রের ভাষ্যে ব্যাসদেব লিখিয়াছেন, "পঞ্চভূতস্বরূপাণি জিত্বা ভূতজয়ী ভবতি, তজ্জয়াদ্ বৎসানুসারিণ্য ইব গাবঃ অস্য সঙ্কল্পানুবিধায়িন্যো ভূতপ্রকৃতয়ো ভবন্তি"-(৩।৪৪)—তিনি পঞ্চভূতের স্বরূপ জয় করিয়া ভূতজয়ী হন, এবং বৎসানুসারিণী গাভীর ন্যায়, ভূতপ্রকৃতি সকল তাঁহার সঙ্কল্পের অনুবর্ত্তী হয়। পরবর্ত্তী সূত্রে মহর্ষি পতঞ্জলি বলিতেছেন "ততোঽণিমাদি-প্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পৎ তদ্ধর্ম্মানভিঘাতশ্চ"-(৩।৪৫)—ভূতজয় হইতে তাঁহার অণিমাদি ঐশ্বর্য্যের প্রাদুর্ভাব হয়, কায়সম্পৎলাভ হয় এবং কায়ধর্ম্মের অনভিঘাতও সিদ্ধ হয়। অণিমা—তিনি ইচ্ছা করিলে নিজেকে পরমাণুতে পরিণত করিতে পারেন এবং কাহারও লোমকূপের ভিতর দিয়াও শরীরের ভিতর প্রবেশ করিতে পারেন। লঘিমা—তিনি ইচ্ছামাত্র অত্যন্ত লঘু বা হাল্‌কা হইয়া বাতাসের অগ্রে গমন করিতে পারেন। মহিমা—তিনি সঙ্কল্প মাত্র ক্ষুদ্র দেহেই পর্ব্বতের ন্যায় ভারী হইয়া অথবা বিশাল দেহ সম্পন্ন হইয়া অবস্থান করিতে পারেন।

প্রাপ্তি—তিনি যে কোন স্থানের যে কোন বস্তু পাইতে ইচ্ছা করেন, সঙ্কল্পমাত্রই তাহা তিনি প্রাপ্ত হইতে পারেন। প্রাকাম্য—তাঁহার ইচ্ছা অব্যাহত হয়। বশিত্ব—সমস্ত ভূত ও ভৌতিক পদার্থ তাঁহার বশীভূত হয়, তিনি তাহাদিগকে নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারেন, এবং তিনি নিজে অন্যসকলের অবশ্য হন। ঈশিতৃত্ব—সমস্ত ভূত ও ভৌতিক পদার্থের উৎপত্তি বিনাশ ও স্থিতির উপর তিনি প্রভুত্ব করিতে পারেন (তেষাং প্রভবাপ্যয়ব্যূহানং ঈষ্টে—ভাষ্য), অর্থাৎ—তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতে সমর্থ হন। যত্র কামাবসায়িত্ব— তিনি সত্যসঙ্কল্প হন; তিনি যেরূপ সঙ্কল্প করেন, ভূত ও ভৌতিক পদার্থ সকল সেইরূপ অবস্থান করে, তাঁহার সঙ্কল্পানুসারে তাহাদের স্বভাব ও ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। কায়সম্পৎ—তাঁহার শরীরে আশ্চর্য্য রূপলাবণ্য ও বল প্রকাশ পায়। কায়ধর্ম্মের অনভিঘাত—তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জল, অগ্নি, অস্ত্র, বিষ, ব্যাধিবীজ প্রভৃতি তাঁহার শরীরের উপর কোন ক্রিয়া করিতে পারে না।

এতদ্‌ভিন্ন বিভিন্নপ্রকার যোগাঙ্গের সিদ্ধিতে বিভিন্ন প্রকার ঐশ্বর্য্য লাভের কথা যোগশাস্ত্রে আছে। এগুলি মুমুক্ষু সাধকের অভীষ্ট নয়; তবে মানুষ যে স্বীয় অন্তর্নিহিত সুষুপ্ত শক্তির উদ্বোধন ও যথাবিহিত অনুশীলন করিয়া সাধারণ বুদ্ধির অকল্পনীয় ক্ষমতা সকল লাভ করিতে পারে, এবং ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়া জগদ্‌ব্যাপারের উপর আধিপত্য পর্য্যন্ত করিতে পারে, যোগশাস্ত্র ও যোগসাধকগণ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন।

শঙ্কর প্রভৃতি আচার্য্যগণ সিদ্ধপুরুষের জগদ্ব্যাপারের উপর আধিপত্য লাভ করার বিরুদ্ধে যে সব আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, যোগভাষ্যকার ব্যাসদেব পূর্ব্বেই সে আপত্তি উত্থাপন করিয়া তাহার মীমাংসা করিয়াছিলেন। তিনি উল্লিখিত সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"ন চ শক্তোঽপি পদার্থ বিপর্য্যাসং করোতি। কস্মাৎ? অন্যস্য যত্র কামাবসায়িনঃ পূর্ব্বসিদ্ধস্য তথাভূতেষু সংকল্পাদিতি॥" যোগসিদ্ধ ভূতজয়ী মহাপুরুষ ভূত ও ভৌতিক পদার্থ সকলের উৎপত্তি, স্বভাব, ক্রিয়া, বিনাশ প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেও সমর্থ বটে, কিন্তু তিনি তাহা করিতে কখনই ইচ্ছা করেন না। কেন না পূর্ব্বসিদ্ধ সত্যসঙ্কল্প পরমেশ্বরের সঙ্কল্পানুসারেই সকল পদার্থের উৎপত্তি, স্বভাব, ক্রিয়া, ধ্বংস প্রভৃতি নিয়মিত হইতেছে। সম্যক্‌সিদ্ধ যোগিরাজ মহাপুরুষদের সঙ্কল্প এক প্রকারই হইয়া থাকে, পরস্পরের বিরোধী হয় না।

একটু বিচার করিয়া দেখিলে, বেদান্তমতে ও যোগমতে এই বিষয়ে যে বিশেষ কোন পার্থক্য আছে, তাহা মনে হয় না। যোগসিদ্ধ মুক্তপুরুষ যে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। বেদান্তসূত্র ৪।৪।৮ এবং ৪।৪।৯ সূত্রে সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁহাকে সত্যসংকল্প ও অনন্যাধিপতি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে পঞ্চম ও ষষ্ঠ সূত্রে ব্যাসদেব ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, সত্য সঙ্কল্পত্বাদি শক্তি জীবের ভিতরে সর্ব্বদাই আছে, কিন্তু বদ্ধাবস্থায় অবিদ্যাবশতঃ বা তাহার কর্ম্মানুরূপ পরমেশ্বর সঙ্কল্প বশতঃ সেই শক্তি তিরোহিত থাকে এবং

তাহাতেই জীবের বন্ধন ও মোক্ষ হইয়া থাকে। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, 'স স্বরাট্ ভবতি, তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি'—তিনি স্বরাট্ হন্ ও সকল লোকে তাঁহার কামচার (ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার, ইচ্ছার অনভিঘাত, ঈশ্বরত্ব) সিদ্ধ হয়। স্বয়ং পরমেশ্বরে যে সকল গুণ, শক্তি ও ঐশ্বর্য্য নিত্য-বর্ত্তমান থাকায় তিনি নিত্য সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্ত্তা হইয়া বিদ্যমান আছেন, সাধনবলে মুক্তজীব সেই সকল গুণ, শক্তি ও ঐশ্বর্য্য-লাভ করেন বলিয়া শাস্ত্রসকল কীর্ত্তন করিতেছেন। বস্তুতঃ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী শক্তি অষ্টৈশ্বর্য্যেরই অন্তর্ভুক্ত।

ঈশ্বরের বিধানের প্রতিকূলে কেহ স্বীয় শক্তিকে সফল করিয়া দেখাইতে পারিলেই, তাহার সেই শক্তি আছে বলিয়া যদি স্বীকার করিতে হয়, এবং তদভাবে যদি তাহার শক্তি অস্বীকার করিতে হয়, তবে কোন জীবের কোনরূপ শক্তি আছে, ইহা বলাই অসম্ভব হয়। কারণ পরমেশ্বর কেবল-মাত্র সমষ্টিজগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা নহেন, তিনি ব্যষ্টি-জগতেরও সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় ব্যাপারই তাঁহার সঙ্কল্পানুযায়ী বিধান অনুসারে সংঘটিত ও নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, সকলের সকল কর্ম্ম ও কর্ম্মফলই তাঁহার ইচ্ছানুসারে হইতেছে, তাঁহার বিধানের প্রতিকূলে কোন প্রাণীর পক্ষে কোন সামান্য কার্য্য সম্পাদন করাও অসম্ভব। কেনোপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, দেবতাগণ যখন অসুর-দিগকে পরাভূত করিয়া আপনাদিগকেই বিজেতা ভাবিয়া

অভিমান করিতেছিলেন, তখন হৈমবতী উমা (ভাগবতী বিদ্যাশক্তি) তাঁহাদিগকে জ্ঞানদান করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের নিকটে আবির্ভূত হইয়া কার্য্যতঃ বুঝাইয়া দিলেন যে, ঐশ্বরিক শক্তি ব্যতীত অগ্নিদেব একটি তৃণও দহন করিতে পারেন না, পবনদেব একটি তৃণও স্থানচ্যুত করিতে পারেন না, কোন দেবতাই কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হন না। যে ভাবে আমরা বলিতে পারি যে, কোন ব্যক্তির এক মণ জিনিষ উত্তোলন করিবার বা এক যোজন পথ পদব্রজে গমন করিবার শক্তি আছে, অথবা কোন ব্যক্তির বাষ্পীয় যান বা শতঘ্নী অস্ত্র নির্ম্মাণ করিবার শক্তি আছে, কিংবা কাহারও বেদান্ত বিদ্যা বা পদার্থ বিদ্যা শিক্ষা দিবার শক্তি আছে, সেই ভাবেই আমরা ইহা বলিতে পারি যে, যোগসিদ্ধ মহাপুরুষের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের শক্তি আছে। আপেক্ষিক সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ক্ষমতা অল্লাধিক সকল জীবেরই আছে, প্রত্যেকেই কোন না কোন পদার্থ উৎপাদন করিতে পারে (নিজের সন্তানের জন্ম দেওয়াও সৃষ্টি, কাব্যাদি রচনাও এক প্রকার সৃষ্টি, ঘট-পটাদি প্রস্তুত করাও এক প্রকার সৃষ্টি), কোন না কোন পদার্থ ধ্বংস করিতে পারে, এবং কোন না কোন পদার্থ পালন করিতে পারে। এই ক্ষমতা যোগসিদ্ধ মুক্তপুরুষে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এ সকল ক্ষমতাই জীবের ভিতরে ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ, এবং এ সব ক্ষমতার প্রয়োগও ঈশ্বরের বিধানেই হইয়া থাকে। এ সব শক্তি ও ব্যবহারের কথা ব্যাবহারিক জগতেরই বিষয় এবং ব্যাবহারিক জগতের যাবতীয় ব্যাপারই ঈশ্বরেচ্ছা-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

কোন ব্যক্তি কোন শক্তি বা ঐশ্বর্য্য বহুল পরিমাণে লাভ করিয়াছেন,—তত্ত্ববিচারে একথার তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বরেরই সেই শক্তি বা ঐশ্বর্য্য বহুল পরিমাণে তাঁহার ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তিনি ঈশ্বরকেই সেই পরিমাণে নিজের সেই শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের ভিতর দিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন। যিনি ধনে, মানে, বীর্য্যে, শৌর্য্যে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে,—তপস্যায় বা তিতিক্ষায় যে, কোন শক্তিতে বা ঐশ্বর্য্যে অপর সাধারণ হইতে কতকটা বৈশিষ্ট্য লাভ করেন, জানিতে হইবে যে, তাঁহার মধ্যে ঈশ্বরত্বের কিছু বিশেষ বিকাশ হইয়াছে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

'যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥

যিনি শক্তি বা ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে সত্যজ্ঞান লাভ করেন তিনি জ্ঞানে এই তথ্য প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতে পারেন, এবং তাঁহার চিত্তে সেই শক্তি-লাভজনিত কোন অভিমান উদিত হয় না। কিন্তু যিনি কোন বিশেষ শক্তি বা ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া তৎসঙ্গে যথার্থ জ্ঞান লাভ করেন না, তিনি সেই শক্তি বা ঐশ্বর্য্য নিজের মনে করিয়া অভিমানে মত্ত হন, এবং তাঁহার মধ্যে যাঁহার প্রকাশ হইতেছে, সেই পরমেশ্বর তাঁহার জ্ঞানের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকেন। তিনিও অবশ্য তাঁহার সেই শক্তি বা ঐশ্বর্য্য ঈশ্বরেচ্ছার প্রতিকূলে ব্যবহার করিতে পারেন না, তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার ভিতর দিয়া সেই শক্তি বা ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বরেচ্ছানুযায়ী ব্যবহারই হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে

ঈশ্বরেচ্ছানুযায়ী ফলই প্রসূত হইয়া থাকে। তাঁহার অজ্ঞানতা-বশতঃ সেই ফল কখন তাঁহার ইষ্ট বলিয়া বোধ হয়, কখন তাঁহার অনিষ্ট বলিয়া বোধ হয়, এবং তদনুরূপ সুখদুঃখানুভবও তাঁহার হইয়া থাকে। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে অনিষ্ট বলিয়া কিছু নাই, সুতরাং তাঁহার কর্ম্মের অসিদ্ধিও কখনও হইতে পারে না, কাজেই দুঃখ বা তাপও তাঁহার হয় না।

যোগসিদ্ধ মুক্তপুরুষের ভিতরে ঈশ্বরের শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের পূর্ণ বিকাশ হয়। সম্যক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ জ্ঞানে, প্রেমে ও আনন্দে যেরূপ ঈশ্বরের সহিত সাম্য লাভ করেন, যেরূপ তিনি ঈশ্বরের ন্যায় সর্ব্বাত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হন, যেরূপ তিনি ঈশ্বরের ন্যায় কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা এবং ভোক্তা হইয়াও অভোক্তা হন, সেইরূপ তিনি শক্তি এবং ঐশ্বর্য্যেও ঈশ্বরের সহিত সমান হইয়া থাকেন, ঈশ্বরের সহিত সমান ভাবেই সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়া থাকেন। কিন্তু তাহাতে তিনি ঈশ্বরের 'সরিক' বা প্রতিদ্বন্দ্বী হন না, একজন স্বতন্ত্র বিশিষ্ট-সংকল্প-বিকল্প-যুক্ত সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী হইয়া দণ্ডায়মান হন না, নূতন ভাবে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতে প্রবৃত্ত হন না, ঈশ্বরেচ্ছার প্রতিকূলে স্বীয় শক্তি ও ঐশ্বর্য্য প্রয়োগ করিয়া সনাতন বিশ্ববিধানের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করিতে প্রযত্নবান্ হন না। কারণ, ঈশ্বর ত তাঁহার বাহিরে নহেন, ঈশ্বর যে তাঁহার ভিতরে। অজ্ঞ ব্যক্তিই ঈশ্বরকে নিজের বাহিরে অবস্থিত অচিন্ত্য-জ্ঞানৈশ্বর্য্য-শক্তি-সমন্বিত একজন পৃথক বিরাট পুরুষ বলিয়া মনে করেন এবং নিজেকে সার্দ্ধ-ত্রিহস্ত-পরিমিত

শরীরের মধ্যে আবদ্ধ, বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র এক অংশে অবস্থিত দেশকাল অবস্থার অধীন, একটি ক্ষুদ্র প্রাণী বলিয়া বোধ করেন। জ্ঞানী পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, অশেষ-প্রেম-মহার্ণব, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী পরমেশ্বরকে আপনার মধ্যেই অনুভব করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

—সর্ব্বভূতে যিনি আপনার ভগবদ্ভাব (ভগবত্তার প্রকাশ) দর্শন করেন এবং সর্ব্বভূত আপনাতে ও ভগবানে দর্শন করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ ভক্ত। সুতরাং নিজের ভিতরের ভগবত্তারই বিকাশ সাধন করিয়া ভক্ত জীব-জগৎ-সমন্বিত সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আপনার ভিতরে দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহার নিজের আত্মার ভিতরে অন্তর্নিহিত যে ঐশ্বরিক জ্ঞান, শক্তি, প্রেম ও আনন্দ গুপ্তভাবে অনাদিকাল হইতেই বিদ্যমান রহিয়াছে, সাধন দ্বারা তিনি তাহারই পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করিয়াছেন। তাঁহার সাধনলব্ধ জ্ঞান, প্রেম, আনন্দ, শক্তি ও ঐশ্বর্য্য বস্তুতঃ নিত্যসিদ্ধ পরমেশ্বরেরই জ্ঞান, প্রেম, আনন্দ, শক্তি ও ঐশ্বর্য্য। তাঁহার ইচ্ছার ভিতর দিয়া ঈশ্বরেচ্ছারই প্রকাশ হয়, তাঁহার ব্যাবহারিক জীবনে অন্তর্য্যামী পরমেশ্বরের ইচ্ছার সহিত সম্পূর্ণরূপে একীভূত স্বকীয় ইচ্ছা অনুসারেই তাঁহার শক্তি ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির প্রয়োগ ও সম্ভোগ হয়, ঈশ্বর তাঁহার স্ব-রূপে প্রকাশিত বলিয়া ঈশ্বর-তন্ত্র হইয়াই তিনি স্ব-তন্ত্র বা স্বাধীন, এবং স্ব-তন্ত্র বা

স্বাধীন হইয়াই তিনি ঈশ্বর-তন্ত্র বা ঈশ্বরাধীন। বস্তুতঃ তিনি ঈশ্বরের সকল গুণ, ঐশ্বর্য্য ও শক্তি লাভ করিয়া ঈশ্বরেরই একটি বিশেষ বিগ্রহরূপে জগতে বিচরণ করেন। পরিপূর্ণ-মানবত্বের মধ্যেই ঈশ্বরত্বেরও পরিপূর্ণ বিকাশ হয়। এরূপ ঈশ্বরত্ব লাভ হইলে ঈশ্বরেরই ন্যায় মানব সত্যসংকল্প, সর্ব্বকর্ম্মা, কামচারী, মহাভোগী ও মহাত্যাগী হইয়াও সংকল্পবিহীন, কর্ম্মবিহীন, কামবিহীন, ভোগবিহীন ও ত্যাগবিহীন হইয়া অবস্থান করেন। তখন তাঁহার শক্তি ব্রাহ্মীস্থিতিতে পর্য্যবসিত হয়, ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যে পর্য্যবসিত হয়।

এক অদ্বিতীয় নিত্যসিদ্ধ নিত্যমুক্ত অশেষ-কল্যাণ-গুণাকর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডাধিপতি যোগীশ্বর ভগবান্ আপনার অগণিত বিকাশের ভিতর দিয়া অনন্তভাবে আপনার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান, প্রেম, শক্তি ও ঐশ্বর্য্য উপলব্ধি ও সম্ভোগ করিবার উদ্দেশ্যেই আপনি বহু হইয়া, সেই বহুর মধ্যে আপনার ভগবত্তার সঙ্কোচন পূর্ব্বক আপনাকে অবিদ্যাগ্রস্ত অসংখ্য জীবরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন, এবং তাহাদের কর্ম্ম, ভোগ ও স্বরূপাভিব্যক্তির উপযুক্ত ক্ষেত্র ও উপকরণ সহযোগে এই জগদ্রূপেও আত্মপ্রকট করিয়াছেন। তিনি বিশ্ববিধানটী এমন ভাবে প্রণয়ন করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা জীবজগতের যাবতীয় ব্যাপার এমন সুশৃঙ্খলরূপে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, যাহাতে প্রত্যেক জীব অন্ধতমসাচ্ছন্ন হেয়তম অবস্থা হইতে নানাবিধ অবস্থার ভিতর দিয়া অজ্ঞাতসারেও ক্রমশঃ ভগবত্তার পথেই—জ্ঞান, প্রেম, শক্তি, আনন্দ ও ঐশ্বর্য্যের

তাঁহাদের মধ্য দিয়া প্রকাশ হইয়া পড়ে। একটি মদমত্ত হস্তী কোন ক্ষুদ্র জলাশয়ের মধ্যে অবতরণ করিলে যেমন সেই জলাশয়কে তোলপাড় করিয়া লয়, সেইরূপ অল্পাধিকারী যোগী বিশেষ অলৌকিক শক্তি লাভ করিলে সেই শক্তিই তাঁহাকে চঞ্চল ও বহির্মুখ করিয়া ফেলে। যাঁহারা বিশেষ বিশেষ যোগাঙ্গের অনুশীলন করিয়া বিশেষ বিশেষ শক্তি ও বিভূতি লাভ করেন, অথচ জ্ঞান সাধনার অভাব বশতঃ তত্ত্বদৃষ্টি লাভ করেন না, তাঁহাদের অহংভাব বিনষ্ট না হওয়ায় এবং ঈশ্বরেচ্ছার সহিত তাঁহাদের ইচ্ছার সজ্ঞানে মিলন সাধিত না হওয়ায়, তাঁহারা সেই সব শক্তি ও বিভূতিতে আসক্ত হইয়া পড়েন, এবং বহির্জগতে বিশেষ বিশেষ ফল লাভের আশায় তাহা প্রয়োগ করিয়া কখন কখন বিষয়ী লোকের স্বভাবই প্রাপ্ত হন। এ সকল ব্যাপারও অবশ্য ঈশ্বরের বিধান অনুসারেই সংঘটিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের অধিকারের অল্পতা প্রকাশ পায়, এবং তাঁহারা যে তাঁহাদের মধ্যে ঈশ্বরত্বের ক্রমবিকাশের পথে লক্ষ্য হইতে অপেক্ষাকৃত দূরে অবস্থিত, তাহাই সিদ্ধান্ত হয়।

সাধক লক্ষ্যের যত নিকটবর্ত্তী হন, তাঁহার মধ্যে ভগবত্তা যত বিকাশপ্রাপ্ত হয়, ততই তিনি তত্ত্বদৃষ্টিলাভ করেন, ততই পরম মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছার সহিত তাঁহার জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছার মিলন হয়, তাঁহার অহংভাব ততই বিশ্বাত্মার অহং-এর মধ্যে বিলীন হইয়া যায়, ততই

তাঁহার তপোলব্ধ অলৌকিক শক্তি ও বিভূতি বাহিরে কোন উদ্দেশ্য সাধনে প্রয়োগ করিতে তিনি অনিচ্ছুক হন। যাঁহার অধিকার যত উচ্চ, তিনি স্বকীয় শক্তি ও বিভূতি নিজের ভিতরে তত অধিক পরিমাণে গুপ্ত রাখিতে সমর্থ হন। নিজের যোগলব্ধ অলৌকিক ঐশ্বর্য্য থাকিলেও, তাহা প্রকাশ হইতে না দিয়া নিজের ভিতরে বশীভূত করিয়া রাখিবার শক্তি সব চেয়ে বড় শক্তি, এবং সেই শক্তি অত্যুচ্চ অধিকারসম্পন্ন পরমার্থদর্শী নিত্যযুক্ত যোগীরই থাকে। বাবা গম্ভীরনাথের ভিতরে সেই শক্তি পূর্ণমাত্রায় লক্ষিত হইত। তিনি কখনও লৌকিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার সাধারণ কার্য্য বা বাক্যালাপের ভিতরে কখনও কোন অলৌকিকত্বের গন্ধ পাওয়া গেলে, তৎসম্বন্ধে যদি কেহ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, দু'এক কথায় সহজ জ্ঞানের ভাষায় তাহা ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলিতেন যে, বাবা গম্ভীরনাথ ঐশ্বর্য্যে সিদ্ধিলাভ করিয়া মাধুর্য্যে ডুবিয়া আছেন।

বাবা গম্ভীরনাথের ব্যাবহারিক জীবন পর্য্যবেক্ষণ করিলে কেবলমাত্র দুই প্রকার অলৌকিক শক্তির বিশিষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইত। প্রথমতঃ, সকল প্রকার অবস্থাবিপর্য্যয়ের মধ্যে সর্ব্বদা ব্রহ্মভাবে সমাহিত থাকিবার শক্তি,—'নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্' হইয়া অবস্থান করিবার শক্তি ; দ্বিতীয়তঃ, প্রেমের শক্তি,—ভূতানুকম্পার শক্তি। সামান্য

সামান্য ব্যাপারে তাঁহার অলৌকিক শক্তির সামান্য সামান্য পরিচয় যিনি যাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন, ভগবদ্‌ভাবভাবিত মহাপুরুষের জীবপ্রেমের শক্তিতেই তাঁহার ভিতর হইতে তাহা টানিয়া বাহির করিয়াছে, ভগবান্ তাঁহার ভিতর দিয়া জীবের প্রতি কৃপা বিতরণ করিবার জন্যই তাঁহার জীবনে তত্‌টুকু অলৌকিক শক্তির বহির্বিকাশ করিয়াছেন।

গয়ার সুনিয়ত তীব্র অভ্যাস যোগ সমাপনের পর হইতে যোগিরাজ গম্ভীরনাথ জ্ঞানে, বৈরাগ্যে, প্রেমে, শক্তিতে, মাধুর্য্যে, আচারব্যবহারে—সর্ব্বপ্রকারে, পরিপূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন, এবং অনুসন্ধিৎসু মনুষ্যদিগের সম্মুখে মানব জীবনের আদর্শ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

———

সম্যক্ সিদ্ধি ও ব্যাবহারিক জীবন

ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণকে প্রথমতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণী বৈরাগ্য-প্রধান, অন্য শ্রেণী প্রেম-প্রধান। যাঁহাদের চিত্তে পূর্ব্ব হইতে বৈরাগ্যের সংস্কারই অত্যন্ত প্রবল থাকে, তাঁহারা তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের পরে ব্যাবহারিক জগতের সহিত আর কোন বিশেষ সম্পর্ক রাখেন না, সদা সর্ব্বদা নিঃসঙ্গ অবস্থায় সমাধিতে ব্রহ্মানন্দ উপভোগে নিরত থাকেন। যত দিন প্রারব্ধবশে তাঁহাদের দেহ রক্ষিত হয়, তত দিন তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানে, ব্রহ্মধ্যানে, ব্রহ্মানন্দরস পানেই ডুবিয়া থাকেন, জগতের কোন খোঁজ খবর রাখেন না। জগতের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক কেবলমাত্র শরীর রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় কিঞ্চিৎ আহার্য্য গ্রহণ, তাহাও ভগবদ্‌বিধানে তাঁহাদের প্রাক্তন অনুসারেই জুটিয়া যায়, বাহ্যজগতের সহিত আর কোন লৌকিক সম্বন্ধ রক্ষা করা তাঁহারা জীবন্মুক্তির বিশেষ আনন্দ সম্ভোগের বিঘ্নকর মনে করেন। জগৎ তাঁহাদের নিকট কেবলমাত্র পারমার্থিক দৃষ্টিতে মিথ্যা নয়, ব্যবহারিক হিসাবেও তুচ্ছ ও হেয়। সুতরাং তাঁহাদের দেহে যতদিন প্রাণ থাকে, দেহ রক্ষার্থে

বিশেষ চেষ্টার অভাব সত্ত্বেও যতদিন প্রারব্ধের শক্তিতে দেহেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের সহিত তাঁহাদের ব্যাবহারিক সম্পর্ক রক্ষিত হয়, ততদিন নিত্য নিরন্তর আত্মসমাহিতভাবে অবস্থান পূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়াই তাঁহারা কাল অতিবাহিত করেন। ইহাই তাঁহাদের ব্যাবহারিক জীবনে একমাত্র কার্য্য হয়। তৎপর কালক্রমে প্রারব্ধক্ষয়ে দেহপাত হইলে তাঁহারা বিদেহমুক্ত হন,---ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন।

যাঁহাদের চিত্তে প্রেমের সংস্কার প্রবল, অবিদ্যাগ্রস্ত সংসার-তাপ পীড়িত জীব সমূহের দুঃখ দর্শনে যাঁহাদের হৃদয় করুণায় বিগলিত হয়, আত্মৌপম্য দৃষ্টিতে পরের সুখ দুঃখ নিজের বলিয়া অনুভব করা যাঁহাদের স্বভাব, সমাধি অবস্থা হইতে ব্যুত্থান অবস্থাতে অবতরণ করিলেই যাঁহাদের অন্তঃকরণ জীবের দুঃখ সম্বন্ধে সজাগ হয়, সেই জীবপ্রেমিক মহাপুরুষগণ তত্ত্বসাক্ষাৎকারের পরে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মভাব লইয়া আবার লোক সমাজে আত্মপ্রকাশ করেন, ব্যাবহারিক জগতের সহিত আবার ব্যাবহারিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন, লোক সকলকে নিজেদের পবিত্র সঙ্গলাভের সুবিধা প্রদান করিয়া অনুগৃহীত করেন, মানব-সমাজের সম্মুখে দুঃখ-দৈন্যাদিশূন্য পরিপূর্ণ-মানব-চরিত্রের আদর্শ উপস্থাপিত করিয়া পরম কল্যাণের পথ প্রদর্শন করেন। জীব-প্রেমই তাঁহাদের ব্যক্তিত্বকে কথঞ্চিৎ ঘনীভূত করিয়া রাখে—সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মে বিলীন হইতে দেয় না। তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানে আপনাদিগকে সর্ব্বকর্ম্মবিমুক্ত জানিয়াও জীবহিতের জন্য কর্ম্ম-

ক্ষেত্রে যথাবিহিত কর্ম্ম করেন, তাঁহারা সর্ব্বক্লেশ পরিমুক্ত হইয়াও জীবের ক্লেশ নির্ব্বিকার ও সুপ্রসন্ন চিত্তে নিজেদের স্কন্ধে বহন করিতে প্রস্তুত হন, তাঁহাদের মন সাম্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও জীবজগতের ব্যাবহারিক বৈচিত্র্য অঙ্গীকার করিয়া লইয়া 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় চ' দেশকালপাত্রানুযায়ী ব্যবহার করেন, এবং অন্যকেও নিজের ও পরের কল্যাণোদ্দেশ্যে তদ্রূপ ব্যবহার করিতে শিক্ষা দেন। জীবহিতই তাঁহাদের ব্যাবহারিক জীবনের নিয়ামক। কোন বিষয়ে তাঁহাদের অভিমান নাই, কোন কর্ম্মের সিদ্ধিতে বা অসিদ্ধিতে তাঁহাদের কোনরূপ বিকার নাই, নিন্দা-প্রশংসা কি মান-অপমানে তাঁহাদের চিত্তে কোন দাগ লাগে না; অথচ বিষয় হইতে, কর্ম্ম হইতে, নিন্দাপ্রশংসাদির স্থল হইতে, তাঁহারা দূরেও পলায়ন করেন না। জীবের কল্যাণের জন্যই তাঁহাদের জীবন। তজ্জন্য কখন কখন সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কর্ম্মকোলাহলের সঙ্গেও যোগদান করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হন না। মানুষ যে কত বড়, মানুষের অধিকার যে কত উচ্চ, মানুষ স্বকীয় জ্ঞান, শক্তি, প্রীতি প্রভৃতি বৃত্তির যথোচিত অনুশীলন দ্বারা যে কতদূর পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে, সংসারের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও মানুষ যে কি ভাবে সকলপ্রকার মলিনতা, সংকীর্ণতা, ভয় দুঃখ, প্রভৃতি দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে পারে, সকল কর্ম্ম করিয়াও মানুষ যে কি ভাবে সর্ব্বকর্ম্মাতীত ও সর্ব্ববন্ধনবিহীন হইয়া পরিপূর্ণ আনন্দময় রাজ্যে বিচরণ করিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া মানুষকে

আত্মগৌরব সম্বন্ধে সজাগ ও আত্মানুশীলনে প্রবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যেই ভগবদ্‌বিধানে লোকসমাজের ভিতরে এইরূপ লোকোত্তর মহাপুরুষগণ জীবন যাপন করিয়া থাকেন। পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের ভাষায়, "ইঁহারা বাহাদুরী কাঠ",—নিজেরাও সংসারসমুদ্রের উপরে নিস্‌পরোয়া ভাবে ভাসিয়া বেড়ান, অন্য দশজনকেও আশ্রয় দান পূর্ব্বক ভাসাইয়া লইয়া যান। এইভাবে প্রারব্ধানুযায়ী জীবন যাপন করিয়া, প্রারব্ধক্ষয়ে দেহ কালসাৎকৃত হইলে, সেই তত্ত্বজ্ঞানী প্রেমিক মহাপুরুষগণও বিদেহমুক্তি লাভ করেন।

যোগিরাজ গম্ভীরনাথ শেষোক্ত শ্রেণীর মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি সিদ্ধিলাভের পর নিত্যনিরন্তর গুহাহিত হইয়া চিত্তবৃত্তি-নিরোধ পূর্ব্বক নিস্তরঙ্গ ব্রহ্মানন্দসম্ভোগে ডুবিয়া থাকিতে পারিতেন, কিন্তু জীবপ্রেম তাঁহাকে গুহা হইতে টানিয়া বাহির করিল। তিনি সংসার ও সমাধির মাঝখানে অবস্থিত থাকিয়া ব্রাহ্মীস্থিতির আদর্শ লোকসমাজে শিক্ষা দিবার জন্য আত্মপ্রকাশ করিলেন। তিনি লোকসঙ্গ ও লৌকিক ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন না করিয়া আত্মসমাহিত অবস্থায় স্বপ্নাবিষ্টবৎ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। বেদান্ত ও যোগশাস্ত্রের পরিভাষা গ্রহণ করিলে বলিতে হয় যে, তিনি অধিকাংশ সময় পঞ্চম ভূমিতে অবস্থান করিয়া ব্যবহার চালাইতেন, কখন কখন চতুর্থ ভূমিতেও অবতরণ করিতেন। ষষ্ঠ ও সপ্তম ভূমিতে ব্যবহার সম্ভব হয় না। যখন লোকসঙ্গ না থাকিত তখন চিত্তবৃত্তি নিরোধ পূর্ব্বক সমাধি-

মগ্ন হইয়া ষষ্ঠ ও সপ্তম ভূমিতে আরূঢ় হইয়া বিশেষ আনন্দ সম্ভোগ করিতেন।

যে সব জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বাহিরে আসিয়া লৌকিক ব্যবহারে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদেরও সকলের আচরণ এক প্রকার পরিলক্ষিত হয় না। তাঁহাদের ব্যবহারে দেখা যায় যে, কেহ কেহ জ্ঞানরসিক, কেহ কেহ ধ্যানরসিক, কেহ কেহ ভাবপ্রবণ, কেহ কেহ কর্ম্মপ্রিয়। কোন কোন মহাত্মা প্রেমে বিগলিত হইয়া নৃত্য গীত হাস্য ও ক্রন্দন করিয়া থাকেন,—'হসত্যথ রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ'। কোন কোন মহাত্মা স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াও জড় উন্মত্ত বা পিশাচের মত বিচরণ করেন। কোন কোন মহাত্মা প্রশান্ত গম্ভীর মহাকাশের ন্যায় অবস্থান করেন। কেহ কেহ বিচারপথ অবলম্বন করিয়া শাস্ত্র ও যুক্তির সাহায্যে জিজ্ঞাসুদিগকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করেন। কেহ কেহ বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিচারশক্তি দ্বারা বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী দিগকে পরাস্ত করিয়া স্বীয় মতের প্রতিষ্ঠা করেন। কোন কোন মহাপুরুষ সাধ্যসাধন বিষয়ক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করেন। কোন কোন মহাপুরুষ ধর্ম্মার্থীদিগকে শিষ্যত্বে গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ও তৎসূত্রে সমাজকে ধর্ম্ম ও কল্যাণের পথে প্রবর্ত্তিত করেন। কোন কোন মহাত্মা লোকসমাজের সম্পর্কে আসিয়াও সদাসর্ব্বদা অন্তর্মুখ ও ধ্যানপরায়ণ থাকিয়া নিজের এই পরম কল্যাণকর আচরণ দ্বারাই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য শিক্ষা দান করেন। কাহারও কাহারও লোকশিক্ষার

ক্ষেত্র অতি বিস্তৃত হয়, কেহ কেহ অল্প পরিসরের মধ্যে লোকসংগ্রহের কার্য্য করেন। কোন কোন মহাত্মার মেজাজ একটু রুক্ষ হইতে দেখা যায়, তাঁহারা যাহাদের প্রতি কৃপা করেন, তাহাদের প্রতিও অনেক সময় রুক্ষ ব্যবহার করেন; কোন কোন মহাত্মা সকলের প্রতিই অতি মধুর প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করেন—কাহারও মনে কখনও কোনরূপ আঘাত প্রদান করেন না। কাহারও ব্যবহারের মধ্যে কথঞ্চিৎ রাজস বা তামস ভাবোচিত কার্য্যও লক্ষিত হয়, কাহারও ব্যবহার আবার বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকভাবে পরিপূর্ণ।

যে সব মহাপুরুষ শাস্ত্রে ও লোকসমাজে জীবন্মুক্ত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন, যাঁহারা স্বকীয় আত্মার ব্রহ্মস্বরূপত্ব ও সর্ব্বাত্মকত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া সকল ভেদ অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহাদের ব্যাবহারিক জীবনে এইরূপ পার্থক্য কেন দৃষ্ট হয়, সে বিষয়ে নিশ্চিত উত্তর পাওয়া কঠিন। তবে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, মনুষ্যগণের প্রকৃতি, রুচি, বুদ্ধি ও সংস্কার যেরূপ অসংখ্য প্রকার, দেশভেদে, কাল-ভেদে, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থাভেদে মনুষ্যের অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির গঠনে যেরূপ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তাহাতে তাহাদের কল্যাণের জন্য, তাহাদের আদর্শ স্থানীয় মহাপুরুষ দিগের ভাবগত ও বৃত্তিগত পার্থক্যও কতক পরিমাণে অবশ্য প্রয়োজনীয়। শাস্ত্রে নারদ, সনৎকুমার, বশিষ্ঠ, প্রহ্লাদ, জড়ভরত, শুকদেব, জনক, রামচন্দ্র প্রভৃতি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ-

গণের ব্যাবহারিক জীবনে যে বিশেষ বিশেষ ভাবের বিকাশ প্রদর্শিত হইয়াছে ; বুদ্ধ, খৃষ্ট. শঙ্কর, চৈতন্য, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞানী লোকশিক্ষকগণ স্ব স্ব ব্যবহারে ও মতে যেরূপ বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, স্বীকার করিতেই হইবে যে বিচিত্র স্বভাবান্বিত ব্যক্তি ও সমাজ সমূহের কল্যাণের জন্য সেই সব বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন ছিল ও আছে। বর্ত্তমান যুগেও রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ, রামদাস (কাঠিয়া বাবা), অর্জ্জুনদাস, মোহনদাস, সুন্দরনাথ, গম্ভীরনাথ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের বাহ্যিক জীবনে আমরা তদ্রূপ পৃথক্ পৃথক্ ভাব ও আচার দেখিতে পাইয়াছি। যে ব্যক্তি বা সমাজ স্বকীয় সংস্কার, রুচি ও বুদ্ধি অনুসারে যে মহাপুরুষকে আদর্শরূপে বরণ করিতে পারেন, তাঁহারই অনুবর্ত্তী হইয়া সেই ব্যক্তি বা সমাজ নিঃশ্রেয়সের পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হন।

শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রণালী অনুসরণ করিয়া আমরা এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, ধ্যানযোগে আত্মসমাহিত হইবার পূর্ব্বে যে সাধকের চিত্তে যে জাতীয় সংস্কার প্রবল থাকে, তদনুসারেই জীবন্মুক্ত অবস্থায় তাঁহার ব্যাবহারিক জীবনের ভাব ও বৃত্তি নিয়মিত হয়, এবং যেরূপ সম্প্রদায় ও মতের অনুসরণে সাধন ভজন করিয়া তিনি সিদ্ধিলাভ করেন, সিদ্ধাবস্থায় তাঁহার উপদিষ্ট তত্ত্ব এবং সাধনপ্রণালীও প্রায়শঃ তদনুযায়ীই হইয়া থাকে। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মজনিত সংস্কার ও অদৃষ্ট এবং বর্ত্তমান জীবনে দেশ, কাল, জাতি, বর্ণ, সমাজ, সম্প্রদায়, শিক্ষা,

দীক্ষা ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রকারভেদে সাধক-দিগের রুচি, বুদ্ধি ও অভ্যাস বিশেষ বিশেষ আকারে গঠিত হইয়া থাকে। তীব্র পুরুষকারের সহিত অন্তরঙ্গ সাধনে নিমজ্জিত হইলে সেই সব সঙ্কীর্ণ রুচি, বুদ্ধি ও সংস্কার প্রসুপ্ত হইয়া অন্তঃকরণে সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান থাকে, তাহাতে তাঁহাদের তত্ত্বসাক্ষাৎকারের কোন বাধা হয় না। তাঁহাদের তত্ত্বান্বেষিণী বুদ্ধি এই সকল অনাত্মভাবকে শ্রবণ, মনন, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি প্রভাবে অতিক্রম করিয়া পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকে। যতদিন চিত্তকে নিত্যনিরন্তর তত্ত্বে সমাহিত রাখা যায়, ততদিন এই সব সংস্কার ও প্রবৃত্তি জাগ্রত হইতে ও স্থূলভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে অবসর প্রাপ্ত হয় না।

যাঁহারা বৈরাগ্য-প্রধান সাধক, তাঁহারা আত্মসমাধানে নিযুক্ত থাকিতে থাকিতেই দেহ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, এবং এই সব বিচিত্র সংস্কার তাঁহাদের জীবনে প্রকটিত হইবার কোন সুযোগ লাভ করে না। কিন্তু প্রেম-প্রধান সাধকগণ তত্ত্বসাক্ষাৎকারান্তে জীবন্মুক্ত অবস্থায় নির্ব্বিকার ভাবে যখন সংসারে বিচরণ করেন, তখন তাঁহাদের বুদ্ধি সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং তত্ত্বদৃষ্টিতে শুভাশুভ তাঁহাদের নিকট সমান হইয়া যাওয়ায়, তাঁহারা কোন বৃত্তিবিশেষের নিগ্রহের জন্য অথবা বৃত্তিবিশেষের অনুশীলনের জন্য, কোনরূপ পুরুষকার প্রয়োগ করা আবশ্যক বোধ করেন না। গীতায় শ্রীভগবান্ গুণাতীত পুরুষের এইরূপ লক্ষণ বর্ণন করিয়াছেন,—

'প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥'

—প্রকাশ (সত্ত্বগুণের কার্য্য), প্রবৃত্তি (রজোগুণের কার্য্য) ও মোহ (তমো গুণের কার্য্য) প্রভৃতি সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বৃত্তি সকল যদি পূর্ব্বসঞ্চিত প্রবল সংস্কারের বশে ব্যুত্থিত চিত্তনদীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্বুদ্‌রূপে আপনা আপনি প্রকটিত হইয়া ব্যবহারক্ষেত্রে কার্য্যরূপে পরিণত হয়, তাহা হইলে জীবন্মুক্ত গুণাতীত মহাপুরুষ ঐ সকল বৃত্তি বা কার্য্যকে আপনার নিজস্ব বলিয়া মনে করেন না, তাহাদের দোষ গুণের বা ফলাফলের বিষয় চিন্তাও করেন না, সুতরাং তাহা দূর করিবার জন্য ইচ্ছাশক্তির কোন বিশেষ প্রয়োগও করেন না। আবার কোন বৃত্তি ও কার্য্যের অভাব হইলে—স্বকীয় দুর্ব্বলতা বশতঃই হউক অথবা কোন বাধাবিঘ্ন বশতঃই হউক, কোন বৃত্তি চরিতার্থ না হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইলে, তজ্জন্য কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে উদিত হয় না। এ সকল বৃত্তি ও তজ্জনিত কার্য্য শুভ হউক কিম্বা অশুভ হউক, তিনি তাহাদের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন।

সাধারণতঃ তাঁহাদের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ থাকে বলিয়া, তাহাতে শুভ ও সাত্ত্বিক ভাবেরই উদয় হইয়া থাকে, এবং তাঁহাদের কর্ম্মও তদনুরূপ হইয়া থাকে। যে সব ভাব ও কর্ম্ম লোক-সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর—যেরূপ ভাব ও কর্ম্ম অনুকরণ

করিলে জনসাধারণের অধঃপতিত হইবার সম্ভাবনা—জীবপ্রেমিক লোকশিক্ষক মহাপুরুষগণ, আপনারা শুভাশুভের পরপারে অবস্থিত হইয়াও, সেই প্রকার জীবকল্যাণ-পরিপন্থী ভাব ও কর্ম্ম তাঁহাদের ব্যাবহারিক জীবনে অতি অল্পই প্রকটিত করেন। কারণ, মনুষ্যসমাজের আদর্শ হইয়া জীবনযাপন করিবার জন্য এবং মানব-মণ্ডলীকে মানব-জীবনের উচ্চ-আদর্শ শিক্ষা প্রদানের জন্যই তাঁহাদের প্রেমপ্রধান হৃদয় তাঁহাদিগকে সমাধি-জ আনন্দের অত্যুন্নত শিখর হইতে লৌকিক ব্যবহারের সমতল ক্ষেত্রে আনয়ন করিয়া থাকে। তথাপি প্রারব্ধ প্রভাবে কোন কোন পূর্ব্বসঞ্চিত অশুভ সংস্কার সুপ্ত অবস্থা হইতে জাগ্রত অবস্থায় আসিয়া অশুভ কার্য্যরূপে পরিণত হওয়া তাঁহাদের ব্যাবহারিক জীবনে যে নিতান্তই অসম্ভব, তাহা নহে। কিন্তু তাহাতে সেই মুক্তপুরুষ পুনরায় সংসার বন্ধন প্রাপ্ত হন না, তাঁহার কোন প্রকার বাসনা না থাকায় সেই কর্ম্ম ও তাহার ফল তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না,—"হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে"—এই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস করিয়া ফেলিলেও তিনি কিছুই ধ্বংস করেন না, এবং সেই কর্ম্মের ফলেও তিনি আবদ্ধ হন না। এই সব কর্ম্মের ফলভোগের জন্য জীবন্মুক্ত পুরুষকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। এই হেতু তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষের কর্ম্ম 'অশুক্লাকৃষ্ণ' বলিয়া বর্ণিত হয়, তাহা শুক্ল অর্থাৎ পুণ্যজনক নয়, কৃষ্ণ অর্থাৎ পাপ-জনকও নয়। তাঁহার কর্ম্মের কর্ম্মত্বই নষ্ট হইয়া যায়। তিনি

কর্ম্ম করিয়াও অ-কর্ম্মা। গীতায় "কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ"—শ্লোকে শ্রীভগবান্ এই জাতীয় অশুক্লাকৃষ্ণ কর্ম্মের ইঙ্গিত করিয়াছেন।

অতএব ব্যাবহারিক জীবনের পার্থক্যমাত্র দর্শন করিয়াই মহাপুরুষদিগকে উন্নত বা অনুন্নত মনে করা অথবা তাঁহাদের শ্রেণীবিভাগ করা তত্ত্বদৃষ্টি-সম্মত নয়, কারণ—এ পার্থক্য বাহিরের মাত্র, ভিতরের নহে। তথাপি আন্তর লক্ষণের সহিত বাহ্যিক ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া যদি কেহ মহাপুরুষদিগের সম্বন্ধে কোনরূপ বিচার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি ইহাই সিদ্ধান্ত করিবেন যে, যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় ব্রহ্মভাবে ভাবিত, যাঁহার প্রেম সর্ব্বব্যাপী, যাঁহার শক্তি অপরিমিত ও সম্পূর্ণ স্ববশীভূত, এবং তৎসঙ্গে যাঁহার বৃত্তিসকল সম্যক্ সত্ত্বগুণোপেত, আপামর সাধারণ সকলের প্রতি যাঁহার ব্যবহার অতিশয় মধুর ও স্নিগ্ধ, যাঁহার ভাব সর্ব্বদা প্রশান্ত ও গম্ভীর, মত উদার, অসাম্প্রদায়িক ও সার্ব্বজনীন—জীবন্মুক্তের যেরূপ লক্ষণ উপনিষৎ, গীতা প্রভৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে সেই সকল লক্ষণের সহিত যাঁহার বৃত্তির সম্পূর্ণ মিল আছে,—তিনিই সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর মহাপুরুষ।

এইরূপ দৃষ্টিতে বাহ্যবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া বিচার করিলেও যোগিরাজ গম্ভীরনাথকে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর মহাপুরুষ বলিতে হয়। তিনি যেমন সর্ব্বাবস্থায় ব্রহ্মে স্থিত থাকিতেন, তাঁহার ভাব, আচার, ব্যবহার, কার্য্য প্রভৃতিও তেমনই অতি উৎকৃষ্ট ছিল।

তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় প্রশান্ত গম্ভীর নির্ম্মল মহাকাশের ন্যায় অবস্থান করিতেন। তাঁহার বাক্য, ব্যবহার ও কার্য্য কখন কাহারও কোনরূপ উদ্বেগের কারণ হইতে পারিত না। সকলের প্রতি তিনি সমদর্শী ছিলেন, এবং সকলের প্রতিই অতি সুমধুর ব্যবহার করিতেন। প্রত্যেকেই অনুভব করিত যে তাহাকে তিনি কতই ভালবাসেন। যাঁহারা একটু বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিতেন, তাঁহারাই বুঝিতেন যে তাঁহার ভালবাসার মধ্যে কোন তারতম্য ছিল না। তাঁহার একজন বিশিষ্ট ভক্ত ও সেবক বহুবৎসর অবিচ্ছেদে তাঁহার সঙ্গ ও সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে বলিতেন "আমি যে এত বৎসর বাবার কাছে আছি, আমার প্রতি তাঁহার যে ভাব, একটা কুকুরের প্রতিও তাঁহার সেই ভাব, কোন বৈষম্য নাই।"

তাঁহার প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে, বাক্যে ও ব্যবহারে সকলেই বিমোহিত হইয়া যাইত। ইতর প্রাণী এমন কি হিংস্র জন্তু-সকলও তাঁহার প্রেমে আপ্যায়িত হইয়া তাঁহার অনুগত হইয়া থাকিত। অথচ তাঁহার প্রেমে কোন প্রকার উদ্বেলতা ছিল না, তাঁহার আনন্দে কোন্ প্রকার চাঞ্চল্য ছিল না। একদিকে যেমন কেহ কখনও তাঁহার মুখে বিষাদ বা রুষ্ট ভাব দর্শন করে নাই, অন্যদিকে তেমনি কেহ তাঁহার উচ্চহাস্যও শ্রবণ করে নাই। হাস্য, নৃত্য, ক্রন্দন কি উচ্চ-কথন তাঁহার স্বভাবের বিপরীত ছিল। তাঁহার আচরণে তেজ ও দৃঢ়তা পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হইত; অথচ সে তেজে কোন উত্তাপ ছিল না, সে দৃঢ়তায় কোন

রুক্ষতা ছিল না—সমস্তই মাধুর্য্যে পর্য্যবসিত ছিল। তাঁহার মুখশ্রীতে প্রেম, আনন্দ, শান্তি, তেজ ও দৃঢ়তা অঙ্গাঙ্গি ভাবে বিরাজিত থাকিয়া মাধুর্য্যমণ্ডিত মূর্ত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রকাশ পাইত।

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিলে তিনি সাধারণতঃ কাহাকেও কোন তত্ত্বোপদেশও প্রদান করিতেন না। 'নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্ ব্রূয়াৎ'— এই নীতি যেন তাঁহার স্বভাবের অঙ্গীভূত ছিল। কাহারও প্রাণে কোন জিজ্ঞাসার উদয় হইলে এবং বাক্য দ্বারা তদনুরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে, তিনি সুন্দর সুস্পষ্ট যুক্তিযুক্ত ভাষায় অতি অল্প কথায় সদুত্তর প্রদান পূর্ব্বক তাহার সংশয় মিটাইয়া দিতেন। তাঁহার নিকট কেহ নিরর্থক প্রশ্ন উপস্থিত করিতেই সাহস করিত না, এবং করিলেও তাঁহার স্বাভাবিক মৌন ভঙ্গ করিতে পারিত না। কেহ না বুঝিয়া বার বার তদ্রূপ কোন প্রশ্ন করিলে, তিনি ধীর গম্ভীরস্বরে বলিতেন,— "ইহ্ ব্যর্থ প্রশ্ন হ্যায়।" তাঁহার প্রত্যেকটি উপদেশ সূত্রাকারে এক একটি সিদ্ধান্ত বাক্য। এক একটি উপদেশ বাক্য লইয়া যতই চিন্তা ও আলোচনা করা যায়, ততই তাহার ভিতর হইতে জীবন-নিয়মনের উপযোগী অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হয়। প্রশ্ন ও উত্তর জটিল হইলে মাঝে মাঝে তিনি ছোট ছোট গল্প দ্বারাও উপদিষ্ট বিষয় পরিষ্কার করিয়া দিতেন।

সাধন জীবন শেষ হইবার পরেও অনেক বৎসর তিনি কাহাকেও শিষ্যত্বে গ্রহণ করিতে রাজী হন নাই। নারদ-

পরিব্রাজক উপনিষদে মুমুক্ষু সাধক উপদিষ্ট হইয়াছেন,—

'ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্ নৈবাভ্যসেদ্ বহূন্।
ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ॥'

—বহু শিষ্য করিবে না, বহু গ্রন্থও অভ্যাস করিবে না, শাস্ত্র ব্যাখ্যাতেও নিযুক্ত হইবে না, নূতন কর্ম্মও আরম্ভ করিবে না। সাধনাবস্থায় ত তিনি এ নিয়ম পূর্ণমাত্রায়ই প্রতিপালন করিয়াছেন। তাহাই এরূপভাবে তাঁহার স্বভাবে পরিণত হইয়াছিল যে, সিদ্ধাবস্থাতেও তিনি তাহার অন্যথা করিতেন না।

তিনি আচরণে সনাতন ধর্ম্মের বিধি মানিয়া চলিতেন। বিধি-নিষেধের অতীত অবস্থায় বিরাজিত থাকিয়াও লোক-চক্ষুর সম্মুখে—লৌকিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে—তিনি শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের প্রতি কখনও উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন না। ইহার দ্বারাই তাঁহার লোকশিক্ষার দায়িত্ব-বোধ প্রকাশ পাইত।

তিনি যখন যেখানেই যাইতেন, যেখানেই থাকিতেন, তাঁহার ভাবের ও বৃত্তির কোন পরিবর্ত্তন ঘটিত না। প্রায় সর্ব্বদাই স্থিরাসনে উপবিষ্ট থাকিতেন, দৃষ্টি সর্ব্বদাই অন্তর্নিবদ্ধ থাকিত। যখন বিচরণ করিতে, কার্য্য করিতে বা উপদেশ দিতে হইত, তাহাও যেন তাঁহার অর্দ্ধসুপ্ত অবস্থায় আপনা আপনি সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে বোধ হইত। তিনি পরবর্ত্তীকালে শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতেন যে,—"কি হইয়াছে, কি হইতেছে বা কি হইবে, কোন কিছু হবে কি না হবে—এ সব বিষয়ে 'খেয়াল' করিবে না, বাহ্যিক কর্ম্ম ও সাধনভজন সকলই কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে

সম্পাদন করিয়া যাইবে মাত্র।" তাঁহার নিজের ব্যাবহারিক জীবনে এই ভাবের আদর্শ পরিস্ফুট ছিল। বাহিরের কোন প্রকার অবস্থাবিপর্য্যয়ে তাঁহার ভিতরের অবস্থার কোন বিপর্য্যয় ঘটিত না। সুখ দুঃখে, শীত গ্রীষ্মে, সিদ্ধি অসিদ্ধিতে, লাভ লোকসানে কেবলমাত্র তাঁহার আন্তর ভাবেরই যে কোন বৈলক্ষণ্য হইত না, তাহা নহে, তাঁহার বাহ্যিক ভাবেরও কোন বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইত না, তাঁহার মুখে চোখে কথায় বা কার্য্যে কোন প্রকার ভাবান্তর প্রকাশ পাইত না। তাঁহাকে যখন যেখানে যে অবস্থাতেই দর্শন করা যাইত, দেখিলে স্বতঃই মনে হইত যে তিনি যেন সর্ব্বদাই কোন্ ধ্যানলোকে, কোন্ সুদূর চিরপ্রশান্তির রাজ্যে নিরাবিল আনন্দে বিহার করিতেছেন, কেবলমাত্র ইহলোকের আকর্ষণে, প্রেমের টানে, জীব-হিতাকাঙ্ক্ষার প্রেরণায়, মাঝে মাঝে এখানে অবতরণ করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়া যাইতেছেন। বোধ হইত যেন, এই জগতের সহিত সম্বন্ধবিহীন হইয়া সর্ব্বদা সচ্চিদানন্দ সরোবরে রাজহংসের ন্যায় নির্ম্মুক্তভাবে বিচরণ করিতেছেন, এই বিশ্বের প্রাণহিল্লোলে তাঁহার প্রাণবায়ু আপনা আপনি স্পন্দিত হইতেছে, এবং জড়ের ঘাতপ্রতিঘাতে তাঁহার দেহ কিঞ্চিৎ ক্রিয়াশীল হইতেছে।

তাঁহার বাহিরের ক্রিয়া কি ভাবে সম্পাদিত হইত, দু' একটি সামান্য দৃষ্টান্তে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যাইতে পারে। সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার ধূমপানের অভ্যাস ছিল।

তাঁহার সিদ্ধাবস্থায় এই ধূমপান একটি দর্শনীয় ব্যাপার হইয়াছিল। তিনি অন্তর্নিহিতদৃষ্টি হইয়া নিজের ভাবে মগ্ন আছেন; সেবক তাঁহার চক্ষু কিঞ্চিৎ উন্মীলিত দেখিয়া তামাক সাজিয়া তাঁহার আসনের সম্মুখে রাখিয়া গেল; চোখ কতকটা খোলা বটে, কিন্তু সে খোলা চক্ষুতে দৃষ্টি কোথায়? দৃষ্টি যে আত্মনিবদ্ধ। তামাকের কলিকা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। কলিকাটি যেন কিয়ৎকাল তাঁহার স্পর্শানুগ্রহ লাভের আশায় সতৃষ্ণভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার আশা বৃথা হইল, অবশেষে হতাশ হইয়া সে শীতলত্ব প্রাপ্ত হইল। সেবকেরও ত তৃপ্তি নাই, সে তাঁহাকে তামাক সেবন করাইতে না পারিলে সেবার ত্রুটী রহিয়া গেল মনে করে। সে আর এক কলিকা সাজিয়া সমস্ত ঠিক্‌ঠাক্ করিয়া তাঁহার হাতের ভিতর পুরিয়া দিল। হাত অভ্যাসবশে কলিকাটি ধারণ করিল বটে, কিন্তু যিনি তামাক সেবন করিবেন, তিনি কোথায়? হাত ও মুখের দূরত্ব যে ঘুচাইয়া দিবে, সেই ইচ্ছা কোথায়? তাঁহার অন্তঃকরণের কার্য্য চলিতেছে কিনা সন্দেহ, চলিলেও এ জগতে নয়। কলিকা হাতে আছে, আগুন আবার নিবিয়া গেল, তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি নীরব নিস্পন্দভাবে যেমন ছিলেন, তেমনি রহিলেন। সেবক হাত হইতে কলিকাটি নামাইয়া লইল, সেদিকে খেয়াল নাই। কিন্তু তাঁহাকে ধূমপান করাইতেই হইবে। সেবক আর এক ছিলিম সাজিল, নিজেই কোন রকমে তাঁহার দৃষ্টি বাহিরে আকর্ষণ করিল এবং কলিকাটি

হাতে দিল। তিনি স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় একবার সেদিকে তাকাইলেন, অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় হাত মুখের নিকটে নিয়া তামাকে এক টান দিলেন। টান দিয়াই আবার ধ্যানস্থ। মুখের সন্নিকটে কলিকাটি হস্তবদ্ধ থাকিয়া অল্প অল্প ধূম উদ্‌গিরণ করিতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বশরীর স্থির, নিস্পন্দ। সেবক কিছুক্ষণ পরে কলিকাটি লইয়া গেল। এইরূপে ক্রমান্বয়ে তিন চারি ছিলিম তামাক দিয়া তাঁহার বহুকাল সঞ্চিত ধূমপানের অভ্যাসটি বজায় রাখা হইত।

সাধনাবস্থার পরে তিনি যখন যেখানে অবস্থান করিতেন, তাঁহার সঙ্গে প্রায়ই অনেক সাধু বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেক সময় বহির্মুখ, পরচ্ছিদ্রান্বেষী, কর্কশ-স্বভাব, কলহপ্রিয়, সাধুবেশধারী লোকও আসিয়া জুটিত। তাহারা মাঝে মাঝে নানা বাহ্য বিষয়ের আলোচনা করিত, অনাবশ্যক পরচর্চ্চায় সময় নষ্ট করিত, তর্ক বিতর্কে উন্মত্ত হইয়া কখন কখন কলহ, মারামারি, এমন কি রক্তপাত পর্য্যন্ত করিয়া ফেলিত। মহাপুরুষের সঙ্গের প্রভাব অতিক্রম করিয়াও তাহাদের স্বভাবের কলুষতা আত্মপ্রকাশ করিত। বাবা গম্ভীরনাথ এই সব অবস্থার মধ্যেও নির্ব্বিকার চিত্তে 'যথা পূর্ব্বং তথা পরং' ধ্যানাবিষ্টভাবে অবস্থান করিতেন। কাহাকেও কিছু বলিতেন না, কোনরূপ শক্তি প্রকাশও করিতেন না, তাহাদের সঙ্গ বর্জ্জনও করিতেন না। প্রবল প্রারব্ধ কিয়ৎ পরিমাণ ভোগ ব্যতীত ক্ষয় হয় না, প্রবল চিত্তবৃত্তি কার্য্যে কতকটা প্রকাশিত

না হইলে শান্ত হয় না, হৃদয়ে প্রজ্বলিত অশুভ ভাবের দাবানল কতক পরিমাণে শিখা ও ধূমরূপে আত্মপ্রকাশ না করিয়া ও কতক পরিমাণে ধ্বংসলীলা সমাধা না করিয়া নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত হয় না ;—হয়ত এই নীতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই তিনি তাহাদের ভিতরের তামস ভাব কতক পরিমাণে বাহিরে আসিতে দিতেন ; সম্ভবতঃ ইহাতে পরিণামে তাহাদের কল্যাণই হইত এবং ইহার মধ্য দিয়াই মহাপুরুষের সঙ্গের প্রভাব তাহাদের উপর কার্য্য করিত। যাহা হউক, কার্য্যতঃ দেখা যাইত যে তাঁহার নিকটে একটা নিতান্ত অশোভন ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, অথচ তিনি উদাসীন, নীরব, নিস্পন্দ, জড়ের ন্যায় অবস্থিত। তাহাদের তামস ভাব কতকটা বাহির হইয়া গেলে, স্বাভাবিক নিয়মে তাহাদের চিত্ত কতকটা শান্ত হইয়া আসিত, তখন অনেক সময় উভয় পক্ষই মীমাংসার জন্য সমীপবর্ত্তী প্রশান্তমূর্ত্তি মৌনবান্ ধ্যানলোকবিহারী মহাপুরুষের শরণাপন্ন হইত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত উত্তেজিত ভাবে তাহারা নিজ নিজ পক্ষের বক্তব্য বলিতে থাকিত, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি তেমনি সমাহিত ভাবেই অবস্থান করিতেন, মুখে চোখে কোন ভাবান্তর নাই, কোন কথা তাঁহার নিকট পৌঁছিতেছে কিনা, তাহাও বুঝা শক্ত। যখন তাহাদের সব কথা বলা শেষ হইয়া গেল, বলিতে বলিতেই যখন উত্তেজনাও অনেকটা উপশমিত হইল, সেই অনুপম গম্ভীরমূর্ত্তির নিকট হৃদয় লজ্জাবনত হইয়া পড়িল, তখন তিনি একবার হয়ত

বলিলেন 'আচ্ছা নেহি' অথবা 'সাধু লোগোঁকা য়ৈসা কাম আচ্ছা নেহি', কিংবা এই জাতীয় আর এক আধটা কথায় বা ইঙ্গিতে তাহাদের বিবাদের বিষয়টি সম্বন্ধে একটি মীমাংসার পথ প্রদর্শন করিয়া দিলেন। তৎপরেই আবার ধ্যানস্থ। এই সামান্য ইঙ্গিতেই অধিকাংশ স্থলে তাহাদের কলহের মীমাংসা হইয়া যাইত, এবং পরস্পরের প্রতি বিদ্বিষ্ট ভাব বিনষ্ট হইত।

এইরূপে সমাধি ও সংসারের মধ্যস্থলে অবস্থান পূর্ব্বক বাবা গম্ভীরনাথ লৌকিক জগতে প্রেম-পূর্ণ ব্যবহার চালাইতে এবং লোকসমাজকে পরিপূর্ণতা লাভের পথে সাহায্য করিতে ব্রতী হইলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী জীবন এই ভাবেই নিয়ন্ত্রিত হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

সাধনান্তে গয়ায় অবস্থান এবং মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও তাঁহার শিষ্যদের সহিত পরিচয়
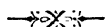
সাধন দ্বারা মানবজীবনের চরম সার্থকতা সম্পাদন করিবার পর এবং প্রকাশ্যভাবে লোকগুরুর আসন গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ব্রহ্মানন্দে বিভোর যোগিরাজ বাবা গম্ভীরনাথ গয়াক্ষেত্রেই প্রায় ৯।১০ বৎসর আপনার নির্দ্দিষ্ট স্থান রক্ষা করিয়াছিলেন। কেবল মাত্র মাঝে মাঝে বিশেষ পুণ্য যোগাদি উপলক্ষ করিয়া শাস্ত্র ও সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনার্থ তিনি নির্দ্দিষ্ট আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুর জমাৎসহ তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইতেন। গয়ায় অবস্থান কালে ১২৯০ বঙ্গাব্দে মহাত্মা বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহার দর্শন লাভ করেন। গোস্বামী মহাশয়ের সহিত পরিচয়ে বাবাজীর ভবিষ্যৎ জীবনের একটি বিশেষ দিকের সূত্রপাত হয়। উত্তরকালে যে সমাধি-নিমজ্জনশীল যোগিরাজ তাঁহার সমাধির অতলগর্ভ হইতে কতক পরিমাণে উত্থিত হইয়া লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে আত্মপ্রকট করিয়াছিলেন, এবং বঙ্গদেশীয় বহুসংখ্যক ধর্ম্মপিপাসু নরনারী যে তাঁহাকে গুরুপদে বরণ পূর্ব্বক তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মাচার্য্য গোস্বামী মহাশয়ের নিকট তাঁহার আত্মপ্রকাশের ভিতর দিয়াই

এ ব্যাপারের সূত্রপাত হইয়াছিল। গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্ম সমাজের পদ্ধতি অনুসারে সাধন ভজন দ্বারা যথাসম্ভব আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিয়াও যখন প্রাণে পরাশান্তি অনুভব করিতেছিলেন না, তখন আরও গভীরতর সাধ্য-সাধন-রহস্য অবগত হইবার উদ্দেশ্যে তিনি তত্ত্বজ্ঞানী সাধুমহাপুরুষের অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই অবস্থায় তিনি গয়াধামে গমন করেন এবং সদ্‌গুরুর অন্বেষণে ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশগঙ্গা পাহাড়ের উপরে অপ্রত্যাশিত ভাবে মানস সরোবরের এক সম্যক্‌সিদ্ধ পরমহংসের দর্শন ও কৃপালাভ করিয়া কৃতার্থ হন, এবং আকাশগঙ্গা পাহাড়ের সানুদেশে এক আশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক গভীর অন্তরঙ্গ সাধনে আত্মনিয়োগ করেন।

দীক্ষালাভের কিছুকাল পরেই গোস্বামী মহাশয় যোগিরাজ গম্ভীরনাথজীর দর্শন লাভ করেন। সদ্‌গুরু-কৃপা-প্রাপ্ত অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধক বিজয়কৃষ্ণ বাবা গম্ভীরনাথের আধ্যাত্মিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক স্বীয় অসাধারণ প্রজ্ঞাবলে তাঁহার মহিমা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রতি একান্তভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন, এবং বাবা গম্ভীরনাথও এরূপ প্রেমিক ভক্ত ও উচ্চাধিকারী সাধকের প্রতি বিশেষ স্নেহশীল হন। তদবধি অনেক সময় গোস্বামী মহাশয় বাবাজীর নিকট যাতায়াত করিতেন। তিনি প্রাণের টানে কখনও সংগোপনে গভীর নিশীথে কখনও বা দিবাভাগে বাবাজীর সঙ্গলাভের জন্য ছুটিয়া যাইতেন। উভয়ের মধ্যে একটি গভীর প্রেমের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

গোস্বামী মহাশয় সদ্‌গুরুর কৃপা প্রাপ্ত হইয়া উচ্চাঙ্গের সাধনা দ্বারা সত্যগৃহে প্রবেশলাভ করিবার পূর্ব্বেই একজন অত্যুন্নত সাধক ও ধর্ম্মাচার্য্য বলিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। বহুসংখ্যক সুশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তি তাঁহার ভক্তি ও প্রেম দর্শনে মুগ্ধ হইয়া এবং তাঁহার উপদেশের গভীরতায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ লাভ করিবার জন্য যাতায়াত করিতেন। সদ্‌গুরুর কৃপালাভের পর তিনি অনেক ধর্ম্মপিপাসুকে দীক্ষাপ্রদান পূর্ব্বক শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। তিনি নিজের শিষ্যদের নিকট বাবা গম্ভীর নাথের মহিমা কীর্ত্তন করিতেন, এবং তাহাদিগকে তাহার সঙ্গ করিতে উপদেশ দিতেন। অনেককে তিনি নিজে একাধিক বার বাবাজীর নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয় ও তাঁহার শিষ্যদের নিকটই বাঙ্গালীসমাজ বাবা গম্ভীরনাথের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হয়। গোস্বামী মহাশয় তাঁহার অনেক শিষ্যের নিকট বলিয়াছেন যে 'বাবা গম্ভীরনাথের ন্যায় মহাত্মা হিমালয়ের নীচে আর দেখা যায় না।' গোস্বামী মহাশয়ের বিশিষ্ট সেবক ও শিষ্য শ্রদ্ধা-ভাজন শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার কয়েক জন শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা ও বাবাজীর কয়েকজন শিষ্যের সাক্ষ্য সংগ্রহ করিয়া বাবাজীর সম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহা হইতে বাবাজীর গয়ায় অবস্থান কালের ও তৎপরবর্ত্তী সময়ের কিছু কিছু ঘটনা অবগত হওয়া যায়।

✓গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নব কুমার বিশ্বাস মহাশয় বলিয়াছেন,—"যেবার আমি আকাশগঙ্গা পাহাড়ে গোঁসাইজীর নিকট দীক্ষা পাই, সেবার গোঁসাই একদিন বলিলেন, 'চলুন, বাবা গম্ভীরনাথকে দর্শন করিয়া আসি।' গোঁসাইজীর সহিত আমি ও বর্দ্ধমানের বাবাজী স্বামী দেবপ্রতিপালক চলিলাম। আমরা আশ্রমে গেলে গম্ভীরনাথজী খবর পাইয়া আমাদিগকে দর্শন দিলেন। গোঁসাইয়ের সহিত দুই একটী কথা হইবার পর, গোঁসাই বলিলেন 'বাবা, দয়া করিয়া কিছু ধর্ম্মোপদেশ দিন।' বাবা বলিলেন 'আমি কিছুই জানি না। তবে যদি ইচ্ছা হয়, আমি যাহা করি, আমার ভজন গৃহে গিয়া ইঁহারা দর্শন করিয়া আসিতে পারেন।' ইহা শুনিয়া আমি ও বর্দ্ধমানের বাবাজী বাবার ভজন কুটীরে প্রবেশ করিলাম। * * দর্শন করিয়া বাহিরে আসিলাম। পুনরায় বাবাকে অনুরোধ করিলাম 'বাবা, কিছু ধর্ম্মোপদেশ দিন।' বাবা তদুত্তরে বলিলেন 'হাম্ সাচ্ বল্‌তা, হাম্ কুছ্ নেই জান্‌তা'।"*

কেনোপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—"যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্। **যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।"—যদি মনে কর যে তুমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে বিদিত হইয়াছ, তবে বস্তুতঃ তুমি তাঁহার স্বরূপ অল্পই জানিয়াছ। যিনি জানেন যে ব্রহ্ম তাঁহার জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহেন, তাঁহার জানাই বস্তুতঃ ঠিক, এবং যিনি মনে করেন যে 'আমি ব্রহ্মকে

* মহাত্মা বাবা গম্ভীরনাথজী ৩ পৃষ্ঠা।

জানি,' তিনি বস্তুতঃ কিছুই জানেন না। কর্তৃত্বাভিমান এবং ভোক্তৃত্বাভিমান অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর যে এই জ্ঞাতৃত্বাভিমান, তাহা হইতেও মুক্তিলাভ করা আবশ্যক। নচেৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। অহংকার বিনষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত অবাঙ্মনসগোচর ও সর্ব্বজ্ঞানাশ্রয় ব্রহ্ম উপলব্ধি গোচর হন না। ব্রহ্মসমাহিত-চিত্ত অহং-লেশ-শূন্য যোগিরাজ গম্ভীরনাথ বোধ হয় উপনিষদুক্ত এই ভাবের অনুভূতি হইতেই বলিয়াছিলেন 'হাম্ সাচ্ বল্‌তা, হাম্ কুছ্ নেই জান্‌তা।' উপদেশ-প্রার্থিগণ সুশিক্ষিত (বা শিক্ষাভিমানী) বাঙ্গালী, তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মোপদেষ্টাগণের নিকট হইতে অনেক ধর্ম্মোপদেশ শিখিয়াছেন এবং নিজেরাও অনেক ধর্ম্মোপদেশ দিতে পারেন। সুতরাং অন্য ধর্ম্মোপদেশ অপেক্ষা বাবাজীর এই বিনয়মণ্ডিত বাক্যটুকু সম্ভবতঃ তাঁহাদিগের নিকট অধিকতর শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল; তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ হইলে ভাব কিরূপ হয়, তাহার পরিচয় পাইয়া সম্ভবতঃ তাঁহাদের জ্ঞানাভিমান চূর্ণ হইয়াছিল, এবং অভিমান বর্জ্জনই যে ধর্ম্মের ভিত্তি, তাহা তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

বিশ্বাস মহাশয় আরো বলিয়াছেন যে "অতঃপর বাবা আমাদের প্রত্যেককে এক এক খানা 'বজরংকা রোট' (এক রকম খাজা বিশেষ) এবং দশ বারটী উৎকৃষ্ট গুজরাটী এলাচী খাইতে দিলেন। আমরা ঐ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আশ্রমে ফিরিলাম। আশ্রমে ফিরিলে গোঁসাইজী এক সময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দেখুন, বাবা গম্ভীরনাথজী যে এলাচী দিয়াছিলেন, তাহার কি

কিছু আছে ?' আমি বলিলাম, 'না—নাই, সব খেয়ে ফেলেছি'। গোঁসাই বলিলেন 'মহাপুরুষের দান যত্নে রেখে দিয়ে মাঝে মাঝে খেতে হয়'।"*

বাবাজী অতি সুন্দর সেতার বাজাইতে পারিতেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বেই তিনি সেতার বাজান অভ্যাস করিয়াছিলেন। সেতারের সঙ্গীত তাঁহার অতিপ্রিয় ছিল এবং বরাবরই তাঁহার সঙ্গে একটি সেতার থাকিত। কখন কখন পর্য্যটনের সময়ও তিনি একটি সেতার সঙ্গে লইয়া যাইতেন। তাঁহার কপিলধারায় অবস্থান কালে অনেক দিন গভীররাত্রে সেখানে সেতারের মনোহর সঙ্গীত শোনা যাইত। সেতারে সুর দিয়া তিনি তন্ময় হইয়া যাইতেন। অঙ্গুলি আপনা আপনি তারের উপর দিয়া সঞ্চালিত হইতে থাকিত। সেই বাদ্য যে শুনিয়াছে, সেই মুগ্ধ হইয়াছে। গোঁসাইজী বলিয়াছেন যে, তিনি যখন আকাশগঙ্গা পাহাড়ে থাকিতেন, তখন অনেক সময় গভীররাত্রে বাবা গম্ভীরনাথের সেতারের ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করা মাত্র তিনি আত্মহারা হইয়া বাবাজীর নিকট ছুটিয়া যাইতেন। গোঁসাইজীর ভক্ত-শিষ্য বিশ্বাস মহাশয় বলিয়াছেন, 'আকাশগঙ্গার আশ্রমে আমরা শয়ন করিয়া আছি; সমস্ত নিস্তব্ধ, নীরব, জ্যোৎস্নার রাত্রি। মাঝে মাঝে শুনিতে পাইতাম, কে পাহাড়ের শৃঙ্গে একটা দুইটার সময় সেতার বাজাইয়া ভজন করিতেছেন। গোঁসাই আমাদিগকে বলিতেন "ঐ শুনুন, বাবা

---

* মহাত্মা বাবা গম্ভীরনাথজী ৪ পৃষ্ঠা।

গম্ভীরনাথ কি মিষ্ট ভজন করিতেছেন। কোন কোন দিন ঐ ভজন শুনিয়া, তিনি একাকী নিশীথ সময়ে ছুটিয়া চলিয়া যাইতেন। দুই এক ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিতেন। একদিন ঠাকুর বলিলেন "বাবা বড় প্রেমিক, এবং খুব শক্তিসপন্ন মহাত্মা, হিমালয়ের নীচে এরূপ আর দেখা যায় না। পাহাড়ে কত বাঘ, সাপ, হিংস্রজন্তু রহিয়াছে; বাবার শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া কেহই ইঁহার অনিষ্ট করে না। বাবা এইরূপ নিশীথ সময়ে সেতার বাজাইয়া ভজন করিতে করিতে পাহাড়ের এক শৃঙ্গ হইতে অপর শৃঙ্গে চলিয়া যাইতেন।"*

গোস্বামীদেবের অন্যতম শিষ্য শ্রদ্ধাস্পদ মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয় লিখিয়াছেন,—"শ্বাপদ সঙ্কুল গয়ার পাহাড়ে কপিল ধারার শৃঙ্গে বসিয়া গম্ভীরনাথজী গভীর রাত্রে সেতার বাজাইয়া ভজন করিতেন; আর আকাশগঙ্গার পাহাড় হইতে গোঁসাইজী সঙ্গিগণকে ফেলিয়া বন-জঙ্গল কাঁটা-কাঁকর অগ্রাহ্য করিয়া উন্মত্ত মনে ছুটিয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন। এ কিসের প্রেম! কিসের টান! কোন্ প্রেমে ইঁহারা বাঁধা পড়িয়াছেন? এ বন্ধনের সূত্র কোথায়? কোন্ মালাকার মাঝখানে আসিয়া দুইটী হৃদয় এমন করিয়া বাঁধিয়াছেন? এই পুণ্যকাহিনী শুনিলেও জীবের ধর্ম্ম হয়, পলকের জন্য হৃদয় বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়। টাকা নয়, কড়ি নয়, মান-মর্য্যাদার বা রক্তমাংসের সম্পর্ক নাই; কিসের সম্পর্ক মানুষকে এতদূর উন্মত্ত করে? যিনি ভগবান্‌কে ভালবাসেন, ভক্ত তাঁহার

---

* মহাত্মা বাবা গম্ভীরনাথজী—৪ পৃষ্ঠা।

প্রাণের প্রাণ হইবেনই হইবেন; আর যাঁহারা ভক্তকে ভালবাসেন না, ভগবানের প্রতি তাঁহাদের প্রেম কখনও সম্ভবে না। এই যে ভক্তে ভক্তে কোলাকুলি, ইহার মধ্যেই ভগবানের সাক্ষাৎ প্রকাশ।" *

বাবাজীর কপিলধারায় অবস্থান কালে সেস্থান হইতে অল্প-দূরবর্ত্তী বরাবর পাহাড়ে নাথ সম্প্রদায়ের আরও দুই জন সাধক অবস্থান করিতেন। বাবাজী নিজে বলিয়াছেন যে তাঁহারা দুই ভাই, উভয়েই অওঘর, এবং উভয়েই অধ্যাত্মরাজ্যে খুব উন্নত সোপানে অধিরূঢ় ছিলেন। বাবাজীর জীবিতাবস্থাতেই তাঁহাদের উভয়ের দেহান্ত ঘটে। বাবাজীর সহিত তাঁহাদের বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। তাঁহারা মাঝে মাঝে কপিলধারায় আসিয়া বাবাজীর সহিত মিলিত হইতেন এবং বাবাজীও কখন কখন বরাবর পাহাড়ে গিয়া তাঁহাদের সহিত যুক্ত হইতেন। ধনিয়া পাহাড়ের মহাত্মা বাবা ঠাকুরদাসজীও তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি নানকপন্থী উদাসী-সম্প্রদায় ভুক্ত। তিনিও কিছু দিন পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই চারিজন মহাপুরুষ কখন কখন একত্র বসিয়া সাধনে নিবিষ্ট থাকিতেন। যদিও তাঁহাদের সাধন-পদ্ধতি পৃথক্ ছিল, তথাপি বিভিন্ন মার্গ অবলম্বন করিয়াও তাঁহারা এমন এক অবস্থায় উপনীত হইয়া ছিলেন, যে অবস্থায় সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ মাত্রও থাকিতে পারে না, সমস্ত পার্থক্য একত্বে বিলীন হইয়া যায়।

---

* মহাত্মা বাবা গম্ভীরনাথজী—২৯ পৃষ্ঠা।

তাঁহার লৌকিক ব্যবহারে কয়েকটি নিয়ম লক্ষিত হইত। তিনি লোকের সহিত ব্যবহারে কখন যোগৈশ্বর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেন না, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং ইহার তাৎপর্য্যও আলোচনা করা হইয়াছে। সন্ন্যাসের আদর্শ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে, তিনি কোন গৃহস্থের বাড়ীতে গমন করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। রাজ দর্শন এবং রাজা বা জমিদারদের দান-গ্রহণও তাঁহার ব্যাবহারিক জীবনে নীতি বহির্ভূত ছিল। তিনি সাধারণতঃ শ্রদ্ধাবান্ দরিদ্র ব্যক্তিদেরই সেবা গ্রহণ করিতেন। আশ্রমে অবস্থিতি কালে আশ্রমের নিয়ম পালন, অতিথি সেবা প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। এ বিষয়ে তিনি গৃহস্থদেরও আদর্শ ছিলেন। আশ্রম সংক্রান্ত কোন কর্ত্তব্য উপস্থিত হইলে অথবা কোন অতিথি আশ্রমে সমাগত হইলে, তিনি আশ্রমীদিগকে দু এক কথায় তৎসম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ উপদেশ প্রদান করিতেন। কখন যে তিনি ইহা লক্ষ্য করিতেন বা ভাবিতেন, তাহা বুঝা যাইত না। তিনি তাঁহার স্বাভাবিক ধ্যানস্থ অবস্থায় স্বীয় আসনে উপবিষ্ট, দুই চারিজন সাধু বা ভক্ত নিকটে বসিয়া আছেন; হঠাৎ চক্ষু ঈষদুন্মীলিত করিয়া একটী বা দুইটী কথায় কাহাকেও কোন কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া আবার আত্মস্থ হইলেন; এইরূপ মাঝে মাঝে দেখা যাইত।

গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুত বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল্, গয়ায় ওকালতি করিতেন এবং বাবাজীর সঙ্গ করিবার জন্য প্রায়ই তাঁহার নিকট গমন করিতেন। তিনি

লিখিয়াছেন,—“বাবা অসীম ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁহার যথেষ্ট যোগৈশ্বর্য্য থাকিলেও তাহার কোন পরিচয় দিতেন না। নিজকে অত্যন্ত গোপনে রাখিতেন। তাঁহার চাল চলন দেখিয়া কেহই মনে করিতে পারিত না যে, তিনি এত বড় যোগৈশ্বর্য্যশালী মহাপুরুষ ছিলেন। এই বিষয়ে ৩।৪টী ঘটনা আমি নিজেও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বহু লোক তাঁহার নিকট ঔষধাদির জন্য উপস্থিত হইত। একবার গয়ায় সর্ব্বপ্রধান লক্ষপতি উকীল হরিহর নাথের একমাত্র পুত্র মৃত্যুশয্যায়। তাহার পিতা ‘বাবা’কে একবার বাড়ী নেওয়াইবার জন্য,—অগত্যা কিছু ঔষধ আশীর্ব্বাদ বা পদ ধূলির জন্য বাবাকে অনুরোধ করিতে আমার নিকট লোক পাঠান। আমি কখনও এই সব বিষয়ে কোন মহাপুরুষের নিকট ইতিপূর্ব্বে কোন প্রার্থনা করি নাই; কিন্তু একমাত্র পুত্র মৃত্যু শয্যায় তিনি বারংবার অনুরোধ করাতে, অগত্যা বাবাকে অতি বিনীত ভাবে এ সমস্ত কথা জানাইলাম। বাবা বাড়ী যাইতে অস্বীকার করিলেন; অগত্যা পদধূলির প্রার্থনা জানাইলে, সম্মত হইলেন। তখন কিছু ধূলি লইয়া তাঁহার পায়ে মাখিয়া উকীল বাবুকে দিলাম। আশীর্ব্বাদের ভিক্ষা জানাইলে বলিলেন,—“হাঁ, ক্লেশ দূর হো যায় গা। ২।৩ রোজমে শান্তি হোগা, আচ্ছা হো যায় গা।” শুনিয়াই আমার মনে খটকা লাগিল। বলা বাহুল্য—তিন দিনের মধ্যেই রোগীর পরা শান্তি লাভ হইল। বাবার চরণ ধূলিও আশীর্ব্বাদ প্রভাবে ভোগ কমিয়া গেল, নচেৎ আরও কতকাল ভুগিত কে বলিবে?”*

---

* মহাত্মা বাবা গম্ভীরনাথজী—১৯ পৃষ্ঠা

একবার তাঁহার একজন গৃহস্থ শিষ্য ও ভক্ত প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া এবং কায়মনে পরিশ্রম করিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। উক্ত শিষ্য বহু বৎসর যাবৎ শুনিয়া আসিতেছেন যে গুরুদেবের অপরিসীম যোগৈশ্বর্য্য আছে, অথচ সাধারণতঃ যোগৈশ্বর্য্য বলিতে যাহা বুঝা যায়, একদিনও গুরুদেব তাঁহার বা অন্য কাহারও নিকট তৎসম্বন্ধে কোন বিশেষ পরিচয় প্রদান করেন নাই। তাঁহার মনে একটি তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মিল যে গুরুদেবের কিঞ্চিৎ যোগৈশ্বর্য্য দর্শন করেন। এক দিন অবসর বুঝিয়া তিনি গুরুদেবের নিকট বিনীত ভাবে, অথচ সন্তানোচিত আবদারের সহিত স্বীয় প্রার্থনা নিবেদন করিলেন। বাবাজী শিষ্যের মানসিক ভাব বুঝিয়া তাঁহার প্রার্থনার উত্তরে মৃদুগম্ভীর স্বরে কেবলমাত্র একটি আখ্যায়িকা বিবৃত করিলেন। যোগিগুরু গোরক্ষনাথ যখন যোগসাধনায় নিমগ্ন ছিলেন, সেই সময় এক ব্রাহ্মণ তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইয়া বহু বৎসর যাবৎ প্রতিদিন তাঁহাকে পায়সান্ন ভোজন করাইয়াছিলেন। গোরক্ষনাথজী ব্রাহ্মণের সেবায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। সেই ব্রাহ্মণের বাসনা জন্মিয়াছিল যে, নাথজীর কিছু যোগৈশ্বর্য্য দর্শন করেন। নাথজীকে সেবায় সন্তুষ্ট জানিয়া তিনি স্বীয় কৌতূহলের বশে একদিন আপনার মনোগত প্রার্থনা প্রকাশ্যে জ্ঞাপন করিলেন। যোগিগুরু সেবক-বৎসল গোরক্ষনাথজী সেবকের অভিমান চূর্ণ করিয়া তাঁহাকে সেবাপরাধ হইতে মুক্ত করিবার জন্য, প্রথমাবধি যত পায়সান্ন গ্রহণ করিয়া ছিলেন, তাহা বমন পূর্ব্বক দুগ্ধ ও তণ্ডুল

পৃথক্ পৃথক্ রাখিয়া দিলেন। আখ্যায়িকাটী শুনিতে শুনিতে গুরুদেবের প্রচ্ছন্ন, অথচ সুতীক্ষ্ণ, ভর্ৎসনা ও শাসন বুঝিতে পারিয়া শিষ্য লজ্জায় ও আত্মগ্লানিতে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। সেবা করিয়া তাহার বিনিময়ে কিছু প্রার্থনা করিলে যে কিরূপ ভয়ঙ্কর অপরাধ হয়, তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। যদিও বিনিময়ের কথা মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার মনে উদিত হয় নাই, এবং সেবা দ্বারা তাঁহার কোন বিশেষ দাবী জন্মিয়াছে, সজ্ঞানে এরূপ বিচার করিয়াও তিনি প্রার্থনা জানান নাই, তথাপি প্রচ্ছন্নভাবে এরূপ অভিমান তাঁহার মনের অন্তরালে থাকা অসম্ভব নয়। তিনি গুরুদেবকে নিজের কৈফিয়ৎ জানাইয়া, তাঁহার চরণ ধারণ পূর্ব্বক কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। বাবাজী অবশ্য তাঁহাকে পূর্ব্বেই ক্ষমা করিয়াছিলেন, কেবল শিষ্যকে শিক্ষা দিবার জন্যই উক্ত উপদেশপূর্ণ আখ্যায়িকা বর্ণন করিলেন। তৎপরে দুই একটি স্নেহমাখা মধুর বাক্যে শিষ্যকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন যে, তুমি ইচ্ছা করিয়া অবশ্যই সেবার প্রতিদানে বা সেবাজনিত বিশেষ অধিকারের অভিমানে এই প্রার্থনা কর নাই; তবে ভবিষ্যতেও কখন এরূপ বুদ্ধি না হয়, তজ্জন্যই সাবধান করা হইল; যোগৈশ্বর্য্য দর্শনের বাসনাও মনে পোষণ করা উচিত নয়।

গোরক্ষনাথজী অবশ্য ধর্ম্ম প্রচারার্থ অনেকস্থলে যোগৈশ্বর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে কিংবদন্তী-সকল নানাপ্রকার অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। উক্ত আখ্যা-

য়িকাতেও এক দিকে যেমন সেবকের শাসন ও শিক্ষা হইল, অন্যদিকে বহু বৎসর ধরিয়া যে অন্ন গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহা বমন করিয়া দুগ্ধ ও তণ্ডুল বিভাগ করিয়া দেওয়ায় যোগশক্তির প্রকাশও যথেষ্টই হইল। কিন্তু বাবা গম্ভীরনাথজী এরূপভাবেও কোন যোগশক্তি প্রকাশ করেন নাই। তবে, সাধারণ ঘটনার মধ্যে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির নিকটে মাঝে মাঝে কিছু অসাধারণত্ব প্রকাশ পাইত। তদ্‌ব্যতীত, অনেক শিষ্যের অধ্যাত্ম জীবনের অনেক গুহ্য ব্যাপারেই, তাঁহার অলৌকিক যোগশক্তি বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে ও পাইতেছে, কিন্তু তাহা প্রকাশ্য ভাবে এখানে আলোচনার বিষয় নহে।

শ্রদ্ধেয় বরদা বাবু লিখিয়াছেন "একদিন আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল, তাঁহার সেতার বাজনা শুনি; প্রাতে উঠিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, দেখি, তিনি খাটুলীর উপর বসিয়া একটি সেতার আনাইলেন ও বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। অতিদক্ষ বাদকের মত এমনই সুন্দর বাজাইলেন যে, আমি মুগ্ধ ও আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। তিনি আমার মনের কথা বুঝিয়া যে আমার বাসনা পূর্ণ করিলেন, তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বাসায় ফিরিলাম। এই প্রসঙ্গে আর একদিনের একটী ঘটনা বিবৃত করিতেছি। আমি শুনিয়াছিলাম বাবা বড় ভাল চা প্রস্তুত করেন। একদিন প্রত্যূষে বাবার নিকট চা খাইবার জন্য উপস্থিত হইয়া আসন গ্রহণ করিলাম, কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিলাম না। আশ্রমে

তখন চা হইত না ; কিন্তু আমি বসিবার পরই বাবা জল গরম করিয়া চা প্রস্তুত করিতে বলিলেন, এবং প্রস্তুত হইলে জনৈক সেবককে বলিলেন—'বাবুকো লা দেও'। সেবক পিতলের গ্লাসে চা আনিলে বাবা বলিলেন—'নেহি,— লে যাও,—পাথল্‌কা গ্লাস্‌মে লা দেও।' এই কথাটি এই জন্য বলিলাম যে মহাপুরুষগণ অতি সাধারণ গৃহী লোকদিগেরও মর্য্যাদা যে কি ভাবে রক্ষা করেন, তাহা দেখিবার ও শিখিবার জিনিষ। চা পানের পর তিনি সেবক দ্বারা স্থান পরিষ্কার করাইলেন—আমাকে হাত ধুইতে ও উঠিতে দিলেন না।"*

অতিথিসেবা, ভক্তের আকাঙ্ক্ষা পূরণ, প্রভৃতি উপলক্ষে এরূপ ছোট খাট ব্যাপার অনেকেই দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এসব ব্যাপারও এমন স্বাভাবিকভাবে তিনি সম্পাদন করিতেন, যাহাতে একথা মনেই করা যাইত না যে ইচ্ছা পূর্ব্বক তিনি বিন্দুমাত্রও যোগশক্তির ব্যবহার করিতেছেন। একজন উচ্চ-কুলোদ্ভব ও উচ্চ শিক্ষিত বিশিষ্ট ব্যক্তি যখন কোন কল্যাণকর উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত আত্মপরিচয় গোপন করিয়া নিম্ন জাতীয় অশিক্ষিত গ্রাম্যলোকদের সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপন পূর্ব্বক সমানভাবে মিলিত হইতে চেষ্টা করেন, তখন তিনি স্বেচ্ছায় ও সবিচারে তাহাদেরই মত সহজ সরল গ্রাম্য-ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতে ও গ্রাম্যভাবে আচার ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেও, যেমন মাঝে মাঝে তাঁহার আলাপ আলোচনা ও আচার-

*মহাত্মা বাবা গম্ভীরনাথজী—১৭ পৃষ্ঠা

ব্যবহারের মধ্যে অলক্ষিতে ও অনিচ্ছায় তাঁহার উচ্চ বংশ ও উচ্চ শিক্ষার অনুযায়ী সুসংস্কৃত ভাষা ও ভাব আপনা আপনি ব্যক্ত হইয়া পড়ে, এবং তিনি যেমন তদবস্থায় স্বরূপ প্রকাশ-দ্বারা তাহাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া পড়িবার আশঙ্কায় সময়ানুরূপ কথা ও কার্য্য দ্বারা তাহা আবার ঢাকিয়া ফেলিতে যত্নবান্ হন ; তেমনই একজন সর্ব্বদর্শী, সত্যসংকল্প, যোগৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন, ব্রহ্মলোকবিহারী মহাপুরুষ যখন সাধারণ অবিদ্যাগ্রস্ত স্থূলবুদ্ধি মনুষ্যদের প্রতি প্রেমে ও করুণায় বিগলিত হইয়া তাহাদিগকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের সহিত সমান ব্যবহারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি আপনার সর্ব্বদর্শিত্ব, সত্যসংকল্পত্ব, প্রভৃতি গুণ ও শক্তি সম্পূর্ণরূপে গোপন করিয়া চলিলেও মাঝে মাঝে অলক্ষিতে ও অনিচ্ছায় এসব সম্পদের আভাস সামান্য সামান্য আকারে আপনা আপনিই তাঁহার বাক্যালাপ ও কার্য্যকলাপের মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়া পড়ে, এবং কেহ তৎসম্বন্ধে কোন কৌতূহল প্রকাশ করিলে, পাছে তাঁহারা তাঁহাকে দেবতার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কেবলমাত্র পূজা দিয়া তাঁহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া পড়ে ও পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়, এই ভয়ে তিনি তাহাদের বুদ্ধি-গ্রাহ্য লৌকিক ভাষা ও ভাব আশ্রয় করিয়া পুনরায় তাহা সংগোপন করিতে যত্নবান্ হইয়া থাকেন। শ্রীশ্রীযোগিরাজ গম্ভীরনাথের ব্যাবহারিক জীবন দেখিয়া সাধারণ দৃষ্টিতে এরূপই অনুমান হইত।

আদর্শসন্ন্যাসী বাবা গম্ভীরনাথ সংসারীর গৃহে গমন করিতে সর্ব্বদা কুণ্ঠিত ছিলেন, ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার অনুগত-ভক্ত সেবক মাধোলাল—যিনি তাঁহাকে যোগগুহা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন ও অশেষ প্রকারে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে অন্ততঃ একবার মাত্র নিজ বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য অনেক সাধ্য সাধনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বসতবাটীতে যাইতে তিনি কিছুতেই স্বীকৃত হন নাই। তাঁহার বাগান বাড়ীতে গমন করিয়া তিনি কয়েকবার কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি যখন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার কোন কোন শিষ্য ও ভক্ত নিজ নিজ গৃহ পবিত্র করিবার ও নিজেরা ধন্য হইবার মানসে তাঁহার পদার্পণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি দয়ার এবং প্রেমের অবতার হইলেও এ প্রার্থনা পূর্ণ করেন নাই।

তীর্থ ভ্রমণ উপলক্ষে একবার তিনি উদয়পুর গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ৮।১০ জন সাধু ছিলেন। সেখানে এক নির্জ্জন ময়দানে ধূনী জ্বালাইয়া তাঁহারা কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। সেস্থানে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া সাধুদের নিকট শোনা গিয়াছে। একদিন সেখানে প্রবল বৃষ্টি হয়, অনেক স্থান জল প্লাবিত হইল। কিন্তু তিনি তাঁহার সঙ্গীয় সাধুগণের সহিত যে ময়দানে অবস্থান করিতেছিলেন, সেখানে বৃষ্টিপাত হইল না। ইহা মহাপুরুষের অলৌকিক প্রভাবেরই ফল বলিয়া সেখানকার জন সাধারণের ধারণা জন্মিল। ক্রমে লোকমুখে প্রচারিত হইতে লাগিল যে, এক অসাধারণ শক্তি-

সম্পন্ন মহাপুরুষ কয়েকজন সহচর সঙ্গে ময়দানে বাস করিতেছেন এবং তাঁহার শক্তিতে অসম্ভব সম্ভব হয়। অনেক লোক দর্শনার্থী হইয়া আসিতে লাগিল। উদয়পুরের রাজার নিকট সে সংবাদ পৌছিল। ভক্তি প্রযুক্তই হউক, কি কৌতূহল বশতঃই হউক, কিংবা কোন স্বার্থের প্ররোচনাতেই হউক, তিনি মহাপুরুষের দর্শনপ্রার্থী হইলেন। তাঁহাকে রাজবাটীতে আনয়ন করিবার জন্য অনেক চেষ্টা হইল, কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তিনি স্বীয় আসন হইতে নড়িলেন না। তাঁহার স্বাভাবিক সমাহিতভাবে তিনি বসিয়া রহিলেন। তাঁহার তেজোমণ্ডিত আকৃতি ও অলৌকিক অদৃষ্টপূর্ব্ব নিত্যযুক্ত ব্রহ্মসমাহিত ভাব দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি সকলের শ্রদ্ধাভক্তি অবশ্য বহু পরিমাণেই বর্দ্ধিত হইল। রাজা এসব বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিজেই সাধু সেবার উপযোগী প্রচুর উপঢৌকন সহ মহাপুরুষের দর্শন লাভের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। নিষ্কিঞ্চন সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজ-দর্শন অনুমোদিত নয়, এই হেতু সন্ন্যাসের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার মানসে যোগিরাজ গম্ভীরনাথ, রাজা আসিতেছেন জানিয়াই সেখান হইতে আসন উঠাইয়া প্রস্থান করেন। তিনি যখন কাশ্মীরে গমন করিয়া কিছুদিন অবস্থান করিতেছিলেন, তখন কাশ্মীরের রাজাকেও একবার এইরূপে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা গিয়াছে। পরবর্ত্তী কালে যখন তিনি দীক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করেন, তখনও গরীবগৃহস্থগণই প্রায়শঃ তাঁহার কৃপালাভের অধিকারী হইয়াছেন, ধনিগণ অতি অল্পই তাঁহার সঙ্গসুখের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

যোগিরাজ গম্ভীরনাথ একবার মাত্র স্বেচ্ছায় এক গৃহস্থের বাড়ী গমন করিয়াছিলেন এবং কিছু শক্তিও প্রকাশ করিয়াছিলেন। গয়াতে তাঁহার প্রথম নিষ্কাম সেবক আক্কুর কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আক্কু ও তাহার সমস্ত পরিবার শুধু সাধু-সেবার দ্বারা জীবন ধন্য করিবার মানসে প্রাণের টানে বরাবর বাবাজীর সেবা করিয়া আসিতেছিল। তাহাদের অর্থাদি সম্বল কিছুই ছিল না। আক্কু ও তাহার ভাই মুন্নির কায়িক পরিশ্রমের উপর সমস্ত পরিবারের ভরণ পোষণ নির্ভর করিত। এই আক্কু একবার মৃতপ্রায় হয়। জীবনের লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইলে তাহাকে শ্মশানে লইয়া যাওয়ারই আয়োজন হইল। কিন্তু যাঁহার সেবায় সে সমস্ত জীবন ঢালিয়া দিয়াছে, শ্মশান যাত্রার পূর্ব্বে তাঁহাকে একবার সংবাদ না দিয়া কিরূপে তাহাকে সংসার হইতে বিদায় দেওয়া যাইতে পারে? মুন্নি শোকে আচ্ছন্ন হইয়া দৌড়িয়া বাবার নিকট গমন পূর্ব্বক আক্কুর মৃত্যু সংবাদ নিবেদন করিয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, এবং কাতরপ্রাণে তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিল। সেবক-পরিবারের এই নিদারুণ দুরবস্থার সময় নির্ব্বিকার মহাপুরুষ নিশ্চল রহিলেন না। শ্মশান যাত্রা নিষেধ করিয়া মুন্নিকে পাঠাইয়া দিলেন এবং স্বয়ং কিছুক্ষণ পরে আক্কুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আক্কুর মৃতদেহের সমীপবর্ত্তী হইয়া তিনি তাহা স্পর্শ করিলেন এবং তাহার মুখে একটু জল প্রদান করিলেন;—আক্কুর চেতনা সঞ্চার হইল। তৎপরে,

আক্কুর জন্য খিচুড়ী পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া তিনি নিজ আসনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ; অল্পক্ষণের মধ্যেই আক্কু সুস্থ হইল। ভক্ত-সেবকের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও করুণায় আপ্লুত হইয়া তিনি তাঁহার ব্যাবহারিক জীবনের দুইটি বিশেষ নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলেন। তিনি যেন নিজেকে আক্কু পরিবারের নিকট অপরিশোধ্য ঋণজালে আবদ্ধ মনে করিতেন। তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে সর্ব্বদাই এই কৃতজ্ঞতার নিদর্শন পাওয়া যাইত। বাবাজীর প্রকটাবস্থাতেই আক্কুর মৃত্যু হয়। গোরক্ষপুর মন্দিরের ভার গ্রহণ করার পর তিনি সারাজীবন আক্কুর পুত্র নান্নুকে বার্ষিক ১০৲ টাকা করিয়া দিতেন, বস্ত্র কম্বলাদি দিতেন, গোরক্ষপুর যাতায়াতের খরচ দিতেন এবং অন্যান্য বহু প্রকারে সাহায্য করিতেন। অতিথি-সেবা, আশ্রমের নিয়ম পালন, উপকারীর প্রত্যুপকার প্রভৃতি বিষয়ে তিনি গৃহস্থের আদর্শ ছিলেন। যদিও তাঁহার ব্যাবহারিক জীবন ঘটনাবহুল ছিল না, তথাপি তাহারই মধ্যে স্বীয় ব্যবহার-দ্বারা তিনি গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী সকল শ্রেণীর লোকের জন্য আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন।

গয়ার পাহাড়ে লোকজনের সমাগম হইলে মাঝে মাঝে সেখানে চোর ও দুষ্ট লোকের উপদ্রব হইত। সে বিষয়ে দুইটী ঘটনা আমরা শুনিয়াছি। বাবা গোকুলনাথজী বলিয়াছেন যে, একদিন মধ্যরাত্রে একদল বদ্‌মায়েস আসিয়া আশ্রমের উপরে ঢিল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করে। গোকুলনাথজী তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং আশ্রম-কুটীরের বহির্ভাগে কম্বল গায়ে দিয়া শয়ন

করিয়াছিলেন। তাঁহার গায়ে একটা ঢিল পড়ায় তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বাবা নৃপৎনাথ তাহা শুনিয়া বাহিরে আসিলেন। যোগিরাজও গণ্ডগোল শুনিয়া আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহিরে আগমন করিলেন। ব্যাপার দর্শন করিয়া সর্ব্ব-জীব-প্রেমিক নির্ব্বিকার মহাপুরুষ দুর্ব্বৃত্তদিগের সমীপবর্ত্তী হইলেন ও বলিলেন,—"তোমরা ঢিল নিক্ষেপ কর কেন? এখানে যাহা কিছু আছে; ইচ্ছা হইলে সকলই তোমরা লইয়া যাইতে পার।" গুরুজীর আদেশে সেবক নৃপৎনাথ আশ্রম-কুটীর খুলিয়া দিলেন। চোরগণ নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া বাসন পত্র, চাল ডাল, কম্বল প্রভৃতি ইচ্ছামত লইয়া যাইতে লাগিল। যাওয়ার সময় তাহারা করুণা-নিলয় মহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিল। বাবা গম্ভীরনাথ সকরুণ স্বরে বলিলেন যে, তোমরা অভাবগ্রস্ত, আবার ১০।১৫ দিন পরে এখানে আসিও, আজ যাহা মিলিয়াছে তখনও তাহাই মিলিবে, লোকের উপর বৃথা উপদ্রব করিও না। দুর্ব্বৃত্তগণ এইরূপ সকরুণ ব্যবহার ও উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া লজ্জাবনত মস্তকে জিনিষপত্র সহ প্রস্থান করিল। পরদিন প্রাতে মাধোলাল আসিয়া আবার বাসন পত্র, চাল ডাল, লোটা কম্বল আনিয়া দিলেন। তখন হইতে ঐ সব লোক শান্ত ভাব ধারণ করিয়া মাঝে মাঝে আশ্রমে আসিত এবং দয়ার আধার গম্ভীরনাথও তাহাদিগকে অভাবগ্রস্ত দেখিয়া এবং সম্ভবতঃ তাহাদের চরিত্রের উপর সাধুতার প্রভাব বিস্তার করিবার উদ্দেশ্যে, আশ্রম হইতে তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রদান করিতেন।

মাধোলাল আবার নূতন বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। মাধোলালের এরূপ খরচ হইতেছে দেখিয়া বাবাজী একদিন গয়া পরিত্যাগের প্রস্তাব করিলেন। মহাপুরুষ-সেবক মাধোলাল এ পরীক্ষায় সহজেই উত্তীর্ণ হইলেন। সে প্রস্তাবে কিছুতেই তিনি সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন "বাবাজী, এই সকল গরীব বেচারীরা কত নিবে ?"

একদিন বাবাজীর আশ্রমের নিকট চোর আসিয়াছে। তাঁহার সঙ্গে আরো কয়েক জন আগন্তুক সাধু ছিলেন। তখন চোরদিগের আশা পূর্ণ করিবার উপযুক্ত কোন দ্রব্যসামগ্রী বাবাজীর নিকটে ছিল না। তিনি তাঁহার কাল একমাত্র কম্বলটী তাহাদিগকে প্রদান করিয়া বলিলেন যে, তোমাদের ব্যবহারের উপযোগী আর কিছুই সম্প্রতি আমাদের নিকট নাই, এই কম্বলটী লইয়া যাও। চোরেরা কি যেন কি ভাবিয়া মহাপুরুষের কম্বলটী গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইল। যাত্রা নিষ্ফল মনে করিয়া তাহারা চলিয়া যাইতেই, কোন একজন সাধু বলিয়া উঠিলেন যে, ভাগ্যে আমাদের টাকা কয়েকটা বাঁচিয়া গেল। বাবাজী তাঁহাদের কাছে টাকা আছে জানিয়াই আদেশ করিলেন, "এখনই দৌড়িয়া গিয়া টাকা গুলি চোরদিগকে দিয়া আইস।" সাধুগণ আদেশ অমান্য করিতে অসমর্থ হইয়া অগত্যা চোরদিগের নিকটে গিয়া টাকাগুলি সমর্পণ করিলেন। চোরেরা এরূপভাবে টাকা পাইয়া অবাক্ হইয়া প্রস্থান করিল।

বাবা শুদ্ধনাথের মুখে শুনিয়াছি যে গয়ায় শুনুলাল ধাড়ী ওয়ালা নামে এক গয়ালী পাগল ছিল। সে গয়ার সর্ব্বত্র রাস্তায়

ঘাটে পাহাড়ে পর্ব্বতে ছুটাছুটী করিয়া নানা প্রকার পাগলামী করিত এবং লোকের উপর অত্যাচার করিত। কপিলধারা প্রভৃতি স্থানে গিয়া অনেক সময় সে সাধুদের উপরও উপদ্রব করিত। তাহার প্রতি বাবাজীর বিশেষ কৃপাদৃষ্টি পতিত হইল। একদিন সে আশ্রমে আসিয়া সাধুদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে। বাবাজী তাহাকে ধরিয়া সজোরে দুই গালে দুই চড় মারিলেন। তাহার পাগলামী কেবলমাত্র সেই দিনের জন্যই যে নিবৃত্ত হইল, তাহা নয়, সে সম্পূর্ণই প্রকৃতিস্থ হইয়া গেল; তাহার উন্মাদ রোগেরই নিবৃত্তি হইল। তৎপর কয়েক বৎসর শুন্নুলাল সুস্থভাবে তাহার গদীর কাজকর্ম্ম করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছে।

শুদ্ধনাথজী এবং আরও অপর কয়েকজন সাধু ও ভদ্রলোকের নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে, বাবাজীর কপিলধারায় অবস্থিতি কালে একটি ব্যাঘ্র মাঝে মাঝে তাঁহার নিকটে আসিত এবং কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক চলিয়া যাইত। সাধারণতঃ লোকজনের অনুপস্থিতি সময়েই সে আসিত। একদিন তাঁহার নিকট কয়েকজন ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন, এবং কয়েকজন সাধুও উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় ব্যাঘ্রটী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া স্বভাবতঃই সকলে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন এবং ভীত চকিত ও হতবুদ্ধি হইয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইলেন। বাবাজী প্রশান্তভাবে হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পলায়ন করিতে নিষেধ করিলেন, এবং স্বাভাবিক

মৃদুগম্ভীর স্বরে বলিলেন যে "ইনি একজন সাধু, ব্যাঘ্রবেশে আসিয়াছেন, কাহারও কোন অনিষ্ট করিবেন না, কোন ভয় নাই, আপনারা স্থিরভাবে বসুন।" লোক সকল চমৎকৃত চিত্তে বসিয়া রহিলেন। ব্যাঘ্রটীও অনতিদূরে উপবেশন করিল, এবং কিয়ৎ-কাল শান্তভাবে স্থিরনেত্রে বাবাজীকে দর্শন করিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। এতদ্‌ভিন্ন অন্যান্য সময়েও বাবাজীর সঙ্গে মাঝে মাঝে ব্যাঘ্র থাকিতে দেখা যাইত, এবং তিনি ব্যাঘ্র পুষিতেন বলিয়া মনে হইত। গোরক্ষপুরেও মন্দিরের চিড়িয়াখানায় একটি ব্যাঘ্র ছিল এবং সে বাবাজীর পোষা ছিল বলিয়া বোধ হইত। তাহার আহারাদির রীতিমত ব্যবস্থা ছিল। শান্তিনাথজীর নিকট শুনিয়াছি যে একদিন ব্যাঘ্রটী পিঞ্জর হইতে বাহির হইয়া পড়ে। তখন সাধুগণ ভীত হইয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটা করিতে আরম্ভ করিলেন। বাবাজীর নিকট সংবাদ পৌছিলে, তিনি ব্যাঘ্রের সমীপবর্ত্তী হইয়া মৃদুভাবে বলিলেন যে, তুমি বাহির হইয়া আসাতে সাধুগণ ভয়ে ছুটাছুটী করিতেছে, তুমি তোমার স্থানে যাও, কোন গোলমাল বাঁধাইও না। এইরূপ বলিতে বলিতে তিনি ব্যাঘ্রের কাণে ধরিয়া পুনরায় পিঞ্জরের মধ্যে পুরিয়া দিলেন, ব্যাঘ্রটীও অবনত মস্তকে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাবাজীর মহাসমাধির মুহূর্ত্তেই সেই ব্যাঘ্রটীও দেহত্যাগ করে।

যোগিরাজ গম্ভীরনাথ অহিংসার উচ্চতম ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন বলিয়া, সব হিংস্র জন্তু তাঁহার নিকটে হিংস্রভাব

পরিত্যাগ করিত, এবং তাঁহার প্রেমে সকলেই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিত। তিনি অহিংসার মূর্ত্ত-বিগ্রহ স্বরূপ ছিলেন। রেশমসূতা তৈয়ার করিতে অসংখ্য গুটিপোকার জীবন নাশ করা হয় বলিয়া তিনি রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন; অথচ লোকে রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করে এবং অনেকে ভক্তি ও প্রীতির সহিত তাঁহাকে রেশমী বস্ত্র দান করিত, এই হেতু তাহাদের মনে আঘাত লাগিবে ভয়ে তিনি প্রত্যাখ্যানও করিতেন না, এবং তাহা ব্যবহার না করার কারণও প্রকাশ করিতেন না। তিনি গোরক্ষপুরে একদিন কথা প্রসঙ্গে তাঁহার ঐকান্তিক সেবক ও শিষ্য শ্রীযুত বরদা কান্ত বসুর নিকট এই কারণটী ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার কুটীরের নিকটে সর্প আছে জনিলে তিনি তাহার জন্য দুগ্ধ রাখিয়া দিতেন। কখন কখন তিনি নিজ হাতে ইন্দুর সকলকে রুটী খাওয়াইতেন, সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শী মহাপুরুষ ব্যাবহারিক জীবনেও সর্ব্বপ্রকার জীবের সেবা করিতেন। কিন্তু ইহা তিনি সাধারণতঃ এমন ভাবে করিতেন যেন অন্য কোন লোকে তাহার মধ্যে কোন অসাধারণত্ব টের না পায়।

তিনি গোরক্ষপুর মন্দিরে স্থায়ী ভাবে আসন গ্রহণ করার পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত সাধারণতঃ গয়ায় থাকিতেন এবং এই ভাবে অবস্থান করিতেন। কখন কখন তীর্থ পর্য্যটনেও বাহির হইতেন।

পর্য্যটন
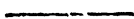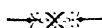
পর্য্যটন সাধকগণের সাধনের অঙ্গ বিশেষ, এবং সেই হেতু বাবা গম্ভীরনাথ সাধনাবস্থায় অনেক স্থান পর্য্যটন করিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। সিদ্ধাবস্থায়ও প্রেমপ্রধান মহাপুরুষগণ বিনা প্রয়োজনে বা লোকহিত প্রয়োজনে নানা স্থানে বিচরণ করিয়া তীর্থের মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত করেন, লোকসকলকে মানব-জীবনের আদর্শ প্রদর্শন করেন, এবং নানাবিধ সাধারণ ও অসাধারণ ভাবে জীবের কল্যাণ সাধন করেন। তাঁহারা "তীর্থী কুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদা ভৃতা"। নিত্যযুক্ত যোগী বাবা গম্ভীরনাথও বহু তীর্থে গমন করিয়া স্বীয় আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে তাহাদের তীর্থত্ব বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। তাঁহার চিত্ত নিত্য নিরন্তর ব্রহ্মে সমাহিত থাকিত। সুতরাং তিনি যেখানে গমন করিতেন, সেখানেই তাঁহার ভিতর হইতে আধ্যাত্মিক কিরণ বিকীর্ণ হইয়া সমস্ত আবহাওয়া যেন ব্রহ্মভাবে ভাবিত করিয়া দিত। তিনি যে যে তীর্থে গমন করিয়াছিলেন, সময় নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তাহাদের ধারাবাহিক বর্ণনা প্রদান করা সম্ভবপর নহে। কথা প্রসঙ্গে বিভিন্ন সাধুর নিকট হইতে যে সকল তীর্থ যাত্রার বিবরণ জানা গিয়াছে, তৎসম্বন্ধে কিছু কিছু উল্লেখ করা যাইতে পারে। সিদ্ধাবস্থায় তিনি যে সব স্থানে গমনাগমন

করিতেন, সেসব স্থানে প্রায়ই তাঁহার সহিত সাধুর জমায়েৎ থাকিত। কখন ৮।১০ জন, কখন ২০।২৫ জন, কখন কখন বা ১০০।১৫০ জন সাধুও তাঁহার সহিত থাকিতেন। তাঁহার আশ্রয়ে তাঁহাদের আহার বাসস্থান প্রভৃতির বিশেষ কোন অসুবিধা হইত না।

তাঁহার নর্ম্মদা পরিক্রমা এবং উদয়পুর ও কাশ্মীর গমনের বিবরণ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি স্নানাদির যোগ উপলক্ষে কুরুক্ষেত্র, পুষ্কর, কাশী, গঙ্গাসাগর প্রভৃতি তীর্থে গমন করিতেন। বদ্রী-কেদার, দ্বারকা, রামেশ্বর ও পুরী, এই চারিধামে তিনি পর্য্যটন করিয়াছিলেন। হিন্দুদের নিকট চারিধাম যেমন প্রসিদ্ধ তীর্থ, তেমনি চারিটী প্রসিদ্ধ সরোবর আছে,—নারায়ণ সরোবর, রাওয়াল সর, মানস সরোবর ও পম্পা সরোবর। নারায়ণ সরোবর কচ্ছদেশে। রাওয়াল সরোবর উত্তরাখণ্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশে, জ্বালামুখী তীর্থ হইতে ৬৪ মাইল পূর্ব্বে; এখানে জলে ভাসমান পর্ব্বতখণ্ডের উপর শিবমন্দির বিদ্যমান আছে। পম্পা সরোবর দাক্ষিণাত্যে। মানস সরোবরের কথা সকলেই অবগত আছেন। বাবা গম্ভীরনাথ এই চারি সরোবরেই গমন করিয়াছিলেন। এসব তীর্থযাত্রায় বাবা নৃপৎনাথ তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। জ্বালামুখী পাঞ্জাবের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। সেখান হইতে পদব্রজে ১২ দিনে তাঁহারা রাওয়াল সরোবরে গিয়াছিলেন। রাওয়াল সরোবর হইতে দুর্গম পার্ব্বত্য পথ দিয়া উত্তর দিকে বহুদূর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা

মনোমহেশ গমন করিয়াছিলেন। বাবাজী নেপাল রাজ্যের ভিতর দিয়া পশুপতিনাথ, মুক্তিনাথ, দামোদরকুণ্ড, (গণ্ডকী নদীর উৎপত্তি স্থান, এখানেই শালগ্রাম শিলার জন্ম হয়) প্রভৃতি তীর্থ দর্শন পূর্ব্বক উৎকট বরফাবৃত পার্ব্বত্য পথে কৈলাস ও মানস সরোবরে গমন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে কৈলাস ও মানস সরোবরের মধ্যপথে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি যখন মানস সরোবর হইতে কৈলাসের দিকে যান, গোঁসাই তখন কৈলাস হইতে মানস সরোবরের দিকে যাইতেছিলেন। বাবাজীর শিষ্যদ্বয় শান্তিনাথ ও নিবৃত্তিনাথ যখন ১৯১৬ খৃঃ অঃ তাঁহার অনুমতি লইয়া কৈলাস ও মানস সরোবর দর্শনে গমন করেন, তখন তিনি তাঁহাদিগকে সেদিকে যাইবার দুইটী রাস্তার বিস্তৃত বিবরণ এবং পথে যেসব তীর্থস্থান দর্শন করিয়া যাইতে হইবে, তাহাদের বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন। এসব বিকট শীতপ্রধান বরফাবৃত স্থানে পর্য্যটন করিবার সময়েও তাঁহার একখানা কম্বল ভিন্ন আর কোন গাত্রাবরণ থাকিত না। তাঁহার শিষ্যদ্বয়কেও তিনি বলিয়াছিলেন,—"এক কম্বল বস্তুং।"

কৈলাসের পথে চন্দ্রনাথ নামে এক তীর্থ আছে। শ্রীমৎ শান্তিনাথজী ও শ্রীমৎ নিবৃত্তিনাথজী যখন সে পথ দিয়া গমন করেন, তখন বাবা সমুদ্রনাথ নামক এক নাথযোগী সে স্থানের মোহান্ত। মোহান্তজী তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন যে, তিনি যখন সেই মন্দিরে পূজারির কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় যোগিরাজ

গম্ভীরনাথ সেখানে গমন করিয়াছিলেন। এবং একমাস সমাধি-নিরত অবস্থায় অবস্থান করিয়াছিলেন। সমুদ্রনাথজীই তাঁহার ভোজন সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া দিতেন এবং তাঁহার সেবা করিতেন। তিনি কোন্ প্রস্তর খণ্ডের উপর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও মোহান্ত মহারাজ শান্তিনাথজী ও নিবৃত্তি-নাথজীকে প্রদর্শন করিয়াছেন।

অমরনাথ আর একটি দুর্গম তীর্থ। প্রায় সমস্ত বৎসরই সে স্থান বরফাবৃত থাকে। রাবলপিণ্ডী হইতে শ্রীনগর হইয়া বিপৎ-সঙ্কুল পার্ব্বত্য পথে সেখানে যাইতে হয়। তীর্থযাত্রিগণ বৎসরের মধ্যে এক দিন মাত্র সেখানে যাইতে পারেন। সেখানকার মোহান্ত ও গভর্ণমেণ্ট তখন যাত্রীদের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করেন। বাবা গম্ভীরনাথ সেই তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। অমরনাথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যখন তিনি সারঙ্গকোটে আসেন, তখন বাবা গোকুলনাথ তাঁহার প্রথম দর্শন লাভ করেন। গোকুলনাথজীর বয়স তখন ১২।১৩ বৎসর। তিনি বলিয়াছেন,—"আমার পূর্ব্বপুরুষগণ বংশানুক্রমে সারঙ্গকোটের যোগীদের শিষ্য ছিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে আমার পিতার সঙ্গে সারঙ্গকোটে পীর এলাচীনাথের ভাণ্ডারায় গিয়া শুনিলাম যে, একজন 'রাজা যোগী' অমরনাথ হইতে আসিয়াছেন। আমিও আমার পিতার সঙ্গে রাজা যোগী দেখিতে গেলাম। সেই ভাণ্ডারায় ১২০০ শত সাধু উপস্থিত ছিলেন। তাহার মধ্যে বাবাজীকে দেখিয়া রাজা যোগীর মতই আমার মনে হইল।"

মনিকরণ, যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিবরণও পাওয়া গিয়াছে। তদ্ভিন্ন ছোট বড়, প্রসিদ্ধ অপ্রসিদ্ধ অনেক তীর্থেই তিনি পর্য্যটন করিয়াছেন। কিন্তু তন্মধ্যে অনেক স্থানে গমনেরই কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না।

তিনি কুম্ভ মেলায়ও যোগদান করিতেন। গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা ১৩০০ বঙ্গাব্দের (১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের) প্রয়াগের কুম্ভমেলার বর্ণনা করিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। তাহাতে বাবাজীর সম্বন্ধে কয়েক পংক্তি এরূপ লিখিত আছে,—"যেরূপ-তাকাইয়া একটু মাথা নাড়িয়া ইনি ইঙ্গিতে প্রাণ ভিজাইয়া দেন, তাঁহার বর্ণনা হয় না। ইনি অত্যন্ত অল্পভাষী। সাধুরা ইঁহাকে সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া জানেন। ইনি বহু শিষ্য (?) সঙ্গে মেলাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। একদিন একজন ধনী ইঁহার আসনের নিকট পাঁচ শত খণ্ড কম্বল রাখিয়া যান। বাবা গম্ভীরনাথ ধ্যানস্থ ছিলেন, কিছু পরে নেত্র উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন রাশীকৃত কম্বল। বাঁ হাতের অঙ্গুলী ঈষৎ নাড়িয়া বলিলেন, 'যাহাদের দরকার আছে, তাহাদিগকে এ সকল দিয়া দাও'। তখনই সমস্ত বিতরিত হইয়া গেল।"*

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত 'বাবা গম্ভীরনাথজী' গ্রন্থে মনোরঞ্জন বাবুর সুদীর্ঘ উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা হইতে কতকাংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

* প্রয়াগধামে কুম্ভমেলা ৩য় সংস্করণ—৭১ পৃষ্ঠা।

—"বাংলা ১৩০০ সনের মাঘ মাসে প্রয়াগক্ষেত্রে পূর্ণ কুম্ভের মহাধিবেশন হইয়াছিল। সেই ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীগুরুদেব আমাদিগের নিকট বিভিন্ন শ্রেণীর কয়েক জন সাধু, যোগী, সন্ন্যাসী ও ভক্তের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিষয় অবলম্বন করিয়া, আমি "প্রয়াগ ক্ষেত্রে কুম্ভমেলা" নামক পুস্তক রচনা করিয়াছিলাম। সেই পুস্তকে বাবা গম্ভীরনাথজীর সংক্ষিপ্ত কাহিনী ও প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে। বড়ই ইচ্ছা ছিল যে, কিছুদিন বাবার নিকট থাকিয়া, পরে তাঁহার আচার-ব্যবহার ও নিত্যকর্ম্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে লিখিব। শুধু কতকগুলি বড় বড় ঘটনা বা অলৌকিক কার্য্য লিখিয়া মহাপুরুষদের পরিচয় দেওয়া যায় না, উহা অনেকটা ফটোগ্রাফের মতন হয়। জীবন্ত হয় না। ছোট ছোট কার্য্য ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্য দিয়াই তাঁহাদের অসাধারণত্ব ফুটিয়া উঠে। তাঁহাদের হাঁটা, চলা, শোওয়া, বসা, আহার বিহার, আলাপ ব্যবহার—সকলই সাধারণ লোকের কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র। অকৃত্রিমতা, অমায়িকতা, সত্য, সরলতা ও নির্ভীকতা এবং প্রেম ও পবিত্রতা তাঁহাদের সকল কার্য্য, সকল অনুষ্ঠানে জড়াইয়া আছে। সঙ্গলাভ না করিলে এ সকল প্রত্যক্ষ হয় না। আমার ভাগ্যে তাঁহার সঙ্গলাভ আর ঘটিয়া উঠিল না।

"সেই ১৩০০ সনের কুম্ভমেলায় যখন গুরুদেবের সঙ্গে সাধু-দর্শনে বাহির হইয়া বাবা গম্ভীরনাথজীর নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন সাধুরা চা-পান করিতে ছিলেন। বাবা নিজ হাতে ধরিয়া আমাকে এক বাটি চা দিলেন, আমি তাঁহার হাত হইতে গ্রহণ

করিলাম,—এখনও সেই কাঁসার বাটিটা এবং চায়ের সুগন্ধ ও সুস্বাদ আমার নয়ন, ঘ্রাণ ও রসনায় যেন লাগিয়া আছে। সেই জিনিস গুলিতে যেন সাধুতা মাখানো ছিল। সেই পবিত্র হস্তের কি স্নেহের দান! যখন বাটি ধরিয়া আমি আনমনে অপেক্ষা করিতেছিলাম, তখন ঈষৎ নয়ন ভঙ্গিমা করিয়া, একটু মাথা নাড়িয়া আমাকে চা-পান করিতে ইঙ্গিত করিলেন,—সেটী যে কত মধুর, তাহা বুঝাইতে পারিব না। নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসী, কোনও বস্তু বা ব্যক্তির জন্যই আসক্তি নাই; অথচ প্রেমে পরিপূর্ণ। অনাসক্ত, জীবন্মুক্ত, আত্মারাম, অথচ বিশ্ব-প্রেমিক মহাপুরুষদিগের সঙ্গলাভ যাঁহারা করেন নাই, তাঁহারা ভারতমাতার অমূল্য রত্ন কিছুই দেখিতে পান নাই। প্রথম যখন গুরুদেবের কৃপায় ইঁহাদের দর্শন পাইলাম, তখন মনে হইল, যেন ভারত ভূমির একটী অপূর্ব্ব ও অমূল্য রত্ন ভাণ্ডার আমার নিকট প্রকাশিত হইল।

"প্রেমাবতার শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—'যাঁহার সঙ্গ হইলে আপনি মুখে কৃষ্ণনাম আইসে, তাঁহাকেই প্রকৃত বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে'। আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, যাঁহারা সদ্গুরুর শিষ্য, কোনও সাধুসঙ্গ হইলেই তাঁ[illegible]দের দীক্ষা-মন্ত্র যেন গাড়ীর চাকার মতন আপনি চলিতে থাকিবে,—বাধা দিয়া নিবারিত করার শক্তি আসিবে না। বাবা গম্ভীরনাথের সংসর্গে অনেকেই এই তত্ত্ব অনুভব করিয়াছেন।

"শ্রীকবির সাহেব বলিয়াছেন,—

'অলখ্ পুরুখকো আরসী সাধু হি কা দেহ।
লখ্ যো চাহে অলখ্ কো উনহিমে লখ্ নেহ॥'

যিনি অলক্ষ্য পুরুষ (ব্রহ্ম), সাধুদিগের দেহই তাঁহাকে দেখিবার দর্পণ স্বরূপ। যিনি সেই অলক্ষ্যকে লক্ষ্য করিতে চাহেন, সাধুর মধ্যেই তাঁহাকে দেখিতে হইবে'।

যীশু খৃস্ট বলিয়াছেন,—'যে ব্যক্তি পুত্রকে দেখিয়াছে, সেই পিতাকে দেখিল'।

উপনিষৎ বলিয়াছেন,—'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি'।

অতএব প্রকৃত সাধুদিগের দর্শনে, ধ্যানে, পূজায় ও পরিচর্য্যায় ঈশ্বরেরই পূজা হয়। বাবা গম্ভীরনাথ এই শ্রেণীর পূজ্যপাদ মহাত্মা ছিলেন।"*

প্রয়াগ কুম্ভে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া সাধুদের নিকট শোনা গিয়াছে। কুম্ভমেলায় বিভিন্ন শ্রেণীর সাধুসঙ্ঘের মধ্যে কখন কখন দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া থাকে। প্রয়াগ কুম্ভে একবার বৈষ্ণবসম্প্রাদায়ভুক্ত নাগা সাধুগণ কোন কারণে উত্তেজিত হইয়া যোগিসম্প্রদায়ভুক্ত সাধুদিগের উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার ও মারপিট করিয়াছিল। তাহাতে অনেক যোগীর মাথা ফাটিয়া যায়। যোগিসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠতম পুরুষ বাবা গম্ভীরনাথ ঘটনাস্থলের অদূরে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার চক্ষু অন্তর্নিবদ্ধ, দেহ নিস্পন্দ, বদনমণ্ডল নির্ব্বিকার ও সুপ্রসন্ন। বাহিরে কি হইতেছে সে দিকে তাঁহার কোনই খেয়াল নাই। তাঁহার সঙ্গীয় সাধুগণ কতবার আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—"মহারাজ; দেখ্ছেন না কি হচ্ছে?" কিন্তু মহারাজ যে সে রাজ্যেই নাই,

* মহাত্মা বাবা গম্ভীরনাথজী—২৭-৩১ পৃষ্ঠা।

তাঁহার দেহটী মাত্র সেখানে উপস্থিত। বৈষ্ণব নাগাগণ মারপিট করিতে করিতে বাবাজীর অতি নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল ; যোগীরা সংখ্যায় অত্যন্ত কম ছিল বলিয়া তাহাদিগকে বাধা প্রদানে অক্ষম ছিল। তখন একজন যোগী বাবাজীর আসনের সন্নিকটে আসিয়া ভয়ানক চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল "মহারাজ, দেখুন, দেখুন, সর্ব্বনাশ।" তখন বাবাজীর সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি ব্যাপার দেখিয়া অপেক্ষাকৃত একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "বাস্, শান্তি কর, শান্তি কর।" এই কথা বলা মাত্রই অকস্মাৎ অত্যাচারকারিগণের যেন ক্রোধের উপশম হইল, তাহারা মন্ত্রমুগ্ধবৎ অত্যাচার হইতে নিবৃত্ত হইয়া প্রস্থান করিল।

এই উপলক্ষে যোগিসম্প্রদায়ের আর একজন মহাপুরুষের কথা মনে পড়িতেছে। তাঁহার নাম বাবা সুন্দর নাথ। তিনি সাধারণতঃ বদরিকাশ্রমে থাকিতেন, কখন কখন বা আবু পাহাড়ে আসিতেন, এবং কুম্ভমেলা প্রভৃতি উপলক্ষে মাঝে মাঝে লোকালয়েও দর্শন দিতেন। তিনি বৈরাগ্য প্রধান জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন। সদা-সর্ব্বদা সমাধিমগ্ন থাকিতেন। জগতের সহিত কোনরূপ লৌকিক সম্পর্ক রাখিতেন না। তাঁহার মত সর্ব্ব-কর্ম্ম-পরিত্যাগী, নিত্য-নিরন্তর সমাধিমগ্ন মহাপুরুষ ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। যোগিগণ বলেন যে, তিনি সদা সর্ব্বদা ষষ্ঠ ভূমিতে বিহার করিতেন। একবার কুম্ভ মেলার ঝগড়ায় নাগাগণ উন্মত্ত হইয়া অত্যাচার করিতে করিতে তাঁহারও মাথায় আঘাত করিয়া রক্তপাত করিয়াছিল। তিনি স্বীয় আসনে সমাধিমগ্ন, হাঙ্গামার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানেন না ;

মাথা ফাটিয়া অবিরল ধারে রক্তপাত হইতেছে, তাহাতেও তাঁহার হুঁস নাই—তাহাতেও তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হয় নাই। অন্য সাধুগণ আসিয়া ক্ষতস্থান বাঁধিয়া রক্ত নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিল। তিনি সমভাবে নির্ব্বিকার চিত্তে সমাহিত অবস্থাতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। শোনা যায় যে তাঁহাকে একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে দেখা যাইত। বাবা গম্ভীরনাথের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। জনৈক সাধুর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বাবাজীর সহিত দেখা করিবার জন্য এবং গোরক্ষনাথের 'স্থান' দর্শন করিবার জন্য দুই বার গোরক্ষপুরে আগমন করিয়াছিলেন। পশ্চিমোত্তর ভারতে আত্মারাম যোগিবর সুন্দরনাথের অনেক ভক্ত আছেন, কিন্তু কাহাকেও তিনি শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন নাই। নাথ-সম্প্রদায়ে আরও কয়েক জন যোগসিদ্ধ ও জ্ঞানসিদ্ধ মহাপুরুষ বর্ত্তমান আছেন বলিয়া শুনা যায়। অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া তাঁহাদের বিষয় উল্লেখ করা হইল না। কুম্ভমেলা প্রভৃতিতে বাবা গম্ভীরনাথই নাথ-সম্প্রদায়ের নেতা বলিয়া পরিগৃহীত হইতেন।

বাবাজী এক সময় কাশীতে গমন করিয়া গোরখ্‌টিলায় আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেখানে বাবা বিদ্যানাথ নামক একজন খ্যাতনামা যোগী তখন অবস্থান করিতেন। তাঁহার অনেক চেলা আছে। বাবাজী কয়েক দিন সেখানে অবস্থান করিবার পরই সাধুগণ ও গৃহী ভক্তগণ তাঁহার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন এবং বিদ্যানাথজীর প্রভাব কিয়ৎ পরিমাণে খর্ব্ব হইতে লাগিল। বিদ্যানাথজী তাহাতে কিছু অস্বস্তি বোধ করিলেন।

আশ্রম-স্বামীর প্রভাবের হ্রাস হওয়া সম্ভবতঃ বাবাজী পছন্দ করিলেন না। 'মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ'— বাবা গম্ভীরনাথ অবিলম্বে কাশী গোরখ্‌টিলা পরিত্যাগ করিলেন। তদবধি তিনি কাশীতে আসিয়া আর অধিক দিন অবস্থান করিতেন না।

১৩০৩ সনে (১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে) শ্রাবণ মাসে তিনি গোদাবরী কুম্ভ মেলায় গমন করিয়াছিলেন। সেখান হইতে পঞ্চবটী (নাসিক) গমন করেন। পঞ্চবটী হইতে জব্বলপুর হইয়া তিনি কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কাশীতে আগমন করিয়া তিনি গোরক্ষপুরের মোহান্ত দীলবরনাথজীর মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হন এবং সাধুদিগের অনুরোধে গোরক্ষপুর গমন করেন। মোহান্ত বাবা সুন্দরনাথজী (সম্প্রতি তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন) বলিয়াছেন যে,—"মোহান্ত দীলবরনাথজীর দেহান্তের পর আমিই বাবাজীকে আহ্বান করিয়া গোরক্ষপুর আনাইয়া মন্দিরের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি কিছুতেই মোহান্ত পদ গ্রহণ করিলেন না, আমাকে মোহান্তপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।" দীলবরনাথ ও সুন্দরনাথ উভয়েই পূর্ব্বতন মোহান্ত বলভদ্রনাথের শিষ্য, এবং বলভদ্রনাথ বাবা গম্ভীরনাথের গুরুভাই। বাবাজী গোরক্ষপুরে আসিয়া ধূনীঘরে আসন গ্রহণ করিলেন, দালানে প্রবেশ করিলেন না। তিনি সুন্দরনাথকে মোহান্ত পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আশ্রমের বিধি ব্যবস্থা দেখিবার জন্য কিছুকাল মন্দিরে অবস্থান করিলেন। মোহান্তের ও সাধুদের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে

কয়েক দিন দোতালার এক কামরায় ও পরে কয়েক দিন নীচের একটি কামরায় আসন স্থাপন করিয়াছিলেন। কয়েক দিন পর গোরক্ষপুর পরিত্যাগ করিয়া গয়ায় ফিরিয়া আসেন।

১৩০৭ বঙ্গাব্দে (১৯০০ খৃঃ) কলিকাতার নিকটবর্ত্তী দমদমার গোরখ্ বংশীর মোহান্ত নান্নুনাথের দেহান্ত হওয়ায় সাধুগণ বাবাজীকে সেখানে লইয়া যান। সেখানে তিনি খুসীনাথকে মোহান্তের গদীতে অভিষিক্ত করিলেন। সেখান হইতে তিনি গঙ্গাসাগর গমন করেন। আবার দমদমায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেখান হইতে তিনি পুরী যাত্রা করেন। এসব যাত্রাতে তাঁহার সহিত বহু সাধু ছিলেন। তিনি জগন্নাথ ক্ষেত্রে পোঁছিয়া এক পাণ্ডার গৃহে অবস্থান করেন। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পুত্র ও শিষ্য মহাত্মা যোগজীবন গোস্বামী, যোগিরাজ গম্ভীরনাথের আগমন সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন এবং তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গীয় সাধুদিগকে নিজেদের নরেন্দ্র সরোবর-তীরস্থ আশ্রমে লইয়া যান। গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ কায়মনোবাক্যে তাঁহার ও সাধুদের সেবা করিয়াছিলেন। তিনি ৬ দিন সেখানে (জটীয়া বাবার সমাধি মঠে) অবস্থান করিয়াছিলেন।

উক্ত মঠের ঐকান্তিক সেবক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,—"আমার পরম সৌভাগ্য যে একবার ৺পুরীধামে গুরুদেব ভগবান্ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীদেবের নরেন্দ্র-সরোবর তীরস্থ সমাধি মঠে তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলাম। তখন যে

তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি, ইহা তাঁহারই কৃপায় চিরদিনের তরে হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

"আশ্রমের সেবাকার্য্য সম্পন্ন করিয়া মাঝে মাঝে সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে তাঁহার নিকট যাইয়া বসিতাম। তাঁহার নিকট বসিলেই অনুভব হইত, আমার গুরুপ্রদত্ত 'নাম' আপনা আপনি স্রোতবেগে চলিতেছে। কিছুক্ষণ পরে বাবা বলিতেন 'যাও, এখন সেবার কার্য্যে যাও'। আমি তখন যাইয়া শ্রীমৎ গুরুদেবের আরতি করিতাম, বাবা দাঁড়াইয়া উহা দর্শন করিতেন। দাদা স্বর্গীয় যোগজীবন গোস্বামী তাঁহাকে ৺পুরীতে আসিয়া, পাণ্ডার বাড়ীতে আছেন দেখিয়া, অতি যত্নে মঠে লইয়া আসেন এবং অর্থাভাব থাকিলেও ঋণ করিয়া খুব ভক্তির সহিত তাঁহার সেবা করেন। আমরা তাঁহার সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করিতাম ও তাঁহার প্রদত্ত আহারায় গ্রহণ করিতাম। বাবাকে এ স্থানে দেখিয়াছি, তাঁহার ধর্ম্মের কোন বাহ্যাড়ম্বর নাই, পরিধানে মাত্র এক খানা সাদা ধুতি ও এক খানা সাদা চাদর রহিয়াছে। কাহারও সহিত বেশী কথা বলেন না, নিরন্তর সাধনে রহিয়াছেন। মাঝে মাঝে সঙ্গীয় লোকদের সহিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শনে যাইতেন। সন্ধ্যার অল্প পরে ধূনীর পাশে বসিয়া সঙ্গীয় সাধুদের সায়ংকালীন ভজনে যোগ দিতেন এবং কখন কখন সেতারের যোগে নিজেই ভজন গান করিতেন। তিনি ছয় দিবস দয়া করিয়া এই মঠে ছিলেন।"

বাবাজী পুরী হইতে যাত্রা করিয়া সাক্ষীগোপাল, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি দর্শন পূর্ব্বক গয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এই রূপে সর্ব্ব-বন্ধন-পরিশূন্য আত্মানন্দ-পরিপূর্ণ যোগীশ্বর মহাপুরুষ মুক্ত বিহগরাজের মত নানা তীর্থে বিচরণ করিতে লাগিলেন। গয়াতেই তাঁহার স্থায়ী আসন ছিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া গয়াতেই আসিয়া বিশ্রাম করিতেন।

তাঁহার কপিল ধারায় অবস্থানের শেষভাগে পরমহংস রতনগিরি নামক আর একজন মহাপুরুষ সেখানে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তিনিও একজন প্রভাবশালী সাধু ছিলেন। শুনিয়াছি যে তিনি স্বনামখ্যাত মহাপুরুষ ভাস্করানন্দ স্বামীর গুরুভাই। তিনি পূর্ব্বে পাতিয়ালায় থাকিতেন। কপিলধারায়ও তিনি অনেকের শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করেন। বাবাজী যখন অধিকাংশ সময় গয়া হইতে অনুপস্থিত থাকিতে লাগিলেন, তখন পরমহংসজী তাঁহার ধনী ভক্তদের সাহায্যে কপিলধারায় অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করাইয়া আশ্রমের অনেক বাহ্যিক উন্নতি সম্পাদন করিলেন। আশ্রমের চেহারা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এখন আর এ আশ্রম সর্ব্বত্যাগী নিষ্কিঞ্চন সাধকের নিবিড় সাধনের তেমন উপযুক্ত স্থান রহিল না। গুহা বেদী প্রভৃতি রক্ষিত হইল বটে, কিন্তু বাহ্যাড়ম্বরে তাহাদিগকে ঢাকিয়া ফেলিল। আশ্রমের বাহ্যাকৃতিতে রাজসিক ভাবের প্রাধান্য হইল। সাধকগণ ইহাকে আশ্রমের উন্নতি না বলিয়া অবনতিই বলিয়া থাকেন।

কপিলধারার আশ্রমের যখন এইরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইল, তখন বাবাজী গয়ায় আসিয়া কপিলধারায় বাস করা পছন্দ করিতেন না। তাঁহার ঐকান্তিক ভক্ত সেবক মাধোলাল বামনী-

ঘাটের উপরে একটী নির্জ্জন স্থানে তাঁহার সাধন ভজনের উপযোগী একটি বাগানবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বাবাজী তদবধি যখন গয়ায় আসিতেন, তখন সাধারণতঃ ঐ বাগান বাড়ীতেই আসন গ্রহণ করিতেন।

গোরক্ষপুরে প্রত্যাগমন ও গোরক্ষনাথ মন্দিরের ভার গ্রহণ
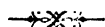
ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশে এবং ভারতবহির্ভূত বহু স্থানে গোরক্ষনাথ প্রবর্ত্তিত নাথযোগী সম্প্রদায়ের অসংখ্য মঠ এখনও বিদ্যমান আছে, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রত্যেক মঠেরই অধ্যক্ষরূপে একজন করিয়া মোহান্ত থাকেন; তিনি সেখানে গোরক্ষনাথের বিশেষ প্রতিনিধি, এবং তদুপযুক্ত সম্মান পাইয়া থাকেন। সাধারণতঃ সাধুগণ মোহান্ত-পদ-প্রাপ্তি বিশেষ ভাগ্যের কথা মনে করেন। প্রত্যেক মঠেরই অল্পবিস্তর নিজস্ব সম্পত্তি আছে। এই সব সম্পত্তি দেবোত্তর—দেবসেবা, সাধুসেবা ও দীন দুঃখীর সেবার জন্য উৎসর্গীকৃত। কোন ব্যক্তি বিশেষ এ সব দেবোত্তর সম্পত্তির মালিক নয়, কেহ পুরুষানুক্রমে ইহা ভোগ দখল করিবার অধিকারী নয়, কাহারও ব্যক্তিগত ভোগ বিলাসের জন্য এসব সম্পত্তি হইতে একটি পয়সা ব্যয় হইলেও তাহা অপব্যয় বলিয়া গণ্য, এবং যে ব্যক্তি এরূপ ব্যয় করে, সে দেবতার নিকট, সম্প্রদায়ের নিকট, দরিদ্র নারায়ণের নিকট ও সমগ্র সমাজের নিকট অপরাধী। দেবোত্তর সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে

যিনি নিযুক্ত থাকেন, তিনি সেবক—সম্পত্তির মালিক নহেন। ঐ সম্পত্তির আয় দ্বারা দেবসেবা, সাধুসেবা ও দরিদ্র নারায়ণ সেবার সুচারু বন্দোবস্ত করিতে তিনি অধিকারী ও তজ্জন্য তিনি দায়ী। অপরিহার্য্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কারণে নিজের জন্য ইহা হইতে এক কড়ি ব্যয় করিতেও তিনি ধর্ম্মতঃ ও ন্যায়তঃ অধিকারী নহেন। এই সব সম্পত্তির মালিক দেবতা অথবা সমাজ।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচলিত বিশেষ বিশেষ রীতি অনুসারে এই সব মঠ ও দেবোত্তর সম্পত্তির সেবক-পদের উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। কিন্তু যিনি যখন এরূপ কোন সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মোহান্ত পদে নির্ব্বাচিত হন, তিনি তখন তাঁহার কর্ত্তব্য পালনের জন্য, কেবল দেবতার নিকটে নয়, সাম্প্রদায়িক সাধুদের নিকটে এবং সমগ্র হিন্দু সমাজের নিকটেও দায়ী। তিনি তাঁহার ক্ষমতা ও সুবিধার অপব্যবহার করিলে, সম্প্রদায় ও সমাজ তাঁহাকে শাসন করিতে, অথবা প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া অন্য উপযুক্ত সেবক নির্ব্বাচিত করিতে, ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ অধিকারী এবং বাধ্য। কিন্তু হিন্দু সমাজ ও তদন্তর্ভুক্ত সম্প্রদায় সমূহের দুরদৃষ্টের ফলে, হিন্দু জনসাধারণ তাহাদের অধিকার ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সজাগ নহে, তাহারা লোকমত কেন্দ্রীভূত করিয়া নিজেদের অধিকারানুরূপ ক্ষমতা দাবী করিতে প্রযত্নশীল নহে, দেশের প্রচলিত আইন আদালতও এ বিষয়ে জনসাধারণের ধর্ম্মসঙ্গত অধিকার উপেক্ষা করিয়া মঠ ও তৎসংশ্লিষ্ট দেবোত্তর সম্পত্তি সকল মোহান্তদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া স্বীকার

করে, এবং জনসাধারণকে সেই কারণে তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে বাধা প্রদান করিয়া থাকে। অনেক দেবোত্তর সম্পত্তির সেবক-পদে নিতান্ত অনুপযুক্ত লোক অধিষ্ঠিত হইয়া ক্ষমতা ও সুবিধার অপব্যবহার করিতেছে, তীর্থ ক্ষেত্রকে অত্যাচারের ক্ষেত্র করিয়া তুলিয়াছে, সাধুসেবা দরিদ্রসেবা প্রভৃতির পরিবর্ত্তে তাহারা বন্ধু-বান্ধব লইয়া ভোগ বিলাসে ও নানা জাতীয় কুৎসিৎ আমোদ-প্রমোদে দেবোত্তর অর্থ উড়াইয়া দিতেছে। অথচ ইহার কোন প্রতিকার হইতেছে না, তাহাদিগকে সংযত করিবার কোন উপায় হইতেছে না। ইহা কি সমাজের ও সম্প্রদায় সমূহের মৃত্যুর চিহ্ন নয়?

পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষিত মনিষীগণ আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে, আমাদের দেশে পাশ্চাত্য দেশসমূহের মত যথেষ্ট লোক-হিতকর প্রতিষ্ঠান (Public Charitable Institutions) নাই এবং আমাদের দেশের ধনিগণ সেদিকে উপযুক্তরূপ দৃষ্টিপাত করেন না। বর্ত্তমান সময়ে এ কথা অনেক পরিমাণে সত্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু হিন্দু সমাজে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের অঙ্গীভূতরূপে যে সব সামাজিক লোকহিতকর অনুষ্ঠানের বিধান আছে, তাহা যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইলে এ অভাব কতদূর নিরাকৃত হয়, এ স্থলে সে বিচারের অবতারণা না করিয়া, কেবল মাত্র ঐ সব দেবোত্তর সম্পত্তির দিকেও যদি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলেও কি ইহা প্রতিপন্ন হয় না যে, সাধারণ লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও এদেশে কম নয় এবং তদুদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত অর্থের পরিমাণও নিতান্ত অল্প নয়? মনীষিগণ যদি নূতন নূতন প্রতিষ্ঠানের

কল্পনা করিয়াও সাহায্যাভাবে বিফলমনোরথ হইয়া দেশী লোক-দিগকে নিন্দা ও আপন মনে আক্ষেপ করার পরিবর্ত্তে এই সব সম্পত্তির উদ্ধারসাধন ও তাহা অভীপ্সিত কার্য্যে নিয়োগ করিবার জন্য নিজেদের শক্তি প্রয়োগ করেন, তবে কি দেশের ও সমাজের একটি বিশেষ কল্যাণের পথ কণ্টকমুক্ত ও প্রশস্ত হয় না ?

এখন বক্তব্য প্রসঙ্গের অনুসরণ করা যাক। প্রত্যেক মঠের মোহান্ত সেই মঠের সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক। তিনি অর্থ-সংগ্রহের ব্যবস্থা করিবেন ; সাধুগণ সেই মঠে অবস্থিতি কালে আহারাচ্ছাদনাদি বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া যাহাতে নিরুপদ্রবে সাধন ভজনে নিযুক্ত থাকিতে পারেন, তদ্বিষয়ে সুবন্দোবস্ত করিবেন ; যে কোন ক্ষুধাতৃষ্ণা পীড়িত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে তাহাকে ভোজন ও আশ্রয় দান করিবেন, কোন দরিদ্র বা নিরাশ্রয় ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে ঔষধ পথ্য শুশ্রূষা প্রভৃতি দ্বারা তাহার যথোচিত সেবা ও স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করিবেন ; আশ্রমস্থ ব্যক্তিমাত্রই যাহাতে আশ্রমের নিয়ম পদ্ধতি যথাযথ রূপে মানিয়া চলেন এবং যাহাতে কাহারও দ্বারা আশ্রমের কোনরূপ অমর্য্যাদা না হয়, তদ্বিষয়ে প্রখর দৃষ্টি রাখিবেন। আশ্রমে যে সময়ে যে উপলক্ষে যে ভাবে যে কাজ সম্পন্ন হওয়া উচিত, তাহা যাহাতে যথাবিধি অনুষ্ঠিত হয় তাহার উপযুক্ত রূপ বন্দোবস্ত করিবেন। দেশের ও দশের কল্যাণার্থে নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে কোন সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে তাহাতে যথাশক্তি অর্থ দান করিবেন, দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতির সময় অন্ন বস্ত্র, ঔষধ পথ্য, টাকা

কড়ি ও লোকজন দ্বারা দুঃস্থদের অভাব মোচনে যথাসাধ্য প্রযত্ন করিবেন। এ সকলই দেবসেবার অঙ্গীভূত। দেবতার সেবা-বুদ্ধিতেই তিনি এই সব কার্য্য করিবেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে স্বয়ং শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

"অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চা বিড়ম্বনম্॥৩।২৯।২১
যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥ ৩।২৯।২২
অহমুচ্চাবচৈ র্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে।
নৈব তুষ্যেঽর্চ্চিতোঽর্চ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ॥ ৩।২৯।২৪
অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদ্ দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা॥" ৩।২৯।২৭

আমি অন্তরাত্মা রূপে সর্ব্বভূতে সর্ব্বদা অবস্থিত। সেই (সর্ব্বভূতে অবস্থিত) আমাকে অবজ্ঞা করিয়া যে মনুষ্য কেবল-মাত্র মন্দিরাদিতে আমার পূজা করে, তাহার পূজা বিড়ম্বনা মাত্র (পূজার অনুকরণ মাত্র, যথার্থ পূজা নহে)। যে ব্যক্তি মূঢ়তা বশতঃ সকল প্রাণীর মধ্যে আত্মস্বরূপে বিরাজমান ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া (প্রাণিবর্গকে উপেক্ষা করিয়া) বিগ্রহাদির অর্চ্চনা করে, সে প্রজ্বলিত হুতাশনকে পরিত্যাগ করিয়া ভস্মেই ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রাণিবর্গকে অবমাননা করে, সে নানারূপ উপচারে আমাকে অর্চ্চনা করিলেও আমি সন্তোষলাভ করি না। অতএব সর্ব্বভূতে মৈত্রী সম্পন্ন হইয়া ও সর্ব্বত্র ভেদ-

বুদ্ধি বর্জ্জন করিয়া, দান ও মান দ্বারা সর্ব্বভূতের দেহে নিবাসশীল ভূতাত্মা স্বরূপ আমাকে অর্চ্চনা করিবে।

স্বয়ং ভগবান্ ভগবদর্চ্চনার যে আদর্শ এইরূপ বহু উপদেশে উপাসকদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, সেই আদর্শ অনুসারে দেবার্চ্চনা করিবার বিশেষ অধিকার ও দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াই, দেব-সেবক মোহান্ত গণ দেবমন্দির ও দেবোত্তর সম্পত্তির কর্ত্তৃত্ব ভার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই রূপ সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার জন্যই মোহান্তপদের সৃষ্টি।

যাঁহার মোহ অন্ত হইয়াছে, তিনিই মোহান্ত নামের ও মোহান্ত পদের উপযুক্ত। যাঁহার মোহ আছে, দেহে আত্মবুদ্ধি আছে, দেহ-সম্পর্কিত বস্তুবিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি আসক্তি আছে, দেহেন্দ্রিয় তৃপ্তির লোভ আছে, যশ মানের আকাঙ্ক্ষা আছে, কাম ক্রোধ লোভের অধীনতা আছে, স্বার্থবুদ্ধি, অর্থলিপ্সা ও কার্পণ্য আছে, তিনি মোহান্ত পদের অনুপযুক্ত। যাঁহার দেবতার প্রতি ভক্তি নাই, মানুষের প্রতি প্রেম নাই, সাধুদের প্রতি শ্রদ্ধা নাই, আর্ত্ত ও দীন দুঃখীর বেদনা যিনি নিজে অনুভব করেন না, তিনি মোহান্ত পদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অসমর্থ। ত্যাগী, ভক্ত, প্রেমিক, তিতিক্ষু, বিচারশীল, লোক-হিত-ব্রত ও কার্য্যদক্ষ সাধুই মোহান্ত পদে অধিষ্ঠিত হইবার উপযুক্ত পাত্র, এবং এইরূপ আদর্শ-সাধু জ্ঞান করিয়াই গৃহী ও সাধু সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি ও পূজা করিয়া থাকেন।

নাথ সম্প্রদায়ের যত মঠ আছে, তাহাদের সকলের কর্ম্মক্ষেত্র সমান নয়, মর্য্যাদা সমান নয়, বিত্তসম্পৎ সমান নয়; সুতরাং

সকল মঠের মোহান্তের পদমর্য্যাদাও সমান নয়। গোরক্ষপুরের মঠ, গোরক্ষনাথের তপোভূমিতে তাঁহারই আসনের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহার বিশেষ মর্য্যাদা আছে, ইহার কর্ম্মক্ষেত্রও প্রশস্ত, বিত্ত সম্পত্তিও যথেষ্ট। গোরক্ষপুর মঠের মোহান্তও পদমর্য্যাদায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ মোহান্ত বলিয়া পরিজ্ঞাত।

নাথ সম্প্রদায়ের মোহান্ত নির্ব্বাচন সম্বন্ধে সাধারণ প্রথা এই যে, প্রত্যেক মঠের মোহান্তের দেহত্যাগের পর তাঁহার সর্ব্বপ্রধান শিষ্যই সেই পদে মনোনীত হইবেন। যদি কোন মোহান্তের শিষ্য না থাকে, অথবা মোহান্ত পদের যোগ্য শিষ্য বর্ত্তমান না থাকে, তবে তাঁহার কোন উপযুক্ত গুরুভাই কিংবা সেই মঠের পূর্ব্বতন কোন মোহান্তের বৃদ্ধতম ও শ্রেষ্ঠতম শিষ্য তাঁহার আসন গ্রহণ করিবেন। আবার, কয়েকটী মঠে বিশেষ নিয়ম আছে। সেসব মঠের মোহান্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু কোন প্রধান মঠের মোহান্তও ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া বা প্রলোভনে পতিত হইয়া মোহান্ত পদের অমর্য্যাদা জনক কোন কার্য্য করিতে থাকিলে, অথবা কোন মোহান্তের তত্ত্বাবধানে মঠের কার্য্যে বিশেষ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে, বার-পন্থী মোহান্তগণ ও সাধুগণ সম্মিলিত হইয়া সম্প্রদায়ের ও সমাজের কল্যাণার্থে সেই মোহান্তকে পদচ্যুত করিয়া অন্য কোন যোগ্য ও অধিকারী সাধুকে সেই পদের জন্য নির্ব্বাচন করিতে পারেন। কিন্তু বর্ত্তমান আইনের দোষে, সেই দুর্ব্বৃত্ত মোহান্তের যথেষ্ট অর্থবল ও লোকবল থাকিলে, অনেক সময় তাঁহারা তাঁহাদের নির্ব্বাচন কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হন না।

বাবা গম্ভীরনাথ যখন নাথসম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার গুরু বাবা গোপালনাথ গোরক্ষনাথ মন্দিরের মোহান্তের আসনে অধিরূঢ় ছিলেন, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তিনি ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২৫ বৎসর সুচারুরূপে মোহান্তের কর্ত্তব্য পালন করেন। তৎপূর্ব্বে বাবা মেহেরনাথ ২৪ বৎসর (১৮৩১—১৮৫৫), বাবা সন্তোষনাথ ২০ বৎসর (১৮১১—১৮৩১), বাবা মনসানাথ ২৫ বৎসর (১৭৮৬—১৮১১), বাবা বালকনাথ ২৮ বৎসর (১৭৫৮—১৭৮৬) মোহান্ত পদে অবস্থিত ছিলেন। বালকনাথের পূর্ব্বে যথাক্রমে বাবা পিয়ারনাথ ও বাবা অমৃতনাথ, এবং তৎপূর্ব্বে বাবা বীরনাথ মোহান্ত ছিলেন। কিন্তু বীরনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী মোহান্তদের নাম জানিতে পারা যায় নাই।

বাবা গোপালনাথের দেহান্তের পর তাঁহার শিষ্য এবং বাবা গম্ভীরনাথের জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা বাবা বলভদ্রনাথজী মোহান্ত হন, এবং তিনি ১৮৮০ হইতে ১৮৮৯ পর্য্যন্ত নয় বৎসর সেই দায়িত্ব বহন করিয়াছিলেন। বাবা গম্ভীরনাথ যখন গভীর সাধনে নিরত, তখন বলভদ্রনাথজীর দেহান্ত হয় এবং তাঁহার শিষ্য বাবা দিলবর নাথ তাঁহার স্থান অধিকার করেন। তিনি ১৮৮৯ হইতে ১৮৯৬ পর্য্যন্ত ৭ বৎসর মন্দিরের সেবা করেন এবং এই সময়ের মধ্যেই প্রস্তর হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ প্রভৃতি দ্বারা মন্দিরের অনেক উন্নতি সাধন করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট তাঁহার দেহান্ত হয়। তখন সাধুদের আগ্রহাতিশয্যে অক্টোবর মাসের প্রথম ভাগে বাবা

গম্ভীরনাথজীকে গোরক্ষপুর আগমন করিতে হয়, ইহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে।

এই সময় যোগিরাজ গম্ভীরনাথ নাথ-সম্প্রদায়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার যশে দিগ্‌দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। কুম্ভমেলায় সকল শ্রেণীর সাধুগণ তাঁহার অনন্যসাধারণ তেজ, গাম্ভীর্য্য, প্রেম ও নিত্য-সমাহিত ভাব দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। অনেক স্বনাম-খ্যাত মহাপুরুষ তাঁহাকে অসীম-শক্তিশালী-মহাপুরুষ বলিয়া নিজ-জনের নিকট পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। এমন একজন সার্থকনামা মোহান্ত নাথ-সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান-ক্ষেত্র গোরক্ষপুরে গোরক্ষনাথ মন্দিরের সেবার ভার গ্রহণ করিলে, ক্ষেত্রের গৌরব, মন্দিরের গৌরব, সম্প্রদায়ের গৌরব। বিশেষতঃ বাবা দিলবর নাথের এমন কোন উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন না, যিনি মোহান্তপদের গুরুভার বহন করিতে সমর্থ, অথবা যাঁহার দাবী অগ্রাহ্য করিলে সাম্প্রদায়িক রীতি অনুসারে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হয়। বাবা গম্ভীরনাথ পূর্ব্বতন মোহান্তের শিষ্য, অধুনাতন মোহান্তের 'চাচাগুরু', এবং বয়সেও প্রবীণ। সুতরাং সাম্প্রদায়িক প্রথা অনুসারে মোহান্ত-পদ লাভে তাঁহারই বিশেষ অধিকার।

সাম্প্রদায়িক সাধুগণ বাবাজীকে মোহান্ত-পদ গ্রহণের জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন এবং নানা যুক্তির অবতারণা করিয়া ইহার সমীচীনতা প্রতিপাদন করিলেন। কিন্তু বাবা গম্ভীরনাথ গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"নেহি"। অগত্যা বাবা বলভদ্র নাথের

অন্যতম শিষ্য এবং বাবা দিলবর নাথের গুরুভাই বাবা সুন্দরনাথ মোহান্তপদে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি মন্দির সেবার গুরুভার বহন করিতে সমর্থ হইবেন কিনা এবং মোহান্তপদের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবেন কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল। যাহা হউক, যোগিরাজ তাঁহাকে মোহান্ত পদে বসাইয়া যথোচিত উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক কিছু দিন পরে স্বকীয় তপোভূমি গয়াধামে ফিরিয়া গেলেন। কোন কোন সাধু বলিয়াছেন যে, গোরক্ষনাথের মোহান্তের আসন শূন্যরাখা রীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া, বাবা দিলবর নাথের মহাসমাধির অব্যবহিত পরেই তৎকালে উপস্থিত সাধুগণ ও ভদ্রলোকগণ যোগ্যতর কোন ব্যক্তিকে সম্মুখে না পাইয়া বাবা সুন্দরনাথকেই মোহান্তের গদীতে বসাইয়াছিলেন। বাবা গম্ভীরনাথ মন্দিরে আগমন করা মাত্র বাবা সুন্দরনাথ স্বয়ংই আসন হইতে উঠিয়া আসিয়া স্বীয় শিরোপা (উষ্ণীষ) বাবাজীর পায়ের নিকট রাখিয়া বলিলেন,—"এই মোহান্তপদ আপনারই প্রাপ্য, আপনিই অনুগ্রহ করিয়া ইহা গ্রহণ করুন।" অন্যান্য সাধুগণ ও ভদ্র-মণ্ডলী মোহান্তজীর প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বাবাজীকে অনেক পীড়াপীড়ি করিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই স্বীকার করিলেন না।

যিনি মোহান্তপদ লাভ করিলেন, অল্প দিনের মধ্যেই তিনি তাঁহার আচার ব্যবহারে ও কার্য্য কলাপে আপনার অনুপযুক্ততা প্রমাণ করিলেন। চরিতার্থ হইবার সুবিধা ও উপকরণের অভাবে তাঁহার যেসব প্রবৃত্তি নিস্তেজ ছিল, তাহারা এখন সুযোগ পাইয়া মস্তক উত্তোলন করিল, দেহেন্দ্রিয়-তর্পণ-রত সঙ্গিগণ আসিয়া জুটিল,

বুদ্ধিতে খাট ধনীব্যক্তির নিকট যেসব প্রলোভন সহজেই উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে লাগিল, কুপরামর্শ তাঁহার কর্ণ কুহরে অনবরত প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার দুর্ব্বল চিত্তকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। ক্রমে আশ্রমে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। সাধুগণের আহার বাসস্থানাদির অভাব হইতে লাগিল, তাঁহারা অনেকেই সেখান হইতে সরিয়া পড়িতে বাধ্য হইলেন। দরিদ্রনারায়ণের সেখানে ভিক্ষার অভাব হইল; দেবোত্তর সম্পত্তি হইতে মোহান্তের পূর্ব্বাশ্রমের পিতামাতা ও পরিজনের ব্যয়ভার বহন করা হইতে লাগিল। মন্দিরের ভিতরে পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের গতিবিধি আরম্ভ হইল। নানা প্রকার অপব্যয়ে আশ্রমের অর্থ উড়িয়া যাইতে লাগিল। গোরক্ষনাথের তপঃ-ক্ষেত্রের,—নাথ-সম্প্রদায়ের কেন্দ্র-ভূমির,—সাধুসজ্জনের আশ্রয়-স্থানের,—দেবতার মন্দিরের,—নানা প্রকার অমর্য্যাদা হইতে আরম্ভ হইল।

বাবা গম্ভীরনাথকে এসব ব্যাপার জানান হইল, সাধুগণ তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন, গোরক্ষপুরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে চিঠিপত্র লিখিতে লাগিলেন। যে নিবিড় আনন্দের রাজ্যে তিনি সদা সর্ব্বদা বিহার করিতেন, সেখানে এসব সংবাদ পৌছায় না। ব্যাবহারিক জগতে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আনাই কঠিন। অবশেষে তাঁহাকে বিশেষভাবে ধরিয়া পড়া হইল। তিনি আসিয়া ব্যবস্থা না করিলে গোরক্ষনাথের মন্দির—তাঁহার গুরুর আশ্রম—একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, ইহা নানাভাবে তাঁহাকে

বুঝাইবার চেষ্টা করা হইল। তিনি তখন পুরী প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া গয়ায় আসিয়াছেন। তিনি আসিতে স্বীকৃত হইলেন। যদিও তাঁহার জ্ঞানদৃষ্টিতে মোহান্তপদের প্রতিষ্ঠা ও নিবিড় অরণ্যে অজ্ঞাতবাস উভয়ই সমান, যদিও রাজপ্রাসাদে ও পার্ব্বত্য গুহায় তাঁহার নিকট কোন পার্থক্য নাই, যদিও তিনি কোন অবস্থাকে হেয়, এবং কোন অবস্থাকে উপাদেয় মনে করেন না, তথাপি নির্জ্জনে নিষ্কিঞ্চন ভাবে লোকালয়ের বাহিরে নিত্য-অবিচ্ছেদে ধ্যানানন্দ উপভোগ করাই যাঁহার স্বভাব, তাঁহার পক্ষে লোক-কোলাহল ও লৌকিক ব্যবহারের মধ্যে আসিয়া অবস্থান করা স্বভাবের প্রতিকূল, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। সেই হেতুই তিনি প্রথমতঃ লোকালয়ে আসিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি প্রেম-প্রধান, তিনি সর্ব্ব-ভূত-হিতে-রত। কাজেই যেখানে লোক-সমাজের কল্যাণের জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া যায়, সেখানে তাঁহার সেই অনিচ্ছা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

এই ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া তাঁহার প্রারব্ধ ও ভগবানের বিধান তাঁহাকে একটি বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে টানিয়া আনিতেছিল। তিনি এ পর্য্যন্ত গুরুর আসন—আচার্য্যের আসন—গ্রহণ করেন নাই। একবার তাঁহাকে দীক্ষা-দানের জন্য পীড়াপীড়ি করাতে তিনি ঈষৎ বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"ক্যা পল্টন করেঙ্গে ?" কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি, তাঁহার প্রারব্ধ, ভগবানের বিধান, তাঁহাকে দিয়া যেন একটি আধ্যাত্মিক পল্টন সৃষ্টি করিবারই সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিল। তিনি লোকালয়

হইতে দূরে, পাহাড়ে জঙ্গলে ও দুর্গম তীর্থ সমূহে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকিলে সে কার্য্য সম্পন্ন হয় কিরূপে ? তাঁহার দেহটিকে লোক-সমাজের দৃষ্টির সম্মুখে একটি প্রধান ও সুগম তীর্থ ক্ষেত্রে বাঁধিয়া রাখা প্রয়োজন। সেখানে তিনি গৃহীকে গৃহীর আদর্শ দেখাইবেন, সাধুকে সাধুর আদর্শ দেখাইবেন, গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসের সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিবেন, কৃপাপ্রার্থী দিগকে কৃপা বিতরণ করিবেন, সংসার-জ্বালাপীড়িত শান্তিপিপাসু সংসারীদিগকে আশ্রয় ও ভরসা দিবেন।

এই সকল কার্য্য তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল বলিয়াই বোধ হয় এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হইল যে তিনি গোরক্ষপুর গমন করিতে বাধ্য হইলেন। ভগবানের বিধান ও জীবের প্রারব্ধ কোন্ পথ ধরিয়া আপনাকে চরিতার্থ করে, তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগোচর। মহাপুরুষগণ অবশ্য জানিয়া শুনিয়া স্বেচ্ছায়ই তাহাতে যোগ দেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি গোরক্ষপুর গমন করেন। স্থানের আব্‌হাওয়া পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। মোহান্ত মহারাজের মস্তক তাঁহার নিকট আপনা আপনি অবনত হইল। তাঁহার কুমন্ত্রিগণ কেহ কেহ স্থানত্যাগ করিল, কেহ কেহ শান্ত শিষ্ট সুবোধ বালকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। বাবাজী সেখানেও সাক্ষিরূপেই বাস করিতে লাগিলেন। 'হাঁ' 'আচ্ছা' 'নেহি' প্রভৃতি ইঙ্গিত দ্বারাই অধিকাংশ কার্য্য সারিয়া দিতেন; কখন কখন দু চারিটী কথা বলিতেন, সর্ব্বদাই অন্তর্মুখ থাকিতেন। অথচ তাঁহার সান্নিধ্যে সকল জটিল বিষয়ই যেন সরল হইয়া যাইত, সকল সমস্যাই সহজে মীমাংসিত হইয়া যাইত। আবার

আশ্রমে রীতিমত সাধুসেবা, অতিথিসেবা, দীনসেবা, জীবসেবা প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত হইল, এবং দেবতার কার্য্য যথাবিহীত রূপে সুসম্পন্ন হইতে লাগিল। অনেক সাধু—যাঁহারা আশ্রমের বিশৃঙ্খলা ও অনাচার দেখিয়া আশ্রম ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন—আবার আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। ধর্ম্মার্থী গৃহস্থগণ আগ্রহের সহিত 'দর্শন' করিতে আসিতে লাগিলেন। যোগীশ্বর মহাপুরুষের শুভ দৃষ্টিপাতে সকলদিকের সুব্যবস্থা হইল।

অনেক সাধু ও স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্রলোক মোহান্তের পদচ্যুতির পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু পদচ্যুতি দূরের কথা, বাবাজী তাঁহার সম্মানেরও বিন্দুমাত্র লাঘব করিলেন না। মোহান্তপদের সম্মান ও পূজা মোহান্তই পাইতে লাগিলেন। বাবাজী নিজে সেবকরূপে মন্দিরের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইলেন। আশ্রম ও তৎসংক্রান্ত সম্পত্তি প্রভৃতির পরিচালনার ভার বাবাজীর উপরই পতিত হইল, কিন্তু মোহান্তের সম্মান গ্রহণ করিতে তিনি রাজী হইলেন না। মোহান্তের সহিত তাঁহার চুক্তি হইল যে, মোহান্ত স্বীয়পদের গৌরব রক্ষা করিবেন, তদুচিত সম্মান পাইবেন, ও উপযুক্ত মাসহারা পাইবেন, কিন্তু আশ্রমের কার্য্য ও বিত্তসম্পৎ প্রভৃতি পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করিবেন না। বাবা গম্ভীরনাথ সম্পত্তি-পরিচালনার জন্য সুদক্ষ বিশ্বাসী কর্ম্মচারী নিয়োজিত করিলেন, এবং উপযুক্ত সন্ন্যাসীদিগের উপর আশ্রমের বিভিন্ন বিভাগের ভার অর্পণ করিলেন। তিনি স্বয়ং উপদ্রষ্টা ও অনুমন্তা হইয়া নিজের ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

আশ্রমের কার্য্য যখন সুচারু রূপে সম্পন্ন হইতে লাগিল, তখন তিনি আবার গয়ায় গিয়া নির্জ্জন বাস আরম্ভ করিলেন, মাঝে মাঝে কর্ম্মচারী ও সাধুগণের আগ্রহে গোরক্ষপুর আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া যাইতেন। তাঁহার অনুপস্থিতি কালে মোহান্তজী কুমন্ত্রিগণের কুপরামর্শে মোহান্ধ হইয়া তাঁহার অধ্যক্ষতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করেন। বাবাজী ১৯০৪ সনে গোরক্ষপুর হইতে গয়ায় গিয়া বৎসরাধিক কালের মধ্যে আর ফিরিলেন না। ইহার মধ্যে মোহান্তজী আশ্রমে আবার যথেচ্ছাচার আরম্ভ করিলেন এবং কর্ম্মচারীদের কার্য্যে নানাপ্রকারে বাধা প্রদান করিতে লাগিলেন। আশ্রমে আবার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। আশ্রমস্থ সাধুগণ, কর্ম্মচারিগণ এবং স্থানীয় পদস্থ ব্যক্তিগণ আবার যোগিরাজ গম্ভীরনাথের শরণাপন্ন হইলেন এবং একপ্রকার জোর-জবরদস্তী করিয়া ১৯০৬ সনে তাঁহাকে আশ্রমে লইয়া আসিলেন। তাঁহার আগমনে মোহান্ত মহারাজের মস্তক অবনত হইল। তখন সকলে মিলিয়া মোহান্তকে পুনরায় একরার-নামা লিখিয়া দিতে বাধ্য করিলেন। তদনুসারে মন্দিরের কোন কার্য্যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে তাঁহার অধিকার রহিল না। কাহাকেও দীক্ষা-দান করিবার অধিকার হইতেও তিনি বঞ্চিত হইলেন। মাস মাস নির্দ্দিষ্ট মাসহারা এবং সাম্প্রদায়িক ব্যাপারাদিতে মোহান্ত-পদোচিত কর্ত্তব্য-সম্পাদন ও সম্মান-প্রাপ্তি—ইহাতেই তাঁহার অধিকার রক্ষিত হইল। তিনি যে সব অপরাধ করিয়াছিলেন, বাবাজী অবশ্যই তাহা ক্ষমা করিলেন, এবং আশ্রমের ও সম্প্রদায়ের

মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তাঁহার অধিকার যতটুকু সংকুচিত করা অবশ্য-প্রয়োজনীয় বোধ হইয়াছিল, তদপেক্ষা অধিক কিছু করিতে রাজী হইলেন না।

আবার সুশৃঙ্খল ভাবে কার্য্য আরম্ভ হইল। দুই বৎসর বেশ চলিল। সাধু এবং ভক্তদিগের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বাবাজীও তদবধি গোরক্ষপুরেই স্থায়ী ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন বোধ হইল যেন, তিনি তাঁহার স্বাভাবিক নির্জ্জন-প্রিয়তা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া সম্পূর্ণরূপে প্রারব্ধ ও ভগবদ্-বিধানের নিকট আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক লোকালয়ে অবস্থিতি স্বীকার করিয়া লইলেন। মহাভারতে এক অবধূত বলিয়াছিলেন,—

"নাভিনন্দামি মরণং নাভিনন্দামি জীবিতম্।
কালমেব প্রতীক্ষেঽহং নিদেশং ভৃতকো যথা॥"

—আমি মরণও অভিনন্দন করি না, জীবনও অভিনন্দন করি না; ভৃত্য যেমন প্রভুর আদেশের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, আমিও সেইরূপ কালের প্রতীক্ষা করিয়া আছি। যোগিরাজ গম্ভীরনাথও তখন হইতে ব্যবহারক্ষেত্রে তদ্রূপ ভাব অবলম্বন করিয়াই অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি যে বিশ্বগুরু ভগবানের বিদ্যাশক্তি বা গুরুশক্তির প্রেরণায় কৃপাপরবশ হইয়া অবিদ্যান্ধ লোক সমূহকে মানব জীবনের আদর্শ দেখাইতে ও জ্ঞানচক্ষু প্রদান করিতে লোক-সমাজের মধ্যে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে যে সদ্গুরুর আসন গ্রহণ করিয়া বহু ধর্ম্মার্থীকে প্রকাশ্যে কৃপা করিতে হইবে, তাহা তাঁহার নিরাবরণ দৃষ্টির নিকট

স্পষ্ট প্রতিভাত হইলেও, তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া তাহার কোন পূর্ব্বাভাস পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।

বাবাজী যখন নিয়তভাবে গোরক্ষনাথ মন্দিরে অবস্থান করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন যে সব বিষয়-লম্পট দুর্ব্বৃত্ত লোক তাঁহার অনুপস্থিতিতে ধনী মোহান্তের সাহায্যে আপনাদের ভোগ বাসনা চরিতার্থ করিবার সুবিধা ভোগ করিতেছিল, তাহারা বিষম সঙ্কটে পতিত হইল। ভোগ প্রবৃত্তি ভয়ঙ্কর প্রবল, অথচ মোহান্তজীর সামান্য মাসহারা হইতে তাহার চরিতার্থ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ আশ্রমে বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ভোগবিলাসের অভিনয় করা নিতান্তই অসম্ভব। কি উপায়ে বাবাজীর হাত হইতে মোহান্তের উদ্ধার সাধন করিয়া তাঁহাকে নিজেদের প্রবৃত্তি-অনুযায়ী পথে চালিত করিতে পারে এবং কালক্রমে তাঁহার, নিজেদের ও আশ্রমের ধ্বংস সাধন করিতে পারে, তাহারা তাহার চিন্তায় বিব্রত হইল। তাহাদের মধ্যে সাধু-বেশধারী ও গৃহি-বেশধারী উভয়ই ছিল। সেই দুর্ব্বৃত্তগণ মোহান্তকে ক্রমাগত উত্তেজিত করিতে লাগিল। এই উত্তেজনার ফলে একবার বাবাজীর দেহনাশের চেষ্টা পর্য্যন্ত হইয়াছিল, এবং সেই উদ্দেশ্যে গুণ্ডাও নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু যাঁহার নিকট জীবন ও মরণে কোনই পার্থক্য নাই, তাঁহার তাহাতে কোন বিকার জন্মিবার সম্ভাবনা কোথায়? আর, তাঁহার প্রারব্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বে তাঁহার দেহপাতেরই বা সম্ভাবনা কোথায়? দুর্ব্বৃত্তদের সে চেষ্টায় কোন প্রকার ফল হইল না। অবশেষে একরার-নামা

অস্বীকার করিয়া আইনের সাহায্যে স্বকীয় ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এবং বাবাজীর বিরুদ্ধে আশ্রম-সম্পত্তির অপব্যবহার প্রভৃতির অভিযোগ আনিয়া তাঁহাকে আশ্রম হইতে সরাইয়া দিবার জন্য মোহান্তকে উত্তেজিত করা হইতে লাগিল। ক্ষীণ-বুদ্ধি মোহান্তজী কয়েক জন কুট-বিষয়-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তির প্ররোচনায় ও সাহায্যে এই কার্য্যে প্রযত্নবান্ হইলেন। বাবাজী এই সময় চিঠি লিখিয়া গয়ার ভূতপূর্ব্ব উকীল, স্বীয় অনুগত-ভক্ত, শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে গোরক্ষপুর নেওয়াইয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত নিম্নোদ্ধৃত বিবরণ হইতেই এই সময় যাহা ঘটিয়াছিল তাহা সহজে বুঝা যাইবে।

"আমি গয়া ত্যাগ করিয়া ঢাকা গেণ্ডারিয়াতে বাস করিতেছিলাম, হঠাৎ (ইংরাজী ১৯০৯ সনের জুন মাসে) বাবার নিজ দস্তখতী এক চিঠি পাইলাম,—বাবা আমাকে তাঁহার নিকট আহ্বান করিয়াছেন; যাইবার খরচ সেখানে পৌঁছিলে দিবেন, ইহাও লিখিয়াছেন। তদনুসারে আমি পত্র পাইয়াই গোরক্ষপুর চলিয়া যাই।

"পূর্ব্বে যে মোহান্তের কথা উল্লেখ করিয়াছি, দুষ্ট লোকের পরামর্শে সে পুনরায় বাবার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে; বর্ত্তমান অবস্থায় কি কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিবার জন্যই, দয়া করিয়া আমাকে তিনি ডাকাইয়া পাঠাইয়াছেন।

"ওকালতী ত্যাগ করিয়া গেণ্ডারিয়া অবস্থান কালে বাবার এই অনুজ্ঞাপত্র পাইয়া আমি গোরক্ষপুরে তাঁহার নিকট উপস্থিত হই।

বর্ত্তমান মোহান্তের সহিত সেই সময়ে তাঁহার আশ্রম সম্পত্তির অপব্যবহার লইয়া মনোমালিন্য চলিতেছিল, এই সূত্রে মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইবারও সূত্রপাত হয়। আমি তথায় যাইয়া দেখি, এই বিবাদ মীমাংসার জন্য নাথ-সম্প্রদায়ী হরিদ্বার, গির্ণার প্রভৃতি বড় বড় মঠের মোহান্তগণ তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। যথাসময়ে গোরক্ষপুরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ একটি সভা করিলেন, তথায় উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া তাঁহারা ও উপস্থিত মোহান্তগণ যাহা হয় একটা নিষ্পত্তি করিবেন। এই সভায় আমি উপস্থিত থাকিয়া দেখিলাম, বাবা চুপ করিয়া মেষ-শাবকটীর মত বসিয়া আছেন। প্রতিপক্ষ প্রকাশ্য সভাতে কত তর্জ্জন গর্জ্জন ও বাবার অযথা নিন্দাবাদ করিতে লাগিল। শুনিয়া আমার রক্ত গরম হইয়া উঠিল; কিন্তু বাবারদিকে চাহিয়া আত্মসংবরণ করিলাম। বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইল, বাবা কিপ্রকারে এতটা সহ্য করিতেছেন। অপর পক্ষের সমস্ত বক্তব্য শেষ হইলে যখন সভাপতি বাবাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তখনই মাত্র অতি ধীরভাবে দুই চারিটা কথা বলিয়া বাবা চুপ করিলেন। আমি তো দেখিয়া অবাক। যাহা হৌক 'সাধু যাঁহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাঁহার সহায়।' বাবারই প্রভাবে, তাঁহারই ইচ্ছানুরূপ নিষ্পত্তি হইয়া দলিল লেখাপড়া হইয়া গেল; কোন গোল আর হইল না—সমস্ত আগুন যেন নিভিয়া গেল। বাহ্যিক ব্যবহারে তাঁহাকে এমন কিছুই করিতে দেখা গেল না বটে, কিন্তু কেমন সুন্দর ভাবেই কার্য্যটী সুসম্পন্ন হইল! ইহা কি দেখিবার বা ভাবিবার বিষয় নহে?

তৎপরদিনের ব্যাপার আরো আশ্চর্য্য জনক। দলিল রেজিষ্টারী করা হইবে, রেজিষ্ট্রার সাহেব উপস্থিত, সভা বসিয়াছে, লোকে লোকারণ্য। প্রতিপক্ষ ইতিমধ্যে কি প্রকারে রেজিষ্ট্রারের মত পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন। মোহান্ত দলিল অস্বীকার করিয়াছেন ও রেজিষ্ট্রার তাহাই মানিয়া লইয়াছেন। বাবা একেবারে চুপ,—একটি শব্দ নাই। সকলেই অবাক্। আমি এই সময়ে চা প্রস্তুত করিতেছিলাম; হঠাৎ কালীনাথ ব্রহ্মচারী দৌড়িয়া আসিয়া বলিল,—'দাদা, শীঘ্র আসুন। সব পণ্ড হইয়া গেল,—দলিল রেজিষ্টারী হইল না। রেজিষ্ট্রার চলিয়া যাইতেছেন।' আমি তৎক্ষণাৎ তথায় যাইয়া দেখি, দলিল ফেরত দিয়া রেজিষ্ট্রার উঠিতেছেন; বাবা বিমনা হইয়া, চুপ করিয়া, নিম্নদৃষ্টি হইয়া বসিয়া আছেন; অন্যান্য মোহান্তগণও বিমর্ষ; হাকিমের সামনে কেহই কিছু বলিতেছেন না। দেখিয়া আমার আর সহ্য হইল না, কেমনই যেন একটা তেজ আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল,— আমি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম,— 'রেজিষ্ট্রার সাহেব! খতম হো গিয়া? হামারা মুল্লুকমে হাজারো হাজারো দলিল রেজিষ্টারী হোতা হ্যায়, লেকিন……'। আমার কেঠে কাপড় পরা, সোনার চসমা চোখে দেওয়া, উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ও উগ্রভাষা শ্রবণ করিয়া, রেজিষ্ট্রার অবাক হইয়া বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'এ কোন্ হ্যায়'? বাবা ধীর ভাবে উত্তর করিলেন, "কলকাতা হাইকোর্টকা উকীল হ্যায়'। অমনি তিনি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন, যেন কত অপরাধী! আমাকে হাতে

ধরিয়া এক গোপনীয় স্থানে লইয়া গেলেন। আমি বলিলাম,—'প্রকাশ্য স্থানে দলিল লেখাপড়া ও স্বেচ্ছায় দস্তখত হইয়াছে, আপনি যদি রেজিষ্টারী না করেন তো আপনার বিরুদ্ধে কমিশনারের নিকট 'এফিডেবিট্' করা হইবে, আর আপনি চলিয়া গেলেই অমনি ফৌজদারী হইবে, এমন কি লোক খুনও হইতে পারে। সমস্ত দায়িত্ব আপনার ঘাড়ে লইতেছেন। মঙ্গল চাহেন তো ন্যায়মত কার্য্য শেষ করুন'। তৎক্ষণাৎ তিনি ফিরিয়া মোহান্তকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি দলিল ও দস্তখত সমস্ত স্বীকার করিলেন। দলিল রেজিষ্টারী হইয়া গেল। আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। বাবাই যে আমা দ্বারা এই কার্য্যটী এই ভাবে করাইলেন, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না; নচেৎ এমন তেজ আসিল কোথা হইতে—যাহা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া একজন বড় রাজকর্ম্মচারীকে প্রকাশ্য ভাবে এইরূপ শাসাইলাম? এই ব্যাপারে বাবার ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য দেখিয়া যে কতটা শিক্ষালাভ করিলাম, তাহা আর কি বলিব।"*

প্রায়ই দেখা যায়, যে সব মহাপুরুষ জ্ঞানধর্ম্মামৃত বিতরণ করিবার জন্য লোক সমাজে বাস করেন, তাঁহাদের জীবনে মাঝে মাঝে বিশেষ সঙ্কটপূর্ণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে। বোধ হয় ইহা করুণাময় বিশ্ববিধাতার একটি বিশেষ বিধান। মহাপুরুষগণ লোক চক্ষুর অন্তরালে পর্ব্বত গুহাদিতে অবস্থিতি কালে কিরূপ সাধন ভজন করেন, কি ভাবে জীবন যাপন করেন, এবং

* মহাত্মা বাবা গম্ভীরনাথজী—২৩-২৬ পৃষ্ঠা।

তাহা দ্বারা কি প্রকার অবস্থা লাভ করেন, তৎসম্বন্ধে সাধারণ লোকে বিশেষ কিছু পরিজ্ঞাত হইতে পারে না, এবং সেই হেতু ধর্ম্মময় জীবনের বৈশিষ্ট্য ও মাধুরী উপলব্ধি করিতেও সমর্থ হয় না। কিন্তু যেরূপ সঙ্কটময় বৈষয়িক ব্যাপারে পতিত হইলে বিষয়ী লোক হতবুদ্ধি হইয়া যায় এবং নানা প্রকার নীতি-বিগর্হিত কার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হয় না, সেইরূপ ব্যাপারের মধ্যে ধর্ম্মপ্রাণ-সাধুগণ কি প্রকার ধীর স্থির নির্ব্বিকার থাকেন এবং কি প্রকার ধর্ম্মানুগত ব্যবহার দ্বারাই সেই সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হন তাহা দর্শন করিয়া তাহারা মহাপুরুষ গণের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে এবং নিজেদের জীবন পরিচালনা সম্বন্ধেও অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারে। সাধারণ লোকের নিকট ধর্ম্মের মহিমা প্রচার করিয়া তাহাদিগকে কল্যাণের পথে আকর্ষণ করিবার জন্যই বোধ হয় করুণাময় বিশ্বগুরু ভগবানের এই ব্যবস্থা। এরূপ বিপদে মহাপুরুষগণ পতিত হন কেন, তাহা জিজ্ঞাসার বিষয় নয়, এরূপ বিপদের মধ্যে তাঁহারা কি রকম ব্যবহার করেন, তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়। সাধারণ লোকে যাহা ভয়ঙ্কর বিপদ মনে করে, ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদিগের নিকট তাহা যে বিপদই নয়, সংসারের কোন ঝঞ্ঝাবাতেই যে তাঁহাদের প্রশান্ত-বাহিনী চিত্ত-নদীতে কোনরূপ বিক্ষোভ উৎপাদন করিতে পারে না, তাঁহারা যে সংসারের সর্ব্বপ্রকার কোলাহলের মধ্যে থাকিয়াও সর্ব্বদা সংসারের ঊর্দ্ধে অবস্থান করিয়া থাকেন, ইহা দর্শন করিয়া মানুষ ধর্ম্মকেই নিরাবিল শান্তির আকর বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে।

মোহান্ত-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে বাবাজীর ব্যবহার দর্শন করিয়া দুই শ্রেণীর লোক দুই ভাবে বিস্মিত ও মোহিত হইয়াছেন। যাঁহারা বিষয়ী (গৃহস্থ হউন বা সন্ন্যাসী হউন), তাঁহারা দেখিলেন যে, বহু বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইয়াও যে মোহান্ত-পদের ঐশ্বর্য্য, মর্য্যাদা ও ক্ষমতা লাভ করিবার জন্য লালায়িত, যাহা লাভ করিলে সাধারণ বুদ্ধির মানব-মাত্রই তাঁহাদিগকে অশেষ ভাগ্যবান্ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, যাহা লাভ করিবার জন্য প্রতিপক্ষগণ লাঠালাঠি, মারামারি, মামলা মোকদ্দমা ও লোক হত্যা পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত, তাহা বাবা গম্ভীরনাথের নিকট নিতান্ত তুচ্ছ, তিনি তাহা হাতে পাইয়াও ত্যাগ করিবার জন্য ইচ্ছুক, তাঁহাকে জোর জবরদস্তী করিয়া টানিয়া আনিয়াও সে পদে বসান শক্ত; আবার যখন তাঁহার হাতে এত বড় আশ্রমের ভার সঁপিয়া দেওয়া গেল, তখনও তিনি নির্ব্বিকার-চিত্তে, অথচ দক্ষতার সহিত, আশ্রমের কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনা করিতে লাগিলেন; পুনরায় যখন প্রতিপক্ষগণ তাঁহার উপর নানা প্রকার দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে নির্য্যাতিত ও আশ্রম-হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন, তখনও তিনি নির্ব্বিকার ও সুপ্রসন্ন-চিত্তে সে সব অত্যাচার ও তিরস্কার সহ্য করিতে লাগিলেন, নিজ হইতে তাহার কোন প্রতিবাদ বা প্রতিকার চেষ্টা করিলেন না। অন্যান্য মঠের মোহান্তগণ ও স্থানীয় ভদ্রলোকগণের বিচার প্রশান্ত ভাবে গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, এই ব্যক্তি

এমন কি বস্তু লাভ করিয়াছেন যে, কোন প্রকার অবস্থা-বিপর্য্যয়ে তাঁহার অন্তঃকরণে ও বাহ্যিক ব্যবহারে কোনরূপ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় না,—জয় পরাজয়, নিন্দা প্রশংসা, লাভ লোকসান বা মান অপমান তাঁহার গাম্ভীর্য্য, স্থিরতা ও প্রসন্নতার বিন্দুমাত্রও লাঘব করিতে পারে না,—তাঁহার মুখশ্রীতে ও কর্ম্মনীতিতে বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে পারে না!

যাঁহারা বৈরাগ্যবান্ বিষয়-বিমুখ অকপট সাধক, যাঁহারা ব্রহ্ম-জ্ঞান, ব্রহ্ম-ধ্যান ও ব্রহ্মানন্দ-রস-পানের কিঞ্চিন্মাত্রও আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, লৌকিক ব্যবহার মাত্রকেই যাঁহারা ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগের ব্যাঘাতকর বলিয়া জানেন, তাঁহারা তিনি মোহান্তপদ তুচ্ছ বোধ করিলেন বলিয়া বিস্মিত হইলেন না, তাঁহাদের বিস্ময়ের কারণ ইহার বিপরীত। যিনি জীবনের অধিকাংশ সময় পর্ব্বত-গুহায় নিবিড় সমাধি-অভ্যাসে অতিবাহিত করিয়াছেন, ব্রহ্মভাবে সমাহিত থাকা যাঁহার স্বভাবে পরিণত হইয়াছে, দেহপাত পর্য্যন্ত নিত্য-নিরন্তর নিরাবিল ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগে ডুবিয়া থাকাই যাঁহার নিকট অভীষ্টতম হওয়ার কথা, তিনি যে সেই অতুলনীয় আনন্দ সম্ভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জগতের কল্যাণের জন্য লোকালয়ে আসিয়া বিষয় কর্ম্মের সহিত যুক্ত হইলেন, ইহাই তাঁহাদের নিকট অধিকতর বিস্ময়জনক। তিনি যে কেবলমাত্র বিষয় কর্ম্মের সংস্পর্শে আসিলেন, তাহা নয়; তৎসংশ্লিষ্ট বিবাদ বিসংবাদ অশান্তিজনক নানা ঘটনা উপস্থিত হইলেও, সম্প্রদায়ের, আশ্রমের, সাধুদের ও জনসাধারণের মঙ্গলের অনুরোধে সেই

সম্পর্ক পরিত্যাগ না করিয়া, তিনি তাহার মধ্যেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। যে বিষয়ের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্রও অভিমান বা মমতা নাই, তাহারই সহিত যুক্ত হইয়া তৎসংশ্লিষ্ট নানা ঝঞ্ঝাবাতে তিনি যেন নিরুপায় দীন জনের মত সমস্ত সহ্য করিতে লাগিলেন; বিক্ষেপ, লাঞ্ছনা ও গোলমাল এড়াইবার জন্য তাহা হইতে দূরে প্রস্থান করিলেন না। ইহাই সূক্ষ্মদর্শী সাধকদের নিকট আশ্চর্য্যজনক বোধ হইতে লাগিল। তাঁহারা বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, জীবের প্রতি প্রেম তাঁহার কত গভীর, যে সমাধির আনন্দকে কতকটা পশ্চাতে ফেলিয়া, জীবের কল্যাণার্থ, ক্লেশ স্বীকারকে তিনি ইষ্টতর বোধ করিতেছেন। কিন্তু গুহানিবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্যাবহারিক জীবন গ্রহণে একদিকে যেমন লোক সমাজের প্রতি তাঁহার সুগভীর প্রেম ব্যক্ত হইয়াছে, অন্যদিকে বিষয় কর্ম্মের সহিত ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগের, বৈষয়িক কোলাহলের সহিত গুণাতীত ভাবে অবস্থানের, সংসারের সহিত সমাধির, যে একটা সামঞ্জস্য সম্ভব, তাহাও তিনি ইহার ভিতর দিয়া জনমণ্ডলীকে শিক্ষা দিয়াছেন। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁহার যোগৈশ্বর্য্য অসীম, তিনি এসব বৈষয়িক ব্যাপারে স্বীয় যোগশক্তির বিন্দুমাত্রও পরিচয় প্রদান করিতেন না, সাধারণ প্রাকৃতজনের মতই সকল কার্য্য করিতেন, সাধারণ ধর্ম্মনিষ্ঠ বুদ্ধিমান্ লোকসমূহ যেরূপ অবস্থায় যেরূপ উপায় অবলম্বন করেন, তিনিও তাহাই করিতেন। তাঁহার অপ্রাকৃতত্ব প্রকাশ পাইত কেবলমাত্র তাঁহার সর্ব্বাবস্থায় সমভাবে

অবস্থানে—নিত্য নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার সুপ্রসন্ন মুখশ্রীতে—সকল গোলমালের মধ্যেও অব্যাহত ব্রাহ্মীস্থিতিতে। এসব কাণ্ড কারখানার মধ্যে তাঁহার স্বীয় আসনে উপবিষ্ট প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তিখানির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনে হইত, যেন প্রবল বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে একটি বিশাল পর্ব্বতরাজ মস্তক উত্তোলন করিয়া নির্ব্বিকার নিশ্চিন্ত উদাসীন-ভাবে আপন মনে অবস্থান করিতেছেন; তরঙ্গ মালা তাহার গাত্রে আঘাতের পর আঘাত করিয়া আপনা আপনি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া চূরমার হইয়া যাইতেছে, তাঁহাতে সে আঘাতের স্পর্শা-নুভূতিরও কোন নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে না। তাঁহার যোগৈশ্বর্য্যের মধ্যে এইটাই সর্ব্বদা প্রকাশ পাইত।

এই সময় হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত গোরক্ষপুরে গোরক্ষনাথ মন্দিরেই বাবা গম্ভীর নাথের স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি মোহান্ত না হইয়াও সর্ব্ববিষয়ে মন্দিরের সর্ব্বে-সর্ব্বা হইলেন। তিনি আশ্রমের অধ্যক্ষ হইলেন। কার্য্যতঃ আশ্রম-সম্পত্তির তিনিই মালিক হইলেন, প্রজাগণের নিকট 'মা বাপ' হইলেন, গৃহস্থের ন্যায় সাধু সেবক ও অতিথি সেবক হইলেন। এক বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে তাঁহার আসন স্থাপিত হইল। নাথ সম্প্রদায়ের নেতৃ-পদে তিনি আসীন হইলেন। অসংখ্য সাধু ও গৃহস্থের দৃষ্টি তাঁহার উপর নিহিত রহিল। তাঁহার অধ্যক্ষতায় আশ্রমে পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল, সাধুগণ ও কর্ম্ম-চারিগণ স্বচ্ছন্দচিত্তে স্ব স্ব কর্ত্তব্য সাধনে তৎপর হইলেন, ধর্ম্মার্থী

গৃহস্থগণ বিষয়-কর্ম্মের অবসরে মন্দিরে আগমন পূর্ব্বক দেবতা ও মহাপুরুষের দর্শন ও পাদস্পর্শ লাভ করিয়া তাপিত চিত্ত শীতল করিতে লাগিলেন। মোহান্ত মহারাজ মাস মাস মাসহারা পাইয়া নিজ মনে আশ্রমের দোতালার উপরে বাস করিতে লাগিলেন, প্রজাগণের মধ্যে সন্তোষ ও শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। কোথাও কোনরূপ বিশৃঙ্খলা নাই।

যাঁহার নেতৃত্বাধীনে এত বড় একটা বিরাট সংসার এরূপ সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালিত হইতে লাগিল, তাঁহার দিকে যখনই দৃষ্টিপাত করা যাইত, তখনই দেখা যাইত তিনি আত্মস্থ, তাঁহার দৃষ্টি বাহিরের দিকে মোটেই নাই। তিনি যেন একটি নির্ব্বিকার শান্তির—তরঙ্গ-বিহীন পরিপূর্ণ-আনন্দের—প্রতিমূর্ত্তিরূপে এই বিকার-ময় সংসারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন। কর্ম্মচারিগণ বৈষয়িক কাজকর্ম্মের নিবেদন করিতেছে, মনে হইত যেন ভক্ত নিজ মনে দেব-প্রতিমার নিকটে তাহার বক্তব্য বিষয় বলিয়া যাইতেছে। বলা শেষ হইল, তিনি সব কথা শুনিয়াছেন কিনা তিনিই জানেন, তিনি একটি 'হাঁ' বা 'নেহি' কিংবা 'আচ্ছা' অথবা প্রয়োজনানুরূপ দু, একটি শব্দ উচ্চারণ করিয়া তাহাদিগের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। এইরূপ, কখনও ভৃত্য আসিয়া আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছে, কখনও কোন পাওনাদার অর্থের জন্য আসিয়াছে, কখনও কোন দরিদ্র ভিক্ষুক সাহায্যের প্রার্থনা করিতেছে, কখনও কোন আগন্তুক আশ্রমে অতিথি হইয়াছে, কখনও সাধুগণ বাসবিসংবাদ করিয়া মীমাংসার জন্য তাঁহার শরণ

লইয়াছে, একই সময়ে হয়ত বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বিভিন্ন প্রকার দরবার লইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত। তিনি অর্দ্ধ বাহ্য অবস্থাতেই মৃদু ভাবে দু একটি কথায় যাহাকে যাহা বক্তব্য তাহা বলিয়া, যাহাকে যাহা দেয় তাহা দিয়া, অতিথি অভ্যাগতদিগের যথোচিত সেবার ব্যবস্থা করিয়া, আবার আত্মস্থ হইতেন। অথচ ইহাতেই সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্ত হইয়া যাইত। তিনি যে সব আদেশ বা উপদেশ আশ্রমবাসী দিগকে দিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত যে আশ্রমসংশ্লিষ্ট ব্যাপারই তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতেছে না, সকলের প্রতি, সকল কর্ত্তব্যের প্রতি, তাঁহার চক্ষু যেন অনবরত ধাবিত হইতেছে; অথচ তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে প্রায় সর্ব্বদাই দেখা যাইত যে, সে চক্ষু নিমীলিত বা অর্দ্ধ নিমীলিত।

ভগবান্ শাস্ত্রে সগুণ ও নির্গুণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। তাঁহার মত সংসারীও কেহ নাই, তাঁহার মত অসংসারীও কেহ নাই। অনন্ত জটিলতা-সঙ্কুল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ব্যাপারের একমাত্র কর্ত্তা তিনি, অথচ তিনি কোন কর্ম্মই করেন না, কোন কর্ম্ম বা কর্ম্ম-ফলই তাঁহাকে স্পর্শ করে না। জাগতিক অনন্ত গুণের, অনন্ত বিকারের, অনন্ত ভাবের অধ্যক্ষ ও আশ্রয় তিনি, অথচ তিনি গুণাতীত, ভাবাতীত, বিকার লেশ-শূন্য, নিত্য আত্মস্বরূপে বিরাজমান। তিনি 'বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ', আবার তিনি 'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্'। এক দিকে 'স এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম' 'স বিশ্বকৃদ্-বিশ্ববিৎ' 'সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ', অন্য দিকে 'ন তস্য কার্য্যং

করণং চ বিদ্যতে' 'সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ'। তিনি পূর্ণরূপে সংসারী, আবার পূর্ণরূপে অসংসারী। ইহা যে কিরূপে সম্ভব হয়, কিরূপে এত বড় বিরাট্ সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম সুচারু রূপে বিহিত বিধানে সম্পন্ন করিয়াও ভগবান্ নিত্য আত্মস্থ নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বিরাজিত আছেন, তাহার আভাস বাবা গম্ভীরনাথের কর্ম্মজীবন দেখিয়া কতকটা ধারণা করা গিয়াছে। শ্রীভগবান্ যে ভাবে নিত্য বিরাজিত থাকিয়া অনাদি অনন্তকাল এই বিশ্ব সংসার পরিচালনা করিয়া অসিতেছেন, সেই ভাবে বিরাজিত থাকিয়াই বাবা গম্ভীরনাথ তাঁহার কর্ম্মজীবনে তাঁহার ক্ষুদ্র সংসার খানি পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন।

গোরক্ষপুরে মঠাধ্যক্ষরূপে দৈনন্দিন জীবন

গোরক্ষপুর আসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবা গম্ভীরনাথের বেশ পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি যখন যেরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে থাকিতেন, তখন তাঁহার বেশভূষা তদনুরূপ হইত। এ বিষয়ে তাঁহার নিজের কোন ভ্রূক্ষেপ না থাকিলেও অবস্থানুসারে ব্যবস্থা হইয়া যাইত। সাধুসমাজেই হউক কি গৃহি-সমাজেই হউক, কোথাও তিনি বেশের বৈশিষ্ট্য দ্বারা কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। যখন তিনি নির্জ্জন কুটীরে বা গুহায় থাকিয়া সাধন ভজনে রত ছিলেন, অথবা পরিব্রাজকরূপে পর্য্যটন করিতেন, তখন তাঁহার পরিধানে একটী মাত্র কৌপীন ছিল, এবং তাহাই তদবস্থার উপযোগী বেশ ছিল। লোকের সংসর্গে আসিলে লোকসমাজের মর্য্যাদা রক্ষার্থে মাঝে মাঝে এক খণ্ড ক্ষুদ্র বস্ত্র বহির্ব্বাসরূপে ব্যবহার করিতেন। এতদ্ভিন্ন, তাঁহার সম্বলের মধ্যে একটী মাত্র কাল কম্বল, একটি কৌরি ও একটি খাপ্‌রা থাকিত। তাঁহার মস্তকে জটাভার ছিল, বদনমণ্ডল ঘন গুম্ফ ও শ্মশ্রুরাজিতে প্রায় আবৃত ছিল। দেহ সাধারণতঃ বিভূতিলিপ্ত থাকিত। তিনি প্রথম যখন গোরক্ষপুরে আসিয়া গোরক্ষনাথ মন্দিরের তত্ত্বাবধানের

প্রতি দৃষ্টিপ্রদান করিতে বাধ্য হন, তখন কৌপীনের উপর একখানি সাদা ধুতি পরিতে আরম্ভ করেন। সাধু-সেবকগণ তৈল, খৈল, দধি প্রভৃতি মাখিয়া ধৌত করিতে করিতে তাঁহার জটাজাল পরিষ্কার করেন, এবং প্রসাধন করিতে করিতে তাঁহার সুদীর্ঘ কেশরাশিকে জটাবন্ধন হইতে মুক্ত করেন। ইহার পরে তিনি যখন গোরক্ষপুর হইতে চলিয়া যান, ও গয়ায় মাধোলালের বাগান-বাড়ীতে অবস্থান করিতে থাকেন, তখন বেশের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। দীর্ঘকাল বাহিরে থাকিলে অবশ্য আবার কেশ জটায় পরিণত হইত, ও কৌপীন সম্বল হইত। ১৯০৬ খৃস্টাব্দ হইতে স্থায়ীভাবে যখন তিনি গোরক্ষপুরের মঠাধ্যক্ষ হইলেন, তখন হইতে তাঁহার বেশভূষায় তাঁহাকে একটি প্রাচীন ও বিশিষ্ট বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মতই দেখা যাইত। পরিধানে কৌপীনের উপর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এক খানা সাদা ধুতি, গায়ে এক খানা সাদা চাদর, পায়ে কাষ্ঠপাদুকা, প্রশান্ত মুখমণ্ডলে সুঘন সুলম্বিত শ্বেত-কৃষ্ণ সগুম্ফ শ্মশ্রুরাজি, মস্তকে আস্কন্ধ বিলম্বিত অর্দ্ধপক্ক কেশজাল। তখন হইতে তিনি খাটুলির উপরে কম্বলশয্যায় শয়ন ও উপবেশন করিতেন। তাঁহার বাঙ্গালী শিষ্যগণ তাঁহাকে এই বেশেই দর্শন করিয়াছেন।

মোহান্তের বাসের জন্য যে দ্বিতল অট্টালিকা আছে, তাহার নীচের তালায় একপার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে তিনি বাস করিতেন। সেই কক্ষটিই তাঁহার শয়ন ঘর, বসিবার ঘর, অফিস ঘর, জিজ্ঞাসুদিগকে উপদেশ দিবার ঘর। সেই ঘরে একখানা

খাট ছিল, তিনি তাহার উপর আসনস্থ হইয়া অধিকাংশ সময় অর্দ্ধবাহ্যাবস্থায় থাকিতেন। নীচে এক খানি সতরঞ্চ পাতা থাকিত; সাধুগণ, ভক্তগণ, কর্ম্মচারিগণ, তথায় উপবেশন করিতেন এবং প্রয়োজনানুসারে স্ব স্ব বক্তব্য নিবেদন, ও আদেশ বা উপদেশ গ্রহণ করিতেন।

সর্ব্ব-বন্ধন-বিনির্ম্মুক্ত মহাপুরুষের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ রীতিমত নিয়মবদ্ধ ভাবে সম্পাদিত হইত। আমরা যে সময়ে তাঁহাকে দেখিয়াছি, তখন তিনি রাত্রি তিন ঘটিকার সময় শয্যার উপরে উঠিয়া বসিতেন। তিনি কতক্ষণ নিদ্রা যাইতেন, তাহা বলিতে পারি না। তবে তিনটার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাধারণতঃ তিনি শয়ন করিয়া থাকিতেন। ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত শয্যার উপরেই যোগাসনে বসিয়া তিনি গভীর সমাধিজনিত বিশেষ আনন্দ সম্ভোগ করিতেন। ৫টার পর মলমূত্র ত্যাগান্তে এক একটি এরণ্ডের চারা কাটিয়া একহস্ত পরিমিত করিয়া তদ্দারা তিনি দাঁতন করিতেন। দাঁতন করিতে করিতে তিনি সমস্ত কাষ্ঠখণ্ড গলার ভিতর দিয়া কয়েকবার উদর পর্য্যন্ত প্রবেশ করাইয়া দিতেন ও বাহির করিয়া আনিতেন। ইহাকে ব্রহ্মদাঁতন বলা হয়। তৎপর পরিষ্কাররূপে হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিয়া অল্প কতটুকু সময়ের জন্য বাহিরে আসিতেন, এবং গোরক্ষনাথ মন্দিরের সম্মুখস্থ একটি সমাধি মন্দিরের উন্মুক্ত রোয়াকের এক কোনে উপবেশন করিতেন। সাধারণতঃ তখন তিনি একাকীই বসিতেন, তবে কাহারও বিশেষ প্রয়োজনীয় কোন বিষয় নিবেদন করিতে হইলে,

তখন তাহা করা যাইত। ইহার পরে স্বীয় কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি আবার আসনস্থ হইতেন। বেলা ৮ ঘটীকা পর্য্যন্ত কক্ষের দরজা বন্ধ থাকিত। ৮টা হইতে ১০॥টা কি ১১টা পর্য্যন্ত সেই কক্ষে লোকজনের যাতায়াত হইত। তিনি স্বীয় আসনে স্বভাব-সিদ্ধ অন্তর্মুখ অবস্থাতেই উপবেশন করিয়া থাকিতেন, যাঁহার যাহা বক্তব্য ও শ্রোতব্য, তিনি তাহা বলিয়া ও শুনিয়া যাইতেন। এই সময় কোন কোন দিন তাঁহাকে মন্দিরের হিসাব লিখিতেও দেখা গিয়াছে, দর করিয়া জিনিষ রাখিতেও দেখা গিয়াছে, মামলা মোকদ্দমার কথা শুনিতেও দেখা গিয়াছে, কিন্তু কোন সময়েই ভাবের বৈলক্ষণ্য বা চাঞ্চল্যের লক্ষণ দেখা যায় নাই।

তৎপর তিনি স্নানাহার করিতেন। শ্রীশ্রীনাথজীর ভাণ্ডারা তৈয়ারী হইলে, অন্যান্য সাধুদের জন্য যাহা প্রস্তুত হইত, তাঁহার জন্যও ঠিক তাহাই প্রস্তুত হইত এবং তিনি তাহাই আহার করিতেন। মোহান্তের ন্যায় নিজের জন্য কোনরূপ বিশেষ ব্যবস্থা তিনি অনুমোদন করিতেন না। কাহাকেও দীক্ষা প্রদান করিতে হইলে, স্নানের পরই তাহা করিতেন, তৎপরে আহার করিতেন। আহারান্তে ৩টা বা ৩॥০টা পর্য্যন্ত তিনি বিশ্রাম করিতেন। তখন কেহ কোন কথা নিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত না। গরমের দিনে কখন কখন বাতাস করিবার জন্য কোন একটি সেবক উপস্থিত থাকিত। ৩॥০টার পর হাতমুখ প্রক্ষালন করিয়া আবার সেই খোলা জায়গায় সমাধি মন্দিরের রোয়াকের উপর তিনি আসন গ্রহণ করিতেন।

তখন অনেক দর্শনার্থী দর্শন ও প্রণাম করিতে আসিত। সেই রোয়াকের উপরই একখানা সতরঞ্চ পাতা থাকিত, সেখানে আসিয়া উপস্থিত সাধু ও ভদ্রলোকগণ উপবেশন করিতেন। তখন তাঁহাদের সহিত তিনি দু' চারটা কথাও বলিতেন। ক্রমে ক্রমে, বিশেষতঃ বাঙ্গালীদের সমাগমের পরে, তাহাদের আন্তরিক আগ্রহে তিনি সামান্য কিছু বার্ত্তালাপের অভ্যাস করিয়াছিলেন। লোক সকল তাঁহার মুখের দু' একটি কথা শুনিবার জন্য সাগ্রহ-চিত্তে উন্মুখ হইয়া থাকিত, তিনি ভাবাবিষ্ট অবস্থাতেই সময় সময় তাহাদের সহিত কিছু কিছু সৎপ্রসঙ্গ করিতেন।

সন্ধ্যাসময়ে গোরক্ষনাথ মন্দিরের আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিত। প্রায় এক ঘণ্টা ব্যাপিয়া মন্দিরে মধুর আরতি হইতে থাকে। সকলেই তখন নীরব। তিনিও তখন আত্মসমাহিত হইয়া বসিয়া থাকিতেন। আরতির পরে আশ্রমস্থ সকল সাধুর একত্রে সাত বার মন্দির প্রদক্ষিণ করিবার নিয়ম। তিনিও সাধুদের সহিত মিলিত হইয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেন এবং সাম্প্রদায়িক নিয়মানুযায়ী শ্রীশ্রীনাথজীর আসনের সম্মুখে প্রণামাদি করিতেন। তৎপর তিনি স্বীয় গুরু গোপালনাথজীর সমাধি মন্দির প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিতেন। পুনরায় আসিয়া সেই আসনে নীরবে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিতেন। সেই সময় আশ্রমবাসী সাধুগণ শ্রীশ্রীনাথজীকে ও মোহান্তজীকে প্রণাম করিয়া আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেন। বাহিরের যে সব ভদ্রলোক তখন সেখানে উপস্থিত থাকিতেন, তাহারাও মন্দির ও বাবাজীকে প্রণাম করিয়া ক্রমে ক্রমে বিদায়

গ্রহণ করিতেন। এইরূপে দুই ঘণ্টার অধিক রাত্রি কাটিয়া গেলে তিনি স্বীয় কক্ষে ফিরিয়া আসিতেন।

শীতকাল ব্যতীত অন্য সময় রাত্রিতে তিনি প্রায় কক্ষের ভিতরে শয়ন করিতেন না। বারান্দায় একখানা ছোট খাটুলিতে শয়ন করিতেন। তখন আরতির পর ফিরিয়া আসিয়া আর কক্ষে প্রবেশ করিতেন না, বারান্দায় খাটুলীর উপরই উপবেশন করিতেন। আশ্রমের রাত্রিকালীন ভোজনাদি ব্যাপার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বসিয়াই থাকিতেন। শিষ্য ও ভক্তগণের পক্ষে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিবার এবং নিজ নিজ সাধ্য-সাধন-বিষয়ক সংশয় ও ভ্রান্তি নিরসন করিয়া লইবার ইহাই প্রকৃষ্ট সময় ছিল। আশ্রম-কার্য্য শেষ হইলে সকলকে 'আরাম' করিতে উপদেশ দিয়া তিনি নিজেও শয়ন করিতেন। তখন সেবাপরায়ণ ভক্তগণ সময় সময় তাঁহার হস্তপদাদি মর্দ্দনরূপ সেবা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইতেন।

তাঁহাকে কোন ঘড়ী ব্যবহার করিতে দেখি নাই। অথচ তাঁহার যে সময়ের যে কাজ, তাহা ঠিক সময়েই সম্পাদিত হইতে দেখা যাইত। তিনি সময়ের সদ্ব্যবহার ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদনের আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন।

দেশের ও জগতের সংবাদ রাখা ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা চিন্তাক্ষম ব্যক্তিমাত্রেরই একটি বিশেষ কর্ত্তব্য, ইহা প্রদর্শন করিবার জন্যই বোধ হয় তিনি যখন বৈকালে বাহিরে রোয়াকের উপরে আসিয়া বসিতেন, তখন সংবাদপত্র পাঠক ভদ্রলোকদের নিকট হইতে সাময়িক বিশেষ বিশেষ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতেন ও

তৎসম্বন্ধে দু' একটি মন্তব্য করিতেন। ইউরোপীয় যুদ্ধের সময় শ্রীযুত হেমন্ত বিহারী ঘোষাল নামক তাঁহার একজন এলাহাবাদ প্রবাসী বাঙ্গালী ভক্তশিষ্য (তিনি তখন গোরক্ষপুরে রেলওয়ে পুলিস বিভাগে চাকুরী করিতেন) নানা ইংরেজী সংবাদ পত্র হইতে বিশেষ বিশেষ বৃত্তান্ত যত্নের সহিত সংগ্রহ করিয়া আনিয়া প্রতিদিন বৈকালে উর্দ্দু ভাষায় তাঁহাকে শ্রবণ করাইতেন। তিনি মাঝে মাঝে 'হাঁ', 'হুঁ' উচ্চারণ করিয়া, কখনও এক আধটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া, কখনও এক আধটী মন্তব্য প্রকাশ করিয়া, বক্তার উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। তখন সেখানে বহু সাধু ও গৃহী উপস্থিত থাকিতেন। সকলেই আনন্দের সহিত এসব সংবাদ শ্রবণ করিতেন। মাঝে মাঝে দেশের সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক বা ধর্ম্মনৈতিক বিশেষ বিশেষ ঘটনা তাঁহার নিকট বর্ণন করিয়া তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করা হইত। তিনি তাঁহার অঙ্গুলি ঈষৎ সঞ্চালিত করিয়া, অতি শ্রুতিমধুর সুললিত সহজ হিন্দি ভাষায় দু' চার কথায় সে সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেন। এইরূপে তিনি দেশের ও জগতের সমষ্টিগত জীবনের সহিত আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের যোগরক্ষা করিতে শিক্ষা দিতেন।

যথার্থ অভাব লইয়া কোন প্রার্থী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে কখনও প্রত্যাখ্যাত হইত না। অর্থদ্বারা, বস্ত্রদ্বারা, আহারের ব্যবস্থা দ্বারা—একজন সাধারণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ গৃহস্বামী বা মঠস্বামীর যে সব উপায়ে অর্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করা উচিত, সেই সব উপায়ে তিনি যাচকদের প্রয়োজনানুরূপ বন্দোবস্ত

করিয়া দিতেন। প্রজাগণের কোন অভাব অভিযোগ উপস্থিত হইলে, শিশু যেমন পিতার নিকট দৌড়িয়া গিয়া আবদার করে, সেইরূপ, তাহারা বাবাজীর নিকট দৌড়িয়া গিয়া তাহাদের অভাব অভিযোগের বিষয় জানাইয়া আবদার করিত। শিশুর যেমন পিতামাতার উপর দাবী থাকে, তাহাদেরও যেন বাবাজীর উপর তদ্রূপ দাবী ছিল। যদিও তিনি সর্ব্বদাই অন্তর্মুখ থাকিতেন, এবং তাহাদের কথায় উত্তর প্রত্যুত্তর প্র য়ই করিতেন না, তথাপি তিনি যখন তাহাদের দিকে তাকাইতেন, তখন সেই দৃষ্টির ভিতর হইতে স্নেহ ও করুণাধারা এমন ভাবে প্রবাহিত হইত যে, তাহাতেই যেন তাহারা প্লাবিত হইয়া যাইত ; তাহাদের অভাবের জ্বালা কমিয়া যাইত, এবং তাহাদের অভাব অভিযোগের কারণ যে নিরাকৃত হইবে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিত না। তিনিও এমন ব্যবস্থা করিয়া দিতেন, যাহাতে প্রজাদের দুঃখের লাঘব হয়, সন্তোষ ও শান্তি বর্দ্ধিত হয়।

ডাকঘর বা টেলিগ্রাফের পিয়ন যখন মনি-অর্ডার বা টেলিগ্রাম নিয়া আসিত, তখন তিনি তাহাদিগকে প্রতিবারই এক আনা বা দুই আনা করিয়া বক্‌সিস্ দিতেন। একবার তিনি উপস্থিত একজন ভক্তকে আদেশ করিলেন 'উন্‌কো দো আনা দে দাও'। ভক্তটি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ভদ্রলোক। তিনি প্রতিবাদ করিয়া বাবাজীকে যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, ইহারা ইহাদের কার্য্যের জন্য সরকার হইতে রীতিমত মাসিক বেতন পায়, এই কার্য্য কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিতে

ইহারা আইনতঃ বাধ্য, ইহাতে পুরস্কারযোগ্য কিছু নাই। একজন পুরস্কার দিলে যাহারা পুরস্কার দিবে না, তাহাদের প্রতি কর্ত্তব্য পালনে ইহাদের অবহেলা আসিতে পারে, ইত্যাদি। তাঁহার বক্তব্য বাবাজী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মৌনভাবে শ্রবণ করিলেন, এবং তাঁহার বক্তব্য শেষ করিয়া তিনি যখন নীরব হইলেন ও বাবাজীর আদেশ শুনিবার জন্য চাহিয়া রহিলেন, তখন বাবাজী তেমনি মৃদুভাবে আবার বলিলেন 'দো আনা দে দেও' ভক্তটি অপ্রতিভ হইয়া বাবাজীর তহবিল হইতে দুই আনা বাহির করিয়া পিয়নকে প্রদান করিলেন। পিয়ন প্রণাম করিয়া বিদায় লইল। তৎপর ভক্তটি স্বীয় ধৃষ্টতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বাবাজী তাঁহাকে ধীরভাবে নিজের উদ্দেশ্যটি বুঝাইয়া দিলেন যে, ইহারা সরকার হইতে যে বেতন পায়, তাহা তাহাদের অভাবের তুলনায়, পরিশ্রমের তুলনায় ও দায়িত্বের তুলনায় খুব অল্প, ইহারা দরিদ্র, যাহাদের সামর্থ্য আছে, তাহাদের নিকট ইহারা কিছু কিছু প্রত্যাশা করে, কিছু কিছু পাইলে ইহাদের কর্ত্তব্য-সাধনে উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়, অভাবের তাড়নাতেই এবং পরিশ্রম ও দায়িত্বের অনুপাতে অর্থ না পাইলেই অনেক সময় কার্য্যে শৈথিল্য আসে, ভয়ে কার্য্য করা অপেক্ষা উৎসাহের সহিত কার্য্য করিলে কার্য্যও ভাল হয়, নিজেরও কল্যাণ হয়।

সাধু ও ব্রাহ্মণদিগকে তিনি তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইতে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন। উৎসবাদি উপলক্ষে তিনি তাঁহাদিগকে ভোজন করাইয়া বস্ত্রাদি দান করিতেন। তিনি

যখন আশ্রম হইতে কোথাও যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেন, তখনও যাত্রা-মঙ্গলের অঙ্গীভূত ভাবে তিনি সাধু ও ব্রাহ্মণদিগকে তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইয়া ও দরিদ্রদিগকে পয়সা বিতরণ করিয়া, যাত্রা করিতেন। তিনি সাধু ব্রাহ্মণদের তৃপ্তির জন্য কখন কখন উৎসব সৃষ্টি করিতেন। বিশেষ বিশেষ ঋতুতে বিশেষ বিশেষ ফল বা খাদ্য সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সে সব জিনিষ প্রচুর পরিমাণে সাধু ও ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবার জন্য তিনি প্রায় ঋতুতেই এক একটি উৎসব করিতেন। গোরক্ষনাথ মন্দির-সংশ্লিষ্ট অনেক আম বাগান আছে এবং তাহাতে প্রচুর আম জন্মে। আম মন্দিরে আসিলে তিনি বিশেষ ভোজের বন্দোবস্ত ত করিতেনই, তদ্ভিন্ন তিনি বহু লোককে আম বিতরণ করিতেন।

সাধু ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করিলে তাঁহাদের ভোজনাদি ব্যাপারে কোনরূপ বিঘ্ন না হয়, তাঁহাদের তৃপ্তির কোনরূপ ব্যাঘাত না হয়, কেহ অভুক্ত বা অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় ফিরিয়া না যায়, কাহারও আদর অভ্যর্থনায় কোনরূপ ত্রুটি না হয়, এসব বিষয়ে তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন, এবং তজ্জন্য প্রয়োজন হইলে কখন কখন একটু ঐশ্বর্য্যও প্রকাশ করিতেন।

এ সম্বন্ধে দু' একটি ঘটনা শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। একবার মন্দিরে ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণ। যতলোক নিমন্ত্রণে যোগদান করিবার সম্ভাবনা, তাহা হিসাব করিয়া দ্রব্যসম্ভার প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু আহারের সময় দেখা গেল যে যতজন ব্রাহ্মণের জন্য

আয়োজন করা হইয়াছে, তাহার দ্বিগুণ অপেক্ষাও অধিক সংখ্যক ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। যাঁহাদের উপর এ কার্য্যের ভার অর্পিত ছিল, তাঁহারা দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণকে অভুক্ত ফিরাইয়া দেওয়া অকল্পনীয়, অথচ যে পরিমাণ ভোজ্য সামগ্রী আছে, তাহাতে সংকুলান হওয়াও অসম্ভব। তাঁহারা উপয়ান্তর না দেখিয়া বাবাজীর নিকট দৌড়াইয়া গিয়া এ বিষয় নিবেদন করিলেন। তিনি সঙ্কট অবস্থা বিবেচনা করিয়া, একখানা নূতন চাদর খুলিয়া দিলেন, এবং সেই চাদর দ্বারা খাদ্য সামগ্রী আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়া একদিক হইতে পরিবেশন করিতে আদেশ করিলেন। শেষে দেখা গেল যে সকলে তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া যাওয়ার পরেও কতক পরিমাণ জিনিষ অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে!

আর একবার আমের দিনে শুধু আমের নিমন্ত্রণ। সে দিনও লোকের সংখ্যা অপ্রত্যাশিতরূপে এত অধিক হইয়াছিল যে, যত আম গৃহে আছে, তাহাতে তাহাদিগকে তৃপ্তির সহিত ভোজন করান অসম্ভব। বাজার হইতে আম কিনিয়া আনিবারও তখন সময় ছিল না। সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। 'স্থিরবুদ্ধি-রসংমূঢ়ঃ' মহাপুরুষ তখন ধীরভাবে আদেশ করিলেন যে, সমস্ত আম এই খাটের নীচে আনিয়া রাখ। আম আনীত হইলে তিনি তাহা এক খানা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিলেন, এবং এক পার্শ্ব হইতে খরচ করিতে বলিলেন। সে দিনও সকলের তৃপ্তির সহিত প্রচুর পরিমাণে ভোজনের পরও অনেক আম অবশিষ্ট রহিল!

এইরূপে, অতিথি-সেবার কোনরূপ ত্রুটী না হয়, তজ্জন্য মাঝে মাঝে তাঁহার ব্যাবহারিক জীবনের সাধারণ নিয়ম কতক পরিমাণে উল্লঙ্ঘন করিয়া, সেবাধর্ম্ম যে কত বড়, তাহাই তিনি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যার্থীদিগকে বিদ্যালাভে সাহায্য করা তিনি একটি প্রধান কর্ত্তব্য-কর্ম্ম বলিয়া শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাহায্যে অনেক গরীব বিদ্যার্থী বিদ্যালাভে সমর্থ হইয়াছে। অকপট বিদ্যা-লাভেচ্ছু কোন বালক বা যুবক সাহায্যের জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি অন্ন বস্ত্র অর্থ প্রভৃতি দ্বারা যথাসাধ্য (লৌকিক ভাবে) তাহার বিদ্যালাভের সুবিধা করিয়া দিতে চেষ্টা করিতেন। অতিথি-সেবায় তিনি যেরূপ আগ্রহ ও পটুতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, বিশেষ ধর্ম্মনিষ্ঠ কর্ত্তব্যপরায়ণ গৃহস্থদের মধ্যেও সেরূপ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। কোন অতিথি গোরক্ষনাথ মন্দিরে সমাগত হইলে, তাঁহার যখন যাহা প্রয়োজন হওয়ার সম্ভাবনা, তাহা পূর্ব্বেই বুঝিয়া তিনি তদনুরূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেন। নিত্য-নিরন্তর সমাহিত ভাবে অবস্থিতি সত্ত্বেও, কোথায় কোন্ অতিথি কিরূপ অসুবিধা বোধ করিতেছেন, অথবা কোন্ সময় কাঁহার কোন্ জিনিষের আবশ্যকতা উপস্থিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে তাঁহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিত। তাঁহার অন্তর্মুখ অবস্থাতেই মাঝে মাঝে হঠাৎ তিনি সম্মুখস্থ কোন ভক্ত বা সেবককে আদেশ করিতেন যে আশ্রমের অমুক স্থানে কয়েক ব্যক্তি আছেন, তাঁহাদিগকে শীঘ্র অমুক অমুক জিনিষ দিয়া আইস, অথবা অমুক বিষয়ের বন্দোবস্ত

করিয়া দিয়া আইস। তিনি নিজে অনেক সময় উপস্থিত হইয়া অতিথিদিগের সুবিধা অসুবিধার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেন, এবং নানাভাবে তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিতেন। একই সময়ে বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত, বিভিন্ন জাতীয় বহু অতিথি আশ্রমে উপস্থিত হইলেও, সকলেই অনুভব করিতেন যে মঠ-স্বামী বাবা গম্ভীরনাথের আতিথ্য-পূর্ণ সযত্ন দৃষ্টি তাঁহাদের প্রত্যেকের উপরই নিবদ্ধ আছে। এ বিষয়েও প্রয়োজনানুরোধে কখন কখন তিনি এক আধটুকু অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়া ফেলিতেন।

কয়েক জন বাঙ্গালী ভক্ত সপরিবারে আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন, মন্দিরের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী বাগানে তাঁহাদের বাসস্থান নিরূপিত হইয়াছে, ভাণ্ডার হইতে চাউল, দাল, তরকারী, মসল্লা, কাঠ, প্রভৃতি সব সেখানে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা পাক আরম্ভ করিয়াছেন। বাবাজী ভক্ত সঙ্গে তাঁহার গৃহে বসিয়া আছেন। হঠাৎ তিনি দুই জন সেবককে ভাল কিছু জ্বালানি কাঠ বাগানে দিয়া আসিবার জন্য আদেশ করিলেন। তাঁহারা অবাক্ হইয়া তৎক্ষণাৎ কাঠ মাথায় করিয়া বাগানে লইয়া গিয়া দেখেন যে, পূর্ব্বের কাঠগুলি ভিজা থাকায় সেখানে পাকের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। এরূপ ঘটনা আরও অনেকবার দেখা গিয়াছে।

শ্রীযুত সারদা কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত 'বাবা গম্ভীরনাথজী' গ্রন্থে শ্রীযুক্ত অভয় নারায়ণ রায় মহাশয় বাবাজীর অতিথি-সেবার একটি উজ্জ্বল বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা এস্থানে উদ্ধৃত করিলে তাঁহার অতিথি-সেবা কিরূপ ছিল, তাহা

বাবা গম্ভীর নাথ, ৺ যোগজীবন ও অভয়বাবু

অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হইবে। তাঁহারা ১৯০২ বা ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে গোরক্ষপুরে গমন করিয়া বাবাজীর অতিথিরূপে কিছু দিন ছিলেন।

"বাবা গম্ভীরনাথজীর গোরক্ষপুর আশ্রমে স্বর্গীয় যোগজীবন গোস্বামী প্রভৃতির সহিত আমি একবার গিয়াছিলাম। আমাদিগকে তিনি যে প্রকার দরদ ও আদরের সহিত সেবা করিয়াছিলেন, ওরূপ আমি কুত্রাপি দর্শন করি নাই। গৃহীলোকে কদাচ ওরূপ সেবা করিতে জানেন না, ও পারেন না। আমরা যখন গিয়ে আশ্রমে পৌঁছি, তখন তিনি দোতালায় ছিলেন, আমরা আসিয়াছি শুনিবা মাত্র নীচে নামিয়া আসিলেন, এবং মধুর হাসিয়া সুস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে আপ্যায়িত করত গ্রহণ করিলেন।

"আমাদিগের বাসের নিমিত্ত তাঁহার ঘরের পার্শ্ববর্ত্তী একটি ঘর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। ভূমিতে বিচালি বিছাইয়া গদির মত পুরু করিয়া দেওয়াইলেন, আমরা তাহার উপর নিজ নিজ আসন করিলাম।

"খুব ভোরে তিনি স্নানাদি করিয়া আমাদের শয়ন-গৃহে আসিয়াছেন। আমি জাগ্রত হইয়া দেখি, ধুনি নির্ব্বাণ হইয়াছিল, তাহা তিনি স্বহস্তে জ্বালাইয়া দিতেছেন। ভোরে উঠিয়া পায়খানায় গিয়াছি; তিনি নিজের হাতে দন্তকাষ্ঠ কোমল করিয়া তৈয়ার করত আমাদের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। পায়খানা জঙ্গলে যাইতাম, আসিতে গৌণ হইয়াছে, কেন গৌণ হইতেছে উদ্বিগ্ন হইয়া নিকটে আসিয়া এধার ওধার তাকাইয়া অনুসন্ধান করিতেন।

"পায়খানা হইতে আসিয়া স্নান করিব, গরম জলে না ঠাণ্ডা জলে স্নান করিব, জিজ্ঞাসা করিলেন। বাঙ্গালী লোকে তৈল ব্যবহার করে জানিতেন, তাই চিন্তা করিয়া ফুলের তেল বাজার হইতে খরিদ করিয়া দেওয়াইলেন। আহারান্তে বিশ্রাম করিতে আসনে গিয়াছি, ভৃত্য পাঠাইয়া দিয়াছেন, আমাদের গা পা মলিয়া শারীরিক ক্লেশ দূর করিয়া সেবা করিবার নিমিত্ত। ভৃত্যটিকে আমাদিগের কাছে রাখিয়া দিয়াছিলেন, আমাদের তামাকাদি দিবার নিমিত্ত ও টহলের নিমিত্ত। আমরা তাঁহারই সহিত ভোজন করিতে ইচ্ছুক জানিয়া একত্র ভোজনের বন্দোবস্ত করিলেন। আমার ইচ্ছা হইল তাঁহার প্রসাদ পাই, তিনি হেসে হেসে দীনহীন ভাবে বলিলেন 'নেই নেই' ; পরে দয়া করিয়া সকলকেই প্রসাদ দিলেন।

"একদিন ঢাকার শ্রীযুত চারুচন্দ্র দাস শয়ন কালে গৃহে বসিয়া মৎস্যাহার করিতে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করত পরস্পর গোপনে কথোপকথন করিতেছেন। পরদিন দেখি, ভোরবেলা একজন মুটিয়া এক ঝোঁকা বড় বড় মৎস্য লইয়া আসিয়া হাজির হইয়াছে। বাবা দেখিয়া তাঁহার কৃপাপাত্র কালীনাথ ব্রহ্মচারীকে বলিলেন 'বাঙ্গালী লোক মৎস্যাহার করিতে খুব ভালবাসে। তুমি নিজে গিয়ে এই মৎস্য রসুই কর। রসুই করিয়া আমাকেও আহার করিতে এক কটোরা দিবে'।

"বৈকাল বেলা দেখিলাম, ভাল ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, বাবা গাড়োয়ানকে বলিলেন 'ইহাদিগকে সহর দর্শা করাইয়া লইয়া আইস'।

"একদিন নর্ত্তকীরা (বাইজী) নৃত্য করিতে আসিয়াছে। বাবা নর্ত্তকাদিগকে বলিলেন 'যাও, মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরজীর নিকট নৃত্য-গীত কর'। তিনি যোগজীবন, চারু প্রভৃতি আমাদিগকে লইয়া গিয়া নৃত্য দর্শন করিতে লাগিলেন। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, স্ত্রীলোকের নৃত্য বাবা আমাদিগকে লইয়া দর্শন করিতেছেন। যেই এই কথা মনে আসিল, বাবা আমাকে বলিলেন 'স্ত্রীপুরুষ ভেদ নেহি রহনা চাহিয়ে, এইসা ভি অবস্থা হ্যায়'। আমি ইহা শুনিয়া আমার মনের ভাব টের পাইয়াই এরূপ বলিতেছেন ভাবিয়া লজ্জিত হইলাম।

"আমরা বাড়ী আসিবার দিন নির্দ্দিষ্ট করিলাম। বাবা আসিয়া আদর করিয়া বলিলেন 'আর ক' দিন থাক'। আবার আসিব বলিলে, বলিলেন 'আর দু দিন থাকুন'। আমরা যখন আসি, বাবা খড়ম পায় দিয়া সঙ্গে সঙ্গে ফটকের বাহিরে আমাদের গাড়ীর নিকট অবধি আসিলেন। আমি বলিলাম বাবা, আমাদের কসুর মাপ করিবেন, আপনাকে কত বিরক্ত করিলাম। ইহা শুনিয়া বাবার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল, শরীর ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া গেল; একটু পরে বল্লেন 'আপনারা এতদূর হইতে আমাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন—আর আমি কসুর লইব!' পরে বলিলেন 'হাম্‌কো ভুল্‌না নেই, ইয়াদ রাখ্‌না'। দেখিলাম পরিপূর্ণ ভাব, ভাষা অল্প। যোগজীবনের আগ্রহে শীঘ্র চলিয়া আসিতে হইল। পথে যোগজীবন আসিয়া বলিল 'এখন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। এরূপ আদর ও যত্ন সহ্য করা যায় না'।

বাবার নিকট যখনই একটু বসিতাম, দেখিতাম নাম (ইষ্টনাম) ঝড়ের মত প্রবল বেগে চলিয়াছে। আমার নামের দিকে মোটে দৃষ্টি নাই, তথাপি এরূপ হইতেছে। নিকটে বসিলেই পরমানন্দ লাভ হইত।”

তিনি বাঙ্গালী ভদ্রলোক দিগকে দীক্ষা দিতে আরম্ভ করার পর বহু বাঙ্গালী ভদ্রলোক সপরিবারে দলে দলে তাঁহার নিকট যাইতেন। তাঁহাদের আহারাদির বন্দোবস্ত তিনি নিজ ভাণ্ডার হইতে করিতেন, এবং তাঁহাদের কোন প্রকার অসুবিধা না হয়, সে দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহার অনেক শিষ্য ইহাতে একটু কুণ্ঠা বোধ করিয়া, নিজেরা বাজার হইতে আহার্য্য সামগ্রী কিনিয়া আনিয়া আহারাদির ব্যবস্থা করিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছিলেন; বাবাজী তাহা অনুমোদন করিলেন না। তিনি বলিলেন যে ‘আপনারা আমার অতিথি, আপনাদের সেবা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য’। তিনি অবশ্য সাধুসেবার জন্য উৎসর্গীকৃত সামগ্রী গৃহস্থদিগকে বিনা প্রতিদানে আত্মসাৎ করিতে উপদেশ দিতেন না। তিনি শিষ্যদিগকে সাধুদের ভোজনের জন্য ভাণ্ডারা দিতে এবং নানা ভাবে সাধু সেবা করিতে উপদেশ প্রদান করিতেন।

আশ্রমের পশুপক্ষী কীটপতঙ্গদের আহারাদির দিকেও তাঁহার দৃষ্টি ছিল। আশ্রমের চিড়িয়াখানায় অনেক পশু ছিল। তাহাদের মধ্যে একটি ব্যাঘ্রও ছিল, সে বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। অনেক লোকে গোপ্রভৃতি পশু মন্দিরে উপঢৌকন প্রদান করিত। তাহাদের আহার ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা ত তিনি করিতেনই, কীট-

পতঙ্গদের জন্যও আহার্য্য প্রদানের ব্যবস্থা করিতেন। মাঝে মাঝে আশ্রম সংলগ্ন গোশালায় গমন করিয়া গরুসকলের তত্ত্বাবধান করা ও তাহাদিগকে একটু আদর করা তাঁহার একটি বিশেষ কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল।

উৎসবাদি উপলক্ষে যে সব নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদের রীতি বহুদিন যাবৎ চলিয়া আসিতেছিল, সে সব তিনি রক্ষা করিতেন, এবং নিজে তাহাতে যোগদান করিয়া সকলের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন ও তাহার মধ্যে পবিত্র ভাব সংক্রামিত করিয়া দিতেন। আশ্রমে একটি হস্তী ছিল। হস্তীটি তাঁহার একটি বিশেষ বাহন ছিল। দশহরার দিনে তিনি হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গোরক্ষ-নাথের মেলায় রামলীলা দর্শন করিতে যাইতেন। বহুলোক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিত। তিনি দুই দিকে পয়সার লুট দিতে দিতে যাইতেন, দরিদ্র লোকসকল তাহা কুড়াইয়া লইত। তিনি মফঃস্বলেও অনেক সময় হস্তীপৃষ্ঠে গমন করিতেন। আশ্রমের ব্যাঘ্রটীর মত হস্তীটীও বাবাজীর মহাসমাধির অব্যবহিত পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

তিনি গোরক্ষনাথের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত প্রজাগণের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিবার জন্য, এবং তাহাদের সকল প্রকার গোলমাল মিটাইয়া দিয়া ও অভাব অভিযোগের কারণ দূর করিয়া তাহাদের চিত্তে সন্তোষ ও প্রসন্নতা উৎপাদন করিবার জন্য দুই মাস পরিমিত সময় মফঃস্বলে বাস করিতেন। সেখানেও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সমাহিত ভাবেই তিনি অবস্থান করিতেন। তাঁহার উপস্থিতিতেই

সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিত। প্রজাগণ দলে দলে তাঁহার দর্শন লাভের জন্য উপস্থিত হইত এবং তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইয়া যাইত। প্রজাগণ স্বভাবতঃই তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল। এখনও তাহারা গোরক্ষপুর আসিলে বাবাজীর সমাধি-মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রতিকৃতির নিকট আপনাদের প্রাণের সকল বেদনা নিবেদন করিয়া ও তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। তাঁহার তিরোধানে গ্রাম্য দরিদ্র প্রজাগণ আপনাদিগকে পিতৃহীন বোধ করিতেছে।

অনেক সময় বাবাজীকে সাধুগণের দোষগুণ বিচার করিতে হইত। কোন সাধু সাম্প্রদায়িক নিয়ম-বিরুদ্ধ কোন কার্য্য করিলে তাহার দণ্ড হইত। সাধারণতঃ সন্ধ্যা-আরতি ও মন্দির-প্রদক্ষিণের পর বিচার-বৈঠক বসিত। বাবাজী মোহান্তকে লইয়া বিচারে বসিতেন। কোন সাধু প্রথমে অভিযোগ উপস্থিত করিতেন, পরে অন্যান্য সাধুগণ তৎসম্বন্ধে বাদানুবাদ আরম্ভ করিতেন। কেহ কেহ অন্যায়কারীর সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিতেন, কেহ কেহ বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিতেন। অন্যায় স্বীকৃত হইলেও তাহার পরিমাণ ও প্রকার-ভেদ লইয়া বিস্তর তর্ক হইত। বাদানুবাদ স্থলবিশেষে ও অবস্থা বিশেষে অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করিত। বাবাজী প্রস্তর-মূর্ত্তিবৎ অচল ও নির্ব্বাক হইয়া এসব কলহপূর্ণ বাদানুবাদ শ্রবণ করিতেন। শ্রবণ করিতেছেন কিনা তাহাও তাঁহার চোখমুখের নির্ব্বিকার ভাব দেখিয়া বুঝা কঠিন হইত। সাধুগণ পরিশ্রান্ত হইয়া নীরবে

যখন রায়ের জন্য বাবাজীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন, তখন হয়ত তিনি এককথায় রায় প্রকাশ করিলেন—'হাঁ, কসুর কিয়া'। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে আবার দণ্ড সম্বন্ধে নানারূপ তর্ক-বিতর্ক হইতে থাকিত। তখনও সকলের কথা শেষ হইলে তিনি এক প্রকার শাস্তির বিধান করিতেন। সাধুদের 'ছিলিম ছাপি' বন্ধ করা একটি কঠোর দণ্ড, মন্দির প্রদক্ষিণ সময়ে মন্দিরের বারান্দায় উঠিতে না দেওয়া অন্যতর কঠোর দণ্ড, পংক্তি-ভোজন নিষেধ করা আর একটি কঠিন দণ্ড; এইরূপ লঘু-গুরু অনেক দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। বাবাজী যে শাস্তি বিধান করিতেন, তাহা সর্ব্বদাই প্রত্যাশিত দণ্ড অপেক্ষা লঘুতর হইত, তাঁহার দণ্ডবিধানের মধ্যেও ক্ষমা প্রকাশ পাইত। তিনি এমন ভাবে শাস্তির ব্যবস্থা করিতেন, যাহাতে অন্যায়কারী নিজের অন্যায়াচরণের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়, এবং ভবিষ্যতে কেবলমাত্র ভয়ে অন্যায় হইতে বিরত না হইয়া, অন্যায় করিতে নিজের কাছে ও সকলের কাছে লজ্জা অনুভব করে। তাঁহার শাসন অবশ্য সকলেই মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতেন। এইরূপে বিচার শেষ করিয়া সভা ভঙ্গ করা হইত।

শিষ্য সমাগম

বাবা গম্ভীরনাথ জ্ঞান ও যোগের চরম অবস্থা লাভ করিয়াও সদ্‌গুরুর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে বরাবর অস্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন। যদিও তাঁহার সাধন-জীবন প্রথম হইতেই লোকশিক্ষকের আদর্শ রূপে গঠিত হইয়া উঠিতেছিল, তথাপি লোককে দীক্ষা প্রদান করা দূরের কথা, মৌখিক উপদেশ প্রদান করিতেও তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। ধর্ম্মপিপাসু লোকসকল তাঁহার অনন্যসাধারণ বৃত্তি, ভাব ও আকৃতি দর্শন করিয়া তাঁহার দিকে স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হইত, তাঁহার স্নিগ্ধ মধুর দৃষ্টিপাতে তাহাদিগের প্রতি তাঁহার গভীর সহানুভূতি ব্যক্ত হইত, কিন্তু তিনি কাহাকেও শিষ্যরূপে গ্রহণ ত করিতেনই না, স্বকীয় আচরণ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে উপদেশ প্রদানেও কুণ্ঠিত হইতেন। অনেক ধর্ম্মপিপাসু লোক তাঁহার নিকট দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পূজ্যপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় কয়েকজন ভক্তের সহিত তাঁহার নিকট গিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রার্থনা করিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন 'হাম কুছ নেহি জান্‌তা'। গোরক্ষনাথ-মন্দিরের বর্ত্তমান তত্ত্বাবধায়ক

বাবা গোকুলনাথজী প্রথম যৌবনে তাঁহাকে দর্শন করিয়াই সন্ন্যাস-জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, এবং অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে কপিলধারায় তাঁহার নিকট উপনীত হইয়াছিলেন। গোকুলনাথজী বলেন যে, বাবাজী তাঁহাকে খুব স্নেহের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দীক্ষা প্রার্থনা করিলে তিনি পরিষ্কারভাবে বলিলেন যে তিনি কাহাকেও চেলা করেন না, বাবাজী তাঁহাকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পড়াশুনা করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি গোরক্ষপুরে আগমন করিয়া তৎকালীন মোহান্ত বাবা দীলবরনাথজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সাধু হন। বাবা নৃপৎনাথজী ও বাবা শুক্কনাথজীর কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাঁহারা দীক্ষা সম্বন্ধে প্রত্যাখ্যাত হইয়াও সেবকরূপে বাবাজীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন। তাঁহারা ১৩।১৪ বৎসর কায়মনে বাবাজীর সেবা করিবার পর এবং বাবাজী সিদ্ধিলাভান্তে সাধুসমাজে বিশেষ ভাবে পরিচিত হইবার পর শ্রদ্ধার্হ সাধুগণ তাঁহাদের ঐকান্তিক সেবাদর্শনে বিমোহিত হইয়া তাঁহাদিগকে দীক্ষা প্রদান করিবার জন্য বাবাজীকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে থাকেন। সম্মানার্হ সাধুদের সম্মান রক্ষা করিবার জন্যই যেন বাবাজী প্রথমতঃ নৃপৎনাথকে দীক্ষা প্রদান করেন, এবং তাহার কয়েক মাস পরে শুক্কনাথকে দীক্ষিত করেন। কিন্তু তাঁহাদের কাহাকেও তিনি সন্ন্যাস প্রদান করেন নাই, তাঁহারা অন্য কোন নাথযোগীর নিকট চুটী কাটাইয়া ও কান ফাটাইয়া যোগী হইয়াছিলেন।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বাবাজী যখন গ্রহণ উপলক্ষে কাশীতে গমন করিয়াছিলেন, তখন বাবা ব্রহ্মনাথজী তাঁহার শরণাপন্ন হন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কায়মনোবাক্যে সেবা করিতে থাকেন। তিনি দুই বৎসরের অধিক কাল অনন্যমনে সেবা করিয়াছিলেন। সেবা-কার্যে তাঁহার আগ্রহ ও পটুতা দর্শন করিয়া অনেক সাধু চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনুরোধে বাবাজী কৃপা করিয়া ব্রহ্মনাথজীকে চুটীকাটা চেলা করিয়া সন্ন্যাস প্রদান করেন। ব্রহ্মনাথজীকেই তিনি সর্ব্বপ্রথমে সন্ন্যাস প্রদান করেন, কিন্তু তাঁহাকেও তিনি কন্‌ফট্ প্রদান করেন নাই। বাবাজীর কোন কন্‌ফট্ চেলা নাই।

বাবাজীর প্রথম বাঙ্গালী-সেবক স্বর্গীয় কালীনাথ ব্রহ্মচারী। তাঁহার নিবাস ছিল বিক্রমপুরে কামারগাঁ গ্রামে এবং নাম ছিল কালী কিশোর চক্রবর্ত্তী। তিনি পুলিস বিভাগে কার্য্য করিতেন। নানা অশান্তি ভুগিয়া তিনি চাকরী ত্যাগ করেন ও সদ্‌গুরুর অন্বেষণে বহির্গত হন। ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি গয়ায় উপস্থিত হন এবং বাবাজীর ভক্ত শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার সাহায্যে বাবাজীর নিকট পরিচিত হন। বাবাজী তাঁহাকে কৃপা করিয়া সান্ত্বনা ও উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক কাশীতে পাঠাইয়া দেন। কাশীতে তিনি বাবা বিদ্যানাথের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। কিন্তু তিনি সে সম্বন্ধে কখনও কিছু বলেন নাই। বাবাজীর প্রতি তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। বাবাজী যখন গোরক্ষপুরে আসিয়া

আসন গ্রহণ করেন, তাহার অত্যল্প কাল পরেই কালীনাথ গোরক্ষপুরে আসেন, এবং সমস্ত দেহমনপ্রাণ তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হন। তাঁহার সেবাও অনন্যসাধারণ ছিল। মা যেমন শিশু-সন্তানের সেবা করেন, তিনিও সেইরূপ বাৎসল্যের সহিত বাবাজীর সেবা করিতেন। নিজের দেহসম্বন্ধে ও দৈহিক প্রয়োজন সম্বন্ধে বাবাজী অনেকটা শিশুর মতই ছিলেন। তাঁহার ইষ্টানিষ্ট ছিল না, তিক্ত মধুর ছিল না, গ্রহণও ছিল না, বর্জ্জনও ছিল না, স্বীয় দেহরক্ষার প্রতি মনোযোগ এবং তজ্জন্য কোন প্রকার বিশেষ উত্তমও ছিল না; নিজের সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। জীবন মরণ তাঁহার নিকট সমান ছিল। 'সর্ব্বত্র সমচিত্তত্ব মিষ্টানিষ্টো পপত্তিষু'—তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। কালীনাথ ব্রহ্মচারী তাঁহার সেবায় ব্রতী হইয়া তাঁহার শরীরের ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি বেশ ভাল পাক করিতে পারিতেন। নিজের কক্ষে নিজের মনোমত নানাপ্রকার জিনিষ পাক করিয়া তিনি বাবাজীকে আহার করাইতেন। বাবাজী কখন তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করিলে তিনি জোর করিতেন, কখনও মিষ্ট কথায় শিশুর মত তাঁহাকে বুঝাইতেন, কখনও বা দু' চারটা কটু কথা শুনাইয়া দিতেন, কখনও বা অভিমান করিয়া নিজে আহারাদি বন্ধ করিতেন। বাবাজী শিশুর মত ভয়ে ভয়ে তাঁহার নির্দ্দেশ মত আহারাদি করিতেন। কখন হয়ত বাবাজী ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, (ভোজনের সময় সে কক্ষে কাহারও থাকার নিয়ম ছিল না) এবং ব্রহ্মচারী হয়ত তাঁহার নিজ ঘরে

বসিয়া অন্য লোকের সহিত কথা বলিতেছেন বা তামাক সেবন করিতেছেন, হঠাৎ দুটা কাঁচা লঙ্কা লইয়া দৌড়াইয়া তিনি বাবার ভোজনকক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হঠাৎ মনে পড়িয়া গিয়াছে যে কোন একটি বিশেষ তরকারীর সহিত কাঁচা লঙ্কা মাখিয়া খাইলে তাহা অধিকতর স্বাদু হইবে। তিনি বাবাজীর ভোজন পাত্রের উপর কাঁচা লঙ্কা দিয়া সেই তরকারীর সহিত উহা মাখিয়া খাইতে শিখাইয়া দিলেন। তিনি যখন যে কার্য্যেই ব্যস্ত থাকিতেন, বাবাজীর কোন্ সময় কি প্রয়োজন হইতে পারে, তাঁহার দৃষ্টি যেন সর্ব্বদা সেই দিকেই নিবদ্ধ থাকিত। তিনি নিজ-হাতে বাবাজীর বিছানা করিয়া দিতেন। খাটের উপর এক একখানি করিয়া কম্বল পাতিয়া তাহা হাত দিয়া ও বালিস দিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া মসৃন করিয়া দিতেন। বাবাজীর সেবা সম্বন্ধীয় অতি ছোটখাট কার্য্যেও তিনি এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। তিনি সেবার ভার গ্রহণ করিবার পর ভৃত্যকে পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু করিতে দিতেন না। এরূপ বাৎসল্যের সহিত সেবা বাবাজীর অন্য কোন ভক্ত বা শিষ্য করিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

কিন্তু তাঁহার বিশেষ দোষ ছিল এই যে, তাঁহার মেজাজটী অতিশয় রুক্ষ ছিল। কাহারও কোন কার্য্য বা বাক্য তাঁহার চক্ষে অন্যায় বলিয়া প্রতিভাত হইলে, তিনি চটিয়া অস্থির হইতেন, এবং অনেক সময় ক্রোধে আত্মহারা হইয়া অকথ্য ভাষায় গালাগালি করিতেন। একবার মোহান্ত পক্ষীয় ষড়যন্ত্রকারী কয়েকজন

সাধু বাবাজীর বিরুদ্ধে কিছু বলায় তিনি উত্তেজনাবশে খড়গ লইয়া মোহান্তকে কাটিতে যাইবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলেন। ঘর হইতে খড়গ লইয়া বাহির হইবার পরমুহূর্ত্তে শুনিতে পাইলেন যে পশ্চাৎ হইতে বাবাজী আহ্বান করিতেছেন 'ব্রহ্মচারী !' ফিরিয়া চাহিয়া দেখেন বাবাজী যোড়হস্তে দাঁড়াইয়া। তখন তিনি খড়গ ফেলিয়া দিয়া বাবাজীর পায়ে পড়িয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারী অনেকবার সাশ্রুনেত্রে বলিয়াছেন যে আমার রুক্ষ মেজাজের জন্য আমি বাবাজীকে অনেক কষ্ট দিয়াছি। বাবাজীর নিকট ব্রহ্মচারীর বিরুদ্ধে কেহ নালিশ করিলে তিনি বলিতেন যে, ব্রহ্মচারী বড় 'তামস'। ব্রহ্মচারীর তামস স্বভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে বাবাজী মাঝে মাঝে তাঁহাকে আশ্রম ত্যাগ করিতে আদেশ করিতেন। বাবাজীর সেবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়া তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কঠোর শাস্তি। ব্রহ্মচারী অল্পদিন বাবার আদেশানুসারে কাশী প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া আবার আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং বাবাজীর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া বলিতেন যে, আপনাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না। কিন্তু তিনি প্রবল সংস্কারের কবল হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে পারিতেন না, উত্তেজনার ক্ষেত্র উপস্থিত হইলে প্রায়ই তিনি ক্রোধে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। বাবাজীর মহাসমাধির কয়েকমাস পূর্ব্বে তিনি বাবাজীর আদেশে গোরক্ষপুর ত্যাগ করিয়া কাশীতে গিয়া অবস্থান করেন, এবং বাবাজীর মহাসমাধির কিছু দিন পরেই তাঁহারও দেহত্যাগ হয়।

যাহা হউক, অদূর ভবিষ্যতে বহু বাঙ্গালীশিষ্য লইয়া বাবাজীর যে একটি বৃহৎ পরিবার গঠিত হইবে, কালীনাথ ব্রহ্মচারী সেই পরিবারের অগ্রদূত হইয়া রহিলেন। পরবর্ত্তী কালে যত বঙ্গীয় নরনারী বাবাজীর চরণাশ্রয় লাভ করিয়াছে, তাহাদের সকলকেই তিনি নিজের ভ্রাতাভগিনীর ন্যায় দর্শন করিতেন, আদর অভ্যর্থনা করিতেন, সেবা করিতেন, ভৎর্সনা করিতেন। তিনি সকলেরই 'ব্রহ্মচারী দাদা'। ভক্তগণ বাবাজীর নিকট যে সব চিঠিপত্র লিখিতেন, ব্রহ্মচারী তাহা হিন্দীতে অনুবাদ করিয়া বাবাজীকে শুনাইতেন, এবং বাবাজীর প্রত্যুত্তর তাঁহাদিগকে লিখিয়া জানাইতেন। অনেক ভক্ত নিজেরা সঙ্কোচবশতঃ, অথবা হিন্দী বলিতে অসামর্থ্য-প্রযুক্ত ব্রহ্মচারীর বরাবরে নিজেদের আবেদন নিবেদন বাবাজীকে জ্ঞাপন করিতেন। ব্রহ্মচারীর ঘরেই সাধারণতঃ দীক্ষাপ্রদানকার্য্য সম্পন্ন হইত এবং ব্রহ্মচারীই তৎসম্বন্ধে সকল আয়োজন করিয়া দিতেন। ব্রহ্মচারীর ন্যায় একজন তেজস্বী ও সেবাপরায়ণ বাঙ্গালী বীর-সেবক বাবার সঙ্গে আশ্রমে থাকাতে বাঙ্গালী ভক্তদের যে অশেষবিধ সুবিধা হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ। লৌকিক হিসাবে দেখিলে, ব্রহ্মচারীর মত ভৈরব-ভাব-যুক্ত সেবক ব্যতীত কোন মৃদুস্বভাবান্বিত ভীরু শান্তিপ্রিয় বাঙ্গালী সেই হিন্দুস্থানী সাধুবেশীদের আস্তানায় স্থায়ী ভাবে বাস করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ, এবং এরূপ সেবক না থাকিলে বাঙ্গালী ধর্ম্মপিপাসুগণ এমন ভাবে এত অধিক সংখ্যায় বাবাজীর পদপ্রান্ত পর্য্যন্ত পৌছিতে পারিতেন কিনা, তাহাতেও খুবই সন্দেহ,— এরূপ

ভাবে নিজেদের আশ্রমবোধে বেশীদিন সেখানে অবস্থান করা ত দূরের কথা।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে বাবাজী দু' একটি করিয়া বাঙ্গালীকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। বর্ত্তমান যুগে শিক্ষিত বাঙ্গালী ধর্ম্মার্থিগণ প্রধানতঃ মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবন ও উপদেশের প্রভাবেই সদ্গুরুর আশ্রয় লাভের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেন। একদিকে বংশানুক্রমে 'গুরুতা-ব্যবসায়ী,' সাধনভজনহীন গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণে স্বভাবতই অনাস্থা জন্মে, অন্যদিকে ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত পদ্ধতিতে উপাসনা করিয়াও অনেকেই আশানুরূপ শান্তিলাভ করেন না। অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইয়া দিতে পারে না, ইহা যেমন অবিসংবাদিত, অন্ধ শব্দ-যুক্তিময় বা কাতরোক্তিময় একখানা যষ্টির বলেও কণ্টকময় সংসারবন অতিক্রম করিয়া শান্তিধামে পৌছিতে পারে না, ইহাও তেমনি সহজেই অনুমেয়। এরূপ অবস্থায় যদি এমন কোন চক্ষুষ্মান্ মহাপুরুষের সন্ধান লাভ করা যায়, যিনি, সংসারারণ্যের ভিতর দিয়া যে সব সুগম পথ আছে, তাহাদের এক বা একাধিক পথ স্বয়ং অবগত হইয়া, সংসার অতিক্রম পূর্ব্বক শান্তিধামে পৌছিবার পর আবার প্রেমের টানে শান্তিপিপাসুদের সাহায্যার্থে লোকসমাজে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, এবং যিনি জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা তাঁহাদের চক্ষু উন্মীলিত করিয়া তাঁহাদিগকে কোন বিশিষ্ট সুগম পথে শান্তিধামে লইয়া যাইতে পারেন, তবে তাঁহার প্রতি চিত্ত সহজেই আকৃষ্ট হয়, তাঁহার আশ্রয়লাভের জন্য মন সহজেই ব্যাকুল হয়।

তত্ত্বজ্ঞান পিপাসু মুমুক্ষুর পক্ষে এবম্বিধ সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হওয়া অত্যাবশ্যক বলিয়া সকল শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন। উপনিষৎ বলিয়াছেন,— 'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্'—তত্ত্বজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে মুমুক্ষু সমিৎপাণি হইয়া শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর শরণাপন্ন হইবেন। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিন স্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

—তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণের শরণাপন্ন হইয়া প্রণিপাত, সেবা ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসাদি দ্বারা সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কর; তাঁহারা তোমাকে জ্ঞানোপদেশ করিবেন। এই শ্লোকের ভাষ্যে জ্ঞানিগুরু শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন, 'যে সম্যগ্‌দর্শিন স্তৈরুপদিষ্টং জ্ঞানং কার্য্যক্ষমং ভবতি, নেতরদিতি ভগবতো মতম্'—যাঁহারা সম্যগ্‌দর্শী তাঁহাদের উপদিষ্ট জ্ঞানই কার্য্যক্ষম হয়, অন্য (পুস্তক পাঠাদি জনিত) জ্ঞান নহে, ইহাই ভগবানের মত। বেদান্তাচার্য্য শঙ্কর আরও স্পষ্টরূপে তাঁহার 'তত্ত্বোপদেশ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

আত্মা প্রকাশমানোঽপি মহাবাক্যৈস্তথৈকতা।
তত্ত্বমো বোধ্যতেঽথাপি পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারতঃ॥
তথাপি শক্যতে নৈব শ্রীগুরোঃ করুণাং বিনা।
অপরোক্ষয়িতুং লোকে মূঢৈঃ পণ্ডিতমানিভিঃ॥

আত্মা স্বয়ং প্রকাশমান হইলেও এবং বেদান্ত বাক্যের পৌর্ব্বাপর্য্য বিচার করিয়া ও 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যের তাৎপর্য্য

অনুধাবন করিয়া জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেও শ্রীগুরুর করুণা ব্যতীত কোন অবিদ্যাগ্রস্ত ব্যক্তি স্বীয় পাণ্ডিত্যের বলে আত্মার অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হয় না। বিবেক চূড়ামণিতে তিনি লিখিয়াছেন,—

উপসীদেদ্‌গুরুং প্রাজ্ঞং যস্মাদ্ বন্ধবিমোক্ষণম্।
শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽ কামহতো যো ব্রহ্মবিত্তমঃ॥
ব্রহ্মণ্যুপরতঃ শান্তো নিরিন্ধন ইবানলঃ।
অহেতুকদয়াসিন্ধু র্বন্ধুরানমতাং সতাম্॥
তমারাধ্য গুরুং ভক্ত্যা প্রাহ্ব-প্রশ্রয়-সেবনৈঃ।
প্রসন্নং তমনুপ্রাপ্য পৃচ্ছেজ্ জ্ঞাতব্য মাত্মনঃ॥

অতএব যিনি শাস্ত্রমর্ম্মার্থদর্শী, পাপগন্ধবিহীন, বাসনালেশ-শূন্য, ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ, সদা ব্রহ্মভাবভাবিত, নিরিন্ধন অগ্নির ন্যায় প্রশান্ত, এবং অহেতুক কৃপাসিন্ধু, ও শরণাগত-বৎসল—এমন ভব-বন্ধন-মোচনকারী প্রাজ্ঞ গুরুর সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইবে; এবং ভক্তিসহকারে প্রণাম, বিনয়, সেবা শুশ্রূষা প্রভৃতি দ্বারা গুরুর আরাধনা করিয়া, তাঁহার প্রসন্নতা সম্পাদন পূর্ব্বক স্বীয় জ্ঞাতব্য বিষয় তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিবে। হঠযোগ প্রদীপিকায় স্বাত্মারাম যোগীন্দ্র বলিয়াছেন,—

"দুর্ল্লভো বিষয়ত্যাগো দুর্ল্লভং তত্ত্বদর্শনম্।
দুর্ল্লভা সহজাবস্থা সদ্‌গুরোঃ করুণাং বিনা॥"

সদ্‌গুরুর কৃপা ব্যতিরেকে বিষয় বৈরাগ্য, তত্ত্বদর্শন এবং সমাধি দুর্ল্লভ।

এইরূপ প্রাচীন ও আধুনিক সকল শাস্ত্র ও জ্ঞানী মহাপুরুষগণ সদ্‌গুরু-শরণাগতি তত্ত্বজ্ঞান ও পরাশান্তি লাভের জন্য অত্যাবশ্যক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গোস্বামী মহাশয় প্রভৃতি বর্ত্তমান লোকশিক্ষকগণ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের নিকট সেই শাস্ত্রবাক্যই স্বানুভব জনিত দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিলেন; ধর্ম্মপিপাসু বাঙ্গালীগণও সহজেই তাঁহাদের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক সদ্‌গুরুর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। বহু বাঙ্গালী গোস্বামী মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন এবং গোস্বামী মহাশয় তাঁহাদিগকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া একটি সুবৃহৎ শিষ্যসঙ্ঘ সংগঠিত করিলেন। মহাত্মা রামদাস কাঠিয়া বাবা, শ্রীমৎ ভোলানন্দ গিরি, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, বাবা ঠাকুরদাস প্রভৃতি সুপরিচিত মহাপুরুষগণকে গুরুপদে বরণ করিয়া অনেক ধর্ম্মার্থী বাঙ্গালী যথার্থ ধর্ম্মের আস্বাদ পাইয়া প্রাণে শান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে বাঙ্গালীদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি সাধু মহাপুরুষদের উপর পড়িল, সাধু মহাপুরুষদেরও সস্নেহ দৃষ্টি বাঙ্গালীদের উপর নিপতিত হইল।

গোস্বামী মহাশয়ের দেহান্তের পর তাঁহার প্রধান প্রধান শিষ্যদের মধ্যে কাহারও নিকট সদ্‌গুরুর সন্ধানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে সাধারণতঃ তাঁহারা বাবা গম্ভীরনাথের নাম করিতেন এবং তাঁহার কৃপা লাভের চেষ্টা করিতে বলিতেন। কিন্তু বাবাজীর তখনও প্রকাশ্য লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার

সময় হয় নাই। তিনি প্রায় সকলকেই প্রত্যাখ্যান করিতেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি গোরক্ষপুরে গোরক্ষনাথ মন্দিরের অধ্যক্ষরূপে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, সদ্‌গুরুরূপে তাঁহার লোকশিক্ষার কার্য্যও তখন আস্তে আস্তে আরম্ভ হইল। গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যদিগের আত্মীয় ও ধর্ম্মপিপাসু বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যেই এই কার্য্যপ্রথম আরম্ভ হয়। গোস্বামী মহাশয়ের এক শিষ্য তাঁহার অতিবৃদ্ধা শাশুড়ীকে বাবাজীর নিকট দীক্ষিত করাইলেন। বাবা শান্তিনাথজী এই বৎসরই দীক্ষা প্রাপ্ত হন। সেই বৎসরই আরও কয়েকটী ভক্ত তাঁহার কৃপালাভ করেন। ক্রমে প্রতি বৎসরেই ২০ জন কি ২৫ জন করিয়া ভক্ত তাঁহার আশ্রয় লাভ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার শিষ্যপরিবার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

কতজন যে কত অলৌকিক উপায়ে তাঁহার সন্ধান পাইয়াছেন ও তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন, তাহা সবিশেষ বর্ণনা করিবার উপায় নাই। অনেকের কথা জানা যায় নাই, অনেকের কথা সঠিক জানা যায় নাই, অনেকের বৃত্তান্ত-প্রকাশ করিবার অধিকার নাই। তাঁহার নাম ও পরিচয় জানিবার অনেক দিন পূর্ব্বে কেহ কেহ স্বপ্নে তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কেহ কেহ তাঁহার দর্শন লাভের পূর্ব্বে স্বপ্নে তাঁহার নিকট দীক্ষাও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

একটি বালকের বাড়ী নোয়াখালী জেলার সুদূর পল্লীগ্রামে। বাল্যকাল হইতেই সে ধর্ম্মপ্রাণ। কিন্তু সাধুমহাপুরুষদের বিষয় শ্রবণ করিবার বিশেষ সুযোগ তাহার ঘটে নাই। নিতান্ত

অপ্রত্যাশিতভাবে সে স্বপ্নে বাবাজীর দর্শন লাভ করে এবং তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তি যে কে, কোথায় থাকেন—কিছুই তাহার জানা নাই। সুতরাং তাঁহাকে জানিবার ও পাইবার জন্য তাহার ব্যাকুলতা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অনেক দিন পরে ঘটনাক্রমে ফেণী আসিয়া কোন ধর্ম্মবন্ধুর নিকট সেই স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষের বর্ণনা করিলে, তিনি বলিলেন যে, সম্ভবতঃ ইনি গোরক্ষপুরের বাবা গম্ভীরনাথ। ফেণীতে তাঁহার কতিপয় শিষ্য ছিলেন। তাহাকে একজন শিষ্যের গৃহে নিয়া বাবাজীর প্রতিকৃতি দেখান হইলে, সে নিঃসংশয় হইল এবং আনন্দে ও উৎকণ্ঠায় অধীর হইয়া পড়িল। বালকটি নিতান্ত দরিদ্র, যাইবার খরচ বহন করিতেও অসমর্থ, অথচ তীব্র ব্যাকুলতা। ফেণী হইতেই পাথেয় সংগ্রহ করিয়া যাত্রা করিল। তৃতীয় দিন রাত্রি ৩টার সময় গোরক্ষপুর ষ্টেশনে পৌছিয়াই এক্কা করিয়া গোরক্ষনাথ মন্দিরে গিয়া সে দেখে, বাবাজী বারান্দায় খাটুলির উপর বসিয়া আছেন, নিকটে একটি আলো জ্বালান রহিয়াছে। প্রণাম করা মাত্রই তিনি এমন ভাবে স্নেহের স্বরে আহ্বান করিয়া তাহার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া শয়নাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন যে, তাহার মনে হইল যেন তিনি তাহারই জন্য আলো লইয়া বসিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন এবং তাহার শয়নাদির বন্দোবস্ত পূর্ব্ব হইতেই ঠিক রাখিয়াছিলেন।

ময়মনসিংহ নিবাসী একটি বালক একজন বাঙ্গালী যোগী-পুরুষের অনুগত ছিল, এবং তাঁহার শিষ্যদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে

মিলিয়া মিশিয়া ধর্ম্মালোচনা ও সাধন ভজন করিত। ধ্যানাভ্যাস করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়পটে একটি অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব মহাপুরুষের মূর্ত্তি প্রকাশিত হইল। এরূপ কোন মহাপুরুষ জীবিত আছেন কিনা তাহাও তাহার জানা ছিল না। কিন্তু ঘটনাক্রমে বাবাজীর জনৈক শিষ্যের গৃহে তাহার স্বপ্নদৃষ্ট মূর্ত্তির ফটো দেখিয়া সে বিস্ময়ান্বিত হইল। যখন সে অবগত হইল যে ইনি গোরক্ষপুরের মহাপুরুষ, তখন তাঁহার চরণাশ্রয়ের জন্য সে ব্যাকুল হইল এবং তাঁহার দু' এক জন শিষ্যের সন্ধান পাইয়া তাঁহাদের প্রতিও অনুরক্ত হইল। নিতান্ত বালক বলিয়া একাকী গোরক্ষপুর যাওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিছু কাল অপেক্ষা করার পর, বাবাজীর কৃপাপ্রার্থী তাহার একজন শিক্ষকের সহিত সে গোরক্ষপুরে গমন করিয়া অভীষ্ট মহাপুরুষের আশ্রয় লাভ করে।

কুমিল্লার একজন ডাক্তার স্বপ্নযোগে দেখিলেন যে, তিনি একটী নূতন স্থানে গমন করিয়াছেন, এবং সেখানে একজন মহাপুরুষ বিশেষ স্নেহের সহিত তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। সেই স্বপ্নাবস্থায় তাঁহার দীক্ষালাভ হইল। সেই মহাপুরুষ কে এবং কোথায় অবস্থান করেন ও কি ভাবে তাঁহার সাক্ষাৎলাভ হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিতে করিতে তিনি বিশেষ অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের একজন শিষ্য তাঁহার ধর্ম্মবন্ধু ছিলেন। তিনি একদিন ঐ ডাক্তারের বাসায় আসিয়া তাঁহার অস্বস্থভাব দেখিয়া তৎকারণ

জিজ্ঞাসা করায়, তিনি তাঁহার নিকট স্বপ্নের বিষয় বিবৃত করিলেন। বন্ধুটী তখন তাঁহাকে বলিলেন যে, সম্ভবতঃ ইনি গোরক্ষপুরের মহাত্মা বাবা গম্ভীরনাথ হইবেন, আপনি তাঁহার নিকট গমন করুন। কিন্তু তাঁহার হাতে টাকা না থাকায় তিনি যাওয়ার কোন সুবিধা দেখিতেছিলেন না। হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার সপরিবারে গোরক্ষপুরে গমনের উপযুক্ত পরিমাণ টাকা একদিনেই তাঁহার লাভ হইল। তিনি গোরক্ষপুর গমন পূর্ব্বক আশ্রমে পৌছিয়া দেখেন যে, স্থানটী তাঁহার পরিচিত, ইহা তাঁহার স্বপ্নদৃষ্ট স্থান। দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি বাবাজীর নিকট স্বপ্নের কথা বলায়, বাবাজী বাক্যাবসান মাত্র বলিলেন যে,—তোমার সংস্কার ছিল, তোমার সহিত আমার পূর্ব্বের সম্বন্ধ ছিল।

একটী ভক্ত হবিগঞ্জে সেরেস্তাদারী করিতেন। গোস্বামী মহাশয়ের জনৈক শিষ্যের পত্র লইয়া তিনি দীক্ষালাভের উদ্দেশ্যে গোরক্ষপুরে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে গয়াতে তিনি বাবাজীর দর্শনলাভ করেন। গোরক্ষপুরে পৌছিয়া তিনি দেখেন যে, ইহা তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট মূর্ত্তি। গুরুদেব কৃপা করিয়া পূর্ব্বেই তাঁহাকে দর্শনদান করিয়াছেন ভাবিয়া তাঁহার অহেতুকী দয়ার কথা চিন্তা করিতে করিতে তিনি ভাবে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

✓ শ্রীযুত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার এক ভাগিনেয়ীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"শ্রীমান্ হরেন্দ্র যখন দীক্ষা গ্রহণ করিতে তাহার স্ত্রী ও ভগ্নী শ্রীমতী কিরণকে নিয়া

গোরক্ষপুরে যায়, তখন আমার বড় ভাগিনেয়ী শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী দীক্ষা গ্রহণ করিতে যাইতে পারে নাই। ইহাতে হিরণের খুব ক্লেশ হইয়াছিল। শ্রীমান্ হরেন্দ্র দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলে একদিন ভোরে হিরণ প্রফুল্ল হইয়া হরেন্দ্রকে বলিল,—'গতরাত্রে এক সুন্দর স্বপ্ন দেখিয়াছি।' হরেন্দ্র বলিল 'কি দেখেছিস ?' হিরণ বলিল 'স্বপ্নে দেখিলাম আমি গঙ্গাপারে একটী পর্ণকুটিরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছি। সে স্থানে মামাদের গুরু শ্রীমৎ গোস্বামী দেব রহিয়াছেন এবং অপর একখানা আসন পাতা রহিয়াছে। গোঁসাইজী আমাকে দেখিয়া বলিলেন "কি চাও ?" আমি বলিলাম "আমি আপনার কাছে দীক্ষা চাই।" তিনি বলিলেন "আমি তোমার গুরু নই, বাবা গম্ভীরনাথ তোমাকে দীক্ষা দিবেন; তিনি পায়খানায় গিয়াছেন, এখনি আসিবেন; আমি তাঁহাকে বলিয়া দিব।" বাবা আসিলে গোস্বামী মহাশয় বলিয়া দিলেন এবং আমার দীক্ষা হইল। শ্রীমান্ হরেন্দ্র ইহা শুনিয়া বাবার একখানা ফটো আনিয়া দেখাইল এবং বলিল "দেখ্তো, যে মহাপুরুষকে দেখিয়াছিস, তাঁহার চেহারা কি এইরূপ ? হিরণ বলিল—"হাঁ, ইনিই সেই।" সময়ান্তরে যখন বাবার নিকট হিরণ সাধন পাইল, তখন 'নাম' পাইয়া বলিয়াছিল, আমি স্বপ্নে বাবার নিকট যে 'নাম' পাইয়াছিলাম, এই 'নাম'ও সেই 'নাম'।

শ্রদ্ধাস্পদ মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয় লিখিয়াছেন,—"আমার একটি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের পিতা তাঁহাকে কোনও একজন বিশিষ্ট

সাধুর নিকট দীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। এই সময়ে উক্ত যুবকটি স্বপ্নে এক সাধুমূর্ত্তি দেখিলেন, তিনি পিতৃ-নির্দ্দিষ্ট সাধু নহেন। পরিশেষে বাবা গম্ভীরনাথের দর্শন পাইয়া যুবক বলিলেন,—তিনি স্বপ্নে ইঁহাকেই দেখিয়াছেন। তাঁহার নিকট দীক্ষা পাইলেন। এই ঘটনায় পিতা রুষ্ট হইবেন ভাবিয়া যুবক ভীত হইয়াছিলেন, কিন্তু এই দীক্ষার কথা শুনিয়া তিনি কিছুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন না। এগুলি 'মিরাকেল' নয়। মানুষের মন-রাজ্যটা আমাদের নিকট যেরূপ অন্ধকার, সকলের নিকট সেরূপ নয়। যাঁহাদের চিত্ত সংযত, মন-রাজ্যের উপর তাঁহাদের অনেক ক্ষমতা জন্মে।"

একটি মহিলার, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, প্রভৃতি অনেকেই বাবাজীর কৃপালাভ করেন। তাঁহারা ময়মনসিংহে থাকেন এবং ময়মনসিংহ হইতেই গোরক্ষপুরে গিয়াছিলেন। মহিলাটী পতিগৃহে থাকায় এবং যথাসময়ে ময়মনসিংহে আসিতে না পারায় তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে পারেন নাই। তাঁহার দীক্ষালাভের জন্য বিশেষ ব্যাকুলতা ছিল। তিনি স্বপ্নে বাবাজীকে দর্শন করেন ও তাঁহার কৃপালাভ করেন। তিনি দীক্ষামন্ত্র তাঁহার মাতাকেজানাইয়াছিলেন। মা যে মন্ত্র পাইয়াছেন, কন্যাও স্বপ্নে সেই একই মন্ত্র পাইয়াছেন। সৌভাগ্যবতী মহিলাটী কিছুদিন পরেই দেহত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং বাবাজীর সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই।

যোগিরাজ গম্ভীরনাথের বহুসংখ্যক শিষ্য ও শিষ্যা দীক্ষার বহু পূর্ব্বে, এমন কি, তাঁহার সম্বন্ধে কিছু জানিবার বহু পূর্ব্বে,

এইরূপ অলৌকিকভাবে তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। অনেকের পক্ষে সেখানে গমনের বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত আশ্চর্য্যরূপে হইয়া গিয়াছে। ইহাতে স্বভাবতঃই মনে হয় যে, বাবাজী তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে আবাহন ও আকর্ষণ করিয়া আপনার কৃপায় আপনার কোলে টানিয়া লইয়াছেন এবং তাঁহাদের জীবন সার্থক করিয়া দিয়াছেন। অথচ সাক্ষাৎ-দর্শনের কালে কখন তিনি ইহার কোন পরিচয় প্রদান করিতেন না। অলৌকিক দর্শন সম্বন্ধে কেহ সাহস করিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি প্রায়শঃ বলিতেন যে 'স্বপ্ন ত স্বপ্নই, তৎপ্রতি এত মনোযোগ দিবার আবশ্যকতা কি ?' দু'একজন ভক্ত নিতান্ত আকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলে তাঁহাদিগকে যেন সান্ত্বনা প্রদানের স্বরে তিনি বলিতেন 'তোমাদের সহিত সম্বন্ধ ছিল' অথবা 'তোমার সংস্কার ছিল'।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার শিষ্যসংখ্যা খুব বেশী হয় নাই, অনুমান একশতের কিছু অধিক হইবে। ঐ সনের পৌষ মাসে তিনি নেত্র-চিকিৎসা উপলক্ষ করিয়া কলিকাতায় আসেন। তিনি যতদিন কলিকাতায় ছিলেন, ততদিন প্রায় প্রত্যহ অনেক ধর্ম্ম-পিপাসুকে তিনি শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। কলিকাতায় অবস্থান কালেই তাঁহার শিষ্যসংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায়। কলিকাতা হইতে তাঁহার গোরক্ষপুর প্রত্যাবর্ত্তনের পর দলে দলে শিক্ষিত বাঙ্গালী নরনারীগণ গোরক্ষপুর যাইতে থাকেন। যাঁহারা পূর্ব্বে দীক্ষা পাইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার দর্শন ও চরণস্পর্শ লাভের

জন্য যাইতেন, এবং যাঁহারা দীক্ষা পাইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা দীক্ষা লাভের জন্য যাইতেন। ১৯১৭ সনে তাঁহার দেহান্ত ঘটে। তখন পর্য্যন্ত এইরূপই চলিয়াছিল এবং তাঁহার শিষ্যসংখ্যা তখন ছয় শতের অধিক হইয়াছিল।

অনেক ভক্ত পিতামাতা তাঁহাদের শিশু-পুত্রকন্যাকেও বাবাজীর নিকট দীক্ষিত করিয়া লইয়াছেন। বাবাজী তাহাদের কাণ ফুঁকিয়া মন্ত্র দিতেন। তাহারা অবশ্যই তখন দীক্ষা-মন্ত্র স্মরণ রাখিতে পারিত না। সেই সব শিশুদের মধ্যে কাহারও কাহারও সম্বন্ধে তিনি বলিতেন যে, সময়ে মন্ত্র আপনা আপনি স্মৃতিপথে স্ফুরিত হইবে,—"আপ্‌সে ইয়াদ্ হো জায়গা," অন্য কাহাকেও স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না। কাহারও কাহারও পিতা-মাতাকে মন্ত্র স্মরণ করাইয়া দিতে বলিতেন।

তত্ত্বদর্শী যুক্তযোগী মহাপুরুষের নিকট দীক্ষালাভের অধিকার যে বিশেষ সৌভাগ্যের পরিচয়, জন্মান্তরীণ বিশেষ সুকৃতির ফলেই যে এরূপ সৌভাগ্য লাভ হয়, তাহা শাস্ত্র ও জ্ঞানিগণ একবাক্যে ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে এই অধিকার অনেক ক্ষেত্রে বুঝিতে পারা যায় না। একস্থানে রত্নের খনি আছে, কিন্তু তাহার উপরে অনেক স্তর মৃত্তিকা ও আবর্জ্জনা থাকিতে পারে। সে ক্ষেত্রে সাধারণ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ মৃত্তিকা ও আবর্জ্জনাই দেখিতে পায়, রত্নের সন্ধান পায় না; কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ ঐ মৃত্তিকা ও আবর্জ্জনার মধ্যেও এমন সব লক্ষণ আবিষ্কার করেন, যাহাতে তাহার নীচে অবস্থিত

রত্নখনির সত্তা সম্বন্ধে তাঁহারা নিশ্চয় জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। সেইরূপ কোন কোন ব্যক্তির অন্তর্জীবন, সমুজ্জ্বল আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন হইলেও, বিশেষ কুপ্রারব্ধবশে তাহাদের বহির্জীবনে এমন কতকগুলি দোষ থাকিতে পারে, যাহা দেখিয়া সাধারণলোক স্বভাবতঃই তাহাদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকে; ভোগদ্বারা কুপ্রারব্ধ ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের অন্তর্জীবনের সমুন্নত আধ্যাত্মিক ভাবসমূহ বহির্জীবনে সদ্‌বৃত্তিরূপে বিকাশ-প্রাপ্ত হইতে বাধা পায়, সুতরাং সাধারণজ্ঞানবিশিষ্ট লোকসকল বাহিরের ব্যবহার দেখিয়াই বিচার করে বলিয়া তাহাদিগকে ততদিন চিনিতে পারে না। অন্যদিকে, বহির্জীবনে সাধুবৃত্তিসম্পন্ন ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন লোকের অন্তরেও অধ্যাত্মভাববিরোধী এমন কতকগুলি সংস্কার থাকিতে পারে, যাহাতে সাধারণ লোকের নিকট তাহারা সাধু বলিয়া পরিচিত হইলেও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে নিম্নস্তরেই অবস্থিত থাকে। এ সম্বন্ধে পৌরাণিক ও আধুনিক দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে ও লোকসমাজে বিরল নহে। অতএব আধ্যাত্মিক জীবনে কে কোন্ স্তরে অবস্থিত, তাহা সাধারণ দৃষ্টিতে বহির্জীবনের আচার, কর্ম্ম, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা সকল ক্ষেত্রে নিরাপদ নহে। আধ্যাত্মিক জীবনের বিশেষজ্ঞগণ—তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণ—লোকের অন্তর্জীবন দর্শন করিতে পারেন, বহির্জীবনের আচারব্যবহার অন্তর্জীবনের অনুরূপ না হইলেও তাহার মধ্যে অন্তর্জীবনের যে ছাপ পড়ে, তাহা লক্ষ্য করিয়া প্রত্যেক জীবনের বিশেষত্ব অনুধাবন করিতে পারেন। ধর্ম্মার্থিগণের অন্তর্জীবনের

আধ্যাত্মিক অবস্থা বিচার করিয়াই লোকশিক্ষক মহাপুরুষগণ তাহাদিগকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন, এবং তাহাদের অধিকারানুরূপ সাধন উপদেশ করেন।

বাবাজী দীক্ষাপ্রদান কার্য্যে ব্রতী হইয়াও প্রথম প্রথম কোন কোন দীক্ষার্থীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায়। কিন্তু কোন অর্থীকে প্রত্যাখ্যান করিতেই তাঁহার প্রেমপূর্ণ প্রাণে বেদনা অনুভূত হইত বলিয়া বোধ হইত। পরবর্ত্তীকালে তিনি কোন দীক্ষার্থীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় নাই। কিন্তু কেহ কেহ প্রাণে অশান্তি ভোগ করিয়া দীক্ষাগ্রহণের জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াও দীক্ষাপ্রাপ্তির প্রার্থনা তাঁহাকে জানাইতে সমর্থ হয় নাই, অন্যান্য কথা বলিয়া অথবা বাজে বিষয়ে নিবেদন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, ইহা দেখা গিয়াছে। এই সব দেখিয়া মনে হইত যে, যাহারা তাঁহার নিকট দীক্ষালাভ করিবার অধিকারী, তাহারাই তাঁহার নিকট দীক্ষার প্রার্থনা লইয়া উপস্থিত হইতে সক্ষম হইত। যাহারা প্রত্যাখ্যাত হইবার যোগ্য তাহারা তাঁহার নিকট দীক্ষার বিষয় উল্লেখ করিতেই সমর্থ হইত না। তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, তিনি দীক্ষার্থীদের অধিকার নিরূপণ কিরূপে করেন। তিনি লৌকিক ভাবে সাধারণদৃষ্টিবিশিষ্ট লোকের মতই উত্তর করিলেন, যাহারা এত দূর দেশ হইতে, এত অর্থব্যয় করিয়া ও এত ক্লেশস্বীকার করিয়া দীক্ষার জন্য আসিয়া থাকে, এবং এরূপ ব্যাকুলতা ও প্রেমের সঙ্গে দীক্ষাপ্রার্থনা করে, তাহাদিগকে কিরূপে প্রত্যাখ্যান করা

যায় ? ধর্ম্মের প্রতি হৃদয়ের টান না থাকিলে কি এভাবে আসে ? যাঁহারা পূর্ব্বে স্বপ্নে দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এ বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। এরূপ প্রশ্নের উত্তরে প্রায়ই তিনি নীরব থাকিতেন ; দু' একজনকে বলিয়াছেন যে, 'আমার সহিত তোমার পূর্ব্বের সম্বন্ধ ছিল'। এই সম্বন্ধ কি প্রকার, তাহা অবশ্যই তিনি ব্যাখ্যা করেন নাই।

ছয় শতের অধিকসংখ্যক বাঙ্গালীকে তিনি দীক্ষাপ্রদান পূর্ব্বক কৃতার্থ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেবলমাত্র দুই জনকে তিনি সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসজীবনের আদর্শ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা কিরূপ উচ্চ ছিল, এবং নিজের জীবনে তিনি সেই সন্ন্যাসজীবনের মর্য্যাদা কি ভাবে রক্ষা করিতেন, তাহার আভাস পূর্ব্বেই কতকটা দেওয়া হইয়াছে। অধিকার-নিরপেক্ষভাবে দলে দলে লোক সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিয়া সন্ন্যাসের আদর্শ কিরূপ ক্ষুণ্ণ করিয়াছে এবং হিন্দুসমাজের পরমগৌরবাস্পদ সন্ন্যাসাশ্রমকে কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে সর্ব্বদাই তিনি সজাগ ছিলেন। এই হেতু একদিকে যেমন তিনি গৃহস্থদিগকে সন্ন্যাসের প্রতি ও সন্ন্যাসীদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে উপদেশ দিতেন, অন্যদিকে তেমনি সাধারণ সন্ন্যাসীদের সহিত বেশী মিশামিশি করিতে নিষেধ করিতেন ; কারণ বর্ত্তমান সময়ের সাধুবেশীদের সঙ্গে বেশী মিশামিশি করিলে সন্ন্যাসের প্রতিই অশ্রদ্ধা উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। কোন গৃহস্থ সংসারত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ

করিবার প্রার্থনা জানাইলে তিনি বলিতেন যে, গার্হস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগ করিলেই সন্ন্যাসজীবন লাভ করা যায় না, সন্ন্যাসের বেশ গ্রহণ করিয়াও অনেকে কিরূপ বহির্মুখ, কলহপরায়ণ, খলস্বভাব হয়, তাহা ত দেখিতেছ, ইহা অপেক্ষা গৃহস্থ থাকিয়া সংসারের বিহিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলে ও অবসর পাইলেই ভগবানের নাম করিলে অধিকতর কল্যাণ লাভ হয়; আধ্যাত্মিক উন্নতি সংসারের উপরও নির্ভর করে না, সন্ন্যাসের উপরও নির্ভর করে না; সন্ন্যাসী হইয়াও সাধনভজনে শিথিল হইলে মুক্তিলাভ করা যায় না, আবার গৃহস্থজীবনেও ভগবানের সেবাবোধে কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিলে, এবং অবসর সময় ঐকান্তিক অনুরাগের সহিত সাধনভজনে নিরত থাকিলে একজন্মেই মুক্ত হওয়া যায়; যাহাদের সন্ন্যাসের উপযুক্ত উত্তম সংস্কার আছে, তাহাদেরই সন্ন্যাসী হওয়া উচিত।

সন্ন্যাসের প্রতি আগ্রহ সম্পন্ন কয়েকজন শিষ্যকে এই প্রকার উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক তিনি নিবৃত্ত করিয়াছেন এবং গার্হস্থ্যোচিত ধর্ম্মে শ্রদ্ধাসম্পন্ন করিয়াছেন। পিতামাতা ভাই ভগিনী প্রভৃতি সকলকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্যে একটি বালক কয়েক মাস সর্ব্বদা বাবাজীর সঙ্গে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিয়াছিল। তখন গুরুসেবা ও নাম জপই কেবলমাত্র তাহার কার্য্য ছিল। সে বলিয়াছে যে, তখন প্রতি দিন ১৯।২০ ঘণ্টা তাহার সাধন চলিত। পিতামাতা অবশ্যই তাহাকে গৃহে ফিরাইয়া লইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ করিতে ছিলেন। কয়েকমাস পরে বুঝাইয়া শুনাইয়া নানা প্রকার উপদেশ দ্বারা তাহার মনের তাৎকালিক

গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া, বাবাজী তাহাকে গৃহে পাঠাইয়া দেন, এবং পড়াশুনা করিতে, পিতামাতার সেবা করিতে ও পিতামাতার আদেশানুসারে বিবাহ করিতে উপদেশ দেন। আর একজন বিবাহিত যুবক সংসারে নিতান্ত বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া নিত্যনিরন্তর সাধনে ডুবিয়া থাকিবার উদ্দেশ্যে অনেকবার বাবাজীর নিকট সন্ন্যাস প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এবং একবার সন্ন্যাসের জন্য সম্পূর্ণ-রূপে প্রস্তুত হইয়া গৃহে হইতেও বহির্গত হইয়াছিলেন। কিন্তু বাবাজী তাঁহার সন্ন্যাস অনুমোদন করিলেন না, এবং নানারূপ উপদেশ দিয়া তাঁহাকে গৃহী সাধু হইতে আদেশ করিলেন। এই প্রকার আরও অনেকে সন্ন্যাসের জন্য সাগ্রহ প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কাহাকেও সন্ন্যাস প্রদান করেন নাই।

তিনি যে দুইজন মাত্র শিষ্যকে সন্ন্যাস প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবন বাল্যকাল হইতেই অনন্যসাধারণ। 'আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠো মেধাবী'—উপনিষদুক্ত এই সব লক্ষণ তাঁহাদের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত ছিল। বাল্যকাল হইতেই তাঁহাদের শরীর দৃঢ়, সুস্থ ও সবল ছিল, অনুশীলন দ্বারা তাঁহারা তাহার প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। শীতাতপবর্ষা, অনশন অর্দ্ধাশন, প্রভৃতি সহ্য করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের অসাধারণ ছিল। বাল্যকাল হইতেই তাঁহাদের মন ভোগসুখে বিমুখ, সংসারে উদাসীন, বহুলোকসঙ্গে অনিচ্ছুক ছিল। তাঁহাদের সাহস দুর্জ্জয় ছিল, এবং ব্রহ্মচর্য্য অটুট ছিল। তাঁহাদের শরীর ও মন সর্ব্বাংশে আদর্শ-সন্ন্যাস-জীবন-যাপনের উপযুক্ত হইয়াই গঠিত

হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদিগকেও বাবাজী একবারেই সন্ন্যাসের দীক্ষা প্রদান করেন নাই। বাবা শান্তিনাথজী ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে দীক্ষালাভ করেন। তৎপর অনেক পরীক্ষার ভিতর দিয়া তাঁহাকে যাইতে হইয়াছে। অনেক কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরও বাবাজী তাঁহাকে বিবাহ করিতে, পড়াশুনা করিতে ও সংসারে থাকিয়া পিতামাতার সেবা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ গুরুদেবের এই প্রকার আদেশ তাঁহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা কঠিনতম পরীক্ষা হইয়াছিল। কিন্তু সে অবস্থাতেও তিনি তাঁহার তীব্র ঐকান্তিক মুমুক্ষুতার এমন পরিচয় প্রদান করিলেন যে, গুরুদেব তাঁহার আদেশ প্রত্যাহার করিলেন। তখন তিনি কলেজে পড়াশুনার ভিতর থাকিয়াও ১৮।১৯ ঘণ্টা গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করিতেন ও গুরুচিন্তা করিতেন। অতঃপর ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে গুরুজী তাঁহাকে সন্ন্যাসপ্রদান করিয়া হৃষীকেশে পাঠাইয়া দেন। তদবধি তিনি আদর্শ-সন্ন্যাসীর জীবন-যাপন করিয়া বেদান্তানুযায়ী সাধনে নিমজ্জিত আছেন। এরূপ একনিষ্ঠ নিয়তাভ্যাসী সাধক ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। বেদান্তশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যও তাঁহার অসাধারণ। বাবা নিবৃত্তিনাথজী ১৯১০ খৃষ্টাব্দে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহাকেও বাবাজী গৃহে থাকিয়াই সাধন ভজন করিতে আদেশ করেন, এবং তিনিও গৃহের বহিঃপ্রাঙ্গণে ক্ষুদ্র একটি পর্ণকুটীরে ব্রহ্মচারী তপস্বীর ভাবে জীবন যাপন করিয়া নিত্যনিরন্তর সাধন করিতে থাকেন। কয়েক বৎসর পরে তাঁহার পিতামাতাও গোরক্ষপুর গিয়া বাবাজীর নিকট দীক্ষা লাভ করেন। সেই সময় কথাপ্রসঙ্গে

বাবাজী তাঁহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি তাঁহার পুত্রকে বিবাহ করাইতে ইচ্ছুক কিনা। পিতা বলিলেন যে, 'আমি উহাকে আপনার চরণেই সমর্পণ করিয়াছি'। তৎপরও অনেকদিন বাবাজী তাঁহাকে পিতামাতার সেবা করিতে আদেশ দিয়া গৃহে রাখেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে, তিরোধানের কয়েক মাস মাত্র পূর্ব্বে, বাবাজী তাঁহাকে সন্ন্যাস প্রদান করেন। তিনিও শান্তি-নাথজীরই পদাঙ্কানুসরণ পূর্ব্বক নিয়ত সমাধি-অভ্যাসে নিরত আছেন।

কলিকাতায় শুভাগমন
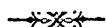
১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বাবা গম্ভীরনাথ নেত্র-চিকিৎসা উপলক্ষে বাঙ্গালার কেন্দ্রভূমি মহানগরী কলিকাতায় শুভ-পদার্পণ করিয়া প্রায় এক মাস অবস্থান করিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার একটি চক্ষুতে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছিল। যাঁহার নিকট জীবন ও মৃত্যু সমান; স্বাস্থ্য ও ব্যাধি, সম্পদ্ ও বিপদ, কর্ম্ম ও বিশ্রাম, সকল অবস্থাতেই সমান ভাবে ব্রহ্মভূত হইয়া অবস্থিতি যাঁহার স্বভাবে পরিণত হইয়াছে, যিনি দেহে থাকিয়াও বিদেহ, সংসারে থাকিয়াও নির্ম্মুক্ত, কর্ম্মকোলাহলের ভিতরে থাকিয়াও নিষ্কর্ম্মা ও নীরব, বিশ্বজগৎ যাঁহার জাগ্রতদৃষ্টির নিকটে স্বপ্নের ন্যায় ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তাঁহার নিজের কাছে অবশ্য এই প্রয়োজনীয়তা-শব্দের বিশেষ কোন অর্থ নাই। যাঁহার দৃষ্টি সংসারের সকল ব্যাপারের অন্তর্নিহিত সত্যের দিকে সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় উন্মুক্ত হইয়া রহিয়াছে, যাঁহার দৃষ্টির সর্ব্বপ্রকার আবরণ নষ্ট হওয়ায় দৃষ্টি ও দৃশ্যের মধ্যে সকল প্রকার ব্যবধান তিরোহিত হইয়াছে, যিনি জ্ঞানাঞ্জনশলাকা-দ্বারা সত্য-দর্শন-প্রার্থীদের চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিবার ব্রতগ্রহণ করিয়া অবিদ্যান্ধ মনুষ্যদিগের নেত্র-চিকিৎসক রূপে সংসারে বিচরণ

করিতেছেন, তাঁহার চক্ষুতে ব্যাধি, তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, জড়ধাতু-নির্ম্মিত অস্ত্রের সাহায্যে তাঁহার দৃষ্টিশক্তির আবরণ বিনষ্ট করিয়া দিতে হইবে, ইহা আপাততঃ নিতান্তই বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়। যিনি সামান্য একটু ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিলেই সর্ব্ব-প্রকার ব্যাধি হইতে মুক্ত থাকিতে পারেন, তাঁহার শরীর ব্যাধিগ্রস্ত কেন হয়, ইহাও বিস্ময়ের বিষয় বটে। কিন্তু মায়িক দেহ মায়ার নিয়মেই চালিত হয়, ভগবানের জগতে জীবদেহ ধারণ করিয়া যতদিন বিচরণ করা যায়, ততদিন মায়াধীশ ভগবানের বিধান মানিয়াই চলিতে হয়। ব্যাবহারিক জগতে অজ্ঞানীও তাঁহার বিধান অনুসারেই চলে, জ্ঞানীও তাঁহার বিধান অনুসারেই চলেন। পার্থক্য এই যে, অজ্ঞানী তাহাতে বিমোহিত হইয়া চলে, অজ্ঞানী এই মায়ার জগতেই এক অবস্থা অনঙ্গলজনক ও দুঃখপ্রদ বোধে পরিহার ও অন্য ঈপ্সিততর অবস্থা লাভ করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়, এবং তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যাপারসমূহ সংঘটিত হইতেছে দেখিয়া নিরর্থক যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে; কিন্তু জ্ঞানী তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিমোহিত ও বিকারপ্রাপ্ত হন না, এই মায়িক জগতের ভিতরে কোন অবস্থাকে বাঞ্ছনীয় এবং কোন অবস্থাকে অবাঞ্ছনীয় তিনি মনে করেন না, এক অবস্থা ছাড়িয়া অন্য অবস্থা পাইবার জন্য তিনি উৎকণ্ঠিত হন না, তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জগতে কোন ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে বলিয়া তিনি মনে করেন না, সকলই পরম আনন্দময়, পরম মঙ্গলময় ভগবানের ইচ্ছার ও শক্তির অভিব্যক্তি রূপে, তাঁহার মায়ার খেলা রূপে তিনি দর্শন করেন।

ঈশ্বরেচ্ছা ও তাঁহার নিজের ইচ্ছার মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য দেখেন না। তিনি পারমার্থিক দৃষ্টিতে সবই মিথ্যা বলিয়া জানেন, এবং ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে সকলই ভগবানের লীলা বলিয়া দর্শন ও সম্ভোগ করেন।

এই ভাবে জগতে বিচরণ করেন বলিয়া, তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণ ব্যাবহারিক বিষয়ে সাধারণতঃ প্রাকৃত মনুষ্যের মতই ব্যবহার করিয়া থাকেন, সাধারণ সচ্চরিত্র ধর্ম্মপরায়ণ বিচারশীল ব্যক্তিগণ যে ক্ষেত্রে যেরূপ আচরণ করেন এবং যেরূপ আচরণ চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী মায়াধীন জনমণ্ডলী অনুসরণ করিয়া কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারে, তাঁহারাও লোকসমাজে তদ্রূপ আচরণই করিয়া থাকেন। তাঁহারা সাধারণ কর্ম্মক্ষেত্রে সাধারণ লোকের মত ব্যবহার করিয়াও এবং লৌকিক সুখদুঃখ ভোগ করিয়াও জ্ঞান প্রভাবে অসাধারণ ভাবে অবস্থান করেন ও নিত্যানন্দ সম্ভোগ করেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষগণের ব্যাবহারিক জীবন যে ভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন, আদর্শ মহাপুরুষদের জীবন পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহাদের লৌকিক জীবন সেই ভাবেই পরিচালিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্ বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥

—"হে ভরতবংশোদ্ভব অর্জ্জুন! অজ্ঞানিগণ কর্ম্মে আসক্ত (কর্তৃত্বাভিমানযুক্ত ও ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত) হইয়া যেরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া থাকে, জ্ঞানী পুরুষ লোকসমাজকে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবার উদ্দেশ্যে অনাসক্তভাবে (কর্তৃত্বাভিমানবিহীন ও ফলা-কাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া) সেইরূপই কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। জ্ঞানী ব্যক্তি স্বীয় আচরণ বা উপদেশ দ্বারা কর্ম্মে আসক্তি-বিশিষ্ট অজ্ঞ জনমণ্ডলীর বুদ্ধিকে কখনও তাহাদের স্বভাবোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের পথ হইতে বিচলিত করিবেন না, বরং লৌকিক দৃষ্টিতে যে সব কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, স্বয়ং সেই সব কর্ম্ম যথাবিধি সম্পন্ন করিয়া তাহাদিগকে তদনুরূপ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবেন।'

জীবন্মুক্ত তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণ সংসারে সবই মায়ার খেলা জানিয়া এবং নিজেদের কোন বিষয়ে প্রয়োজন নাই বলিয়া, যদি লোক সমাজের বিধানানুযায়ী কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিমুখ হন, তবে সাধারণ জনমণ্ডলী তাঁহাদের সমুন্নত আধ্যাত্মিক ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত, এবং তাঁহাদের ন্যায় প্রয়োজন বোধ বিরহিত না হইয়াও, তাঁহাদের বাহ্যিক আচরণের অনুকরণে কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি উদাসীন হইবার এবং নিজেদের স্বাভাবিক আলস্যের ও বাসনার প্রশ্রয় দান করিয়া সর্ব্ববিধ পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং লোক সমাজের কল্যাণের জন্য লোকসমাজে অবস্থিত মহাপুরুষদিগের লোক সমাজের উপযুক্ত বিধানানুসারে চলা ও উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া ভগবান্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বাবা গম্ভীরনাথের সকল লৌকিক কর্ম্ম এই নীতি অনুসারেই সম্পাদিত হইত। যেমন তিনি নিজে কখনও কোন কর্ম্মের সৃষ্টি করিতেন না, কখনও নিজে সংকল্প করিয়া কোনরূপ নূতন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন না, তেমনই আবার তাঁহার লৌকিক জীবনের পথে যখন যে কর্ম্ম আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হইত, দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় লৌকিক হিসাবে যে কর্ম্ম তাঁহার পক্ষে ধর্ম্মবিধি-সঙ্গত কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইত, তাঁহার দৃষ্টিতে নিষ্প্রয়োজন ও অর্থ বিহীন হইলেও তাহা সম্পাদন করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। এবং কোনরূপ যোগৈশ্বর্য্যের প্রকাশ না করিয়া একজন সাধারণ বিচারবান্ সাধু ব্যক্তির ন্যায় যথাবিধি তাহা সম্পাদন করিতেন।

এই নীতির অনুসরণ করিয়াই তিনি কোন প্রকার শারীরিক ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হইলে সুচিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করিতেন এবং চিকিৎসকের উপদেশানুসারে চলিতে ও ঔষধ সেবন করিতে আপত্তি করিতেন না। এই নীতি অনুসারেই মন্দিরের সম্পত্তি নিয়া কোন মামলা মোকদ্দমার কারণ উপস্থিত হইলে তিনি কর্ম্মচারীদিগকে উকীলমোক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করিতে বলিতেন, কোন দাঙ্গাহাঙ্গামা উপস্থিত হইলে পুলিসের সহায়তা গ্রহণ করিতে বলিতেন। কোন শিষ্য বা ভক্ত নিজের বা আত্মীয় স্বজনের বিশেষ কোন পীড়া উপলক্ষে নিতান্ত চিন্তাযুক্ত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, তিনি দু' এক কথায় সমবেদনা প্রকাশ করিয়া সুচিকিৎসকের শরণাপন্ন হইতে উপদেশ দিতেন। কোন

শিষ্য কোনরূপ বিপদে পড়িয়া তাঁহাকে জানাইলে তিনি তাঁহাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য যথোচিত উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক পুরুষকার প্রয়োগ করিতে বলিতেন। অনেক ভক্ত ও শিষ্য এরূপ সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায় তাঁহাকে নিজেদের অবস্থার বিষয় জানাইবার পর: কখন কখন তাঁহার উপদেশানুসারে সামান্যরূপ পুরুষকার প্রয়োগ করিয়াই এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের সুদৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, ইহা বাবাজীর কৃপারই ফল; কিন্তু এ সব ক্ষেত্রেও বাবাজীর বাহ্যিক আচবণে এমন কিছু লক্ষিত হইত না যাহা অবলম্বন করিয়া কেবলমাত্র যুক্তি বিচারের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে তাঁহার ইহাতে কোন হাত ছিল।

একবার তিনি অসুস্থ হইয়া পনর ষোল দিন শয্যাশায়ী ছিলেন। ডাক্তারেরা চিকিৎসা করিতেছিলেন। তিনি বালকের ন্যায় ডাক্তারদের আদেশ ও সেবকদের পরামর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া অবস্থান করিতেন ও ঔষধাদি সেবন করিতেন। তাঁহার শারীরিক অবস্থা দেখিয়া মনে হইত যে তিনি অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন। ইহা দেখিয়া ভক্ত সেবকগণ প্রাণে অধিকতর কষ্ট অনুভব করিতেন। একদিন তাঁহার বীরসেবক কালীনাথ ব্রহ্মচারী কাতর প্রাণে তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন, 'বাবা, আপনি ত সামান্য একটু ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিলে এক মুহূর্ত্তেই রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন, আপনি ত ইচ্ছা করিয়াই এই কষ্ট ভুগিতেছেন, আপনার এই রোগযন্ত্রণা দেখিয়া আমাদের প্রাণে

বড়ই যন্ত্রণা বোধ হইতেছে, আপনি একটু ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া এই রোগটাকে তাড়াইয়া দেন,' ইত্যাদি। তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। অনেক পীড়াপীড়ির পর তিনি গম্ভীরস্বরে বলিলেন যে, 'আমি কি ভগবানের বিধান উল্লঙ্ঘন করিব ?' ব্রহ্মচারী আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না।

১৯১৪ সনের ডিসেম্বর মাসে যখন দেখা গেল যে, বাবাজীর একটি চক্ষু বিশেষ ভাবে রোগাক্রান্ত হইয়াছে এবং চিকিৎসা-শাস্ত্রের মতে অতিশীঘ্র তাহাতে অস্ত্রোপচার আবশ্যক, তখন গোরক্ষপুরে উপস্থিত শিষ্যসেবকগণ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। স্থানীয় ডাক্তারদের দ্বারা একবার অস্ত্র চিকিৎসা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে উপকার না হইয়া বরং একটু অপকারই দেখা গিয়াছিল। পুনরায় তাঁহাদের দ্বারা অস্ত্রোপচার করিলে কোনরূপ সুফল-লাভের সম্ভাবনা ছিল না। তখন তাঁহারা বাবাজীকে কলিকাতা যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এমতাবস্থায় বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাই যুক্তিসঙ্গত। ইহাতে স্বীকৃত না হইলে লৌকিক নিয়মের অন্যথাচরণ করা হয়। সুতরাং তিনি সম্মতিজ্ঞাপন করিলেন। বাঙ্গালা দেশ যে অন্য গূঢ়তর কারণে তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে, গীতোক্ত লোক সংগ্রহের প্রয়োজন যে বাঙ্গালা দেশে যাইতে তাঁহাকে বাধ্য করিতেছে, বহু সংখ্যক নরনারীর সংসারজ্বালাসন্তপ্ত আধ্যাত্মিক শান্তিবারিপিপাসু প্রাণ যে সজ্ঞানে ও অজ্ঞানে নীরবে তাঁহার দিকে কাতরদৃষ্টি নিহিত করিয়া

রহিয়াছে,—ইহা সম্ভবতঃ একমাত্র তিনিই জানিতেন। হয়ত তাহাদের আকর্ষণই তাঁহার কলিকাতা আগমনের মুখ্য হেতু। স্বীয় নেত্রচিকিৎসার ব্যপদেশে তিনি বহুশত বালক-বৃদ্ধ-পুরুষ-নারীর নেত্র চিকিৎসা করিতে চলিলেন, বহু শত অবিদ্যান্ধ বাঙ্গালীর নেত্রের অবিদ্যাবরণ উন্মোচিত করিয়া জ্ঞাননেত্রের নির্ম্মল দৃষ্টি প্রস্ফুটিত করিয়া দিতে চলিলেন। তাঁহার কলিকাতায় অবস্থানের সময় যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদেরই বিচারদৃষ্টির নিকট ইহা প্রতীত হইয়াছে যে, তাঁহার চিকিৎসিত হওয়াটা ছিল যেন গৌণ ব্যাপার, লোকের ভবব্যাধি চিকিৎসা করাটাই ছিল মুখ্য ব্যাপার। তাঁহাদের বোধ হইত যেন তিনি বঙ্গমাতার ক্রোড়দেশে আসন গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার দরিদ্র রোগক্লিষ্ট ক্ষুধাপীড়িত ধর্ম্মার্থী পুত্রকন্যাগণকে হিন্দুজীবনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া ও মানবজীবন-সার্থককর ধর্ম্মামৃত প্রদান করিয়া স্বকীয় বিশ্বপ্রেমময় প্রাণে আশ্রয় দিতেই এখানে উপস্থিত হইয়াছেন।

তিনি যখন কলিকাতা আসিতে সম্মতি প্রদান করিলেন, তখনই উপস্থিত সেবকগণ তাঁহার শিষ্যদের নিকট পত্র, টেলিগ্রাম প্রভৃতি প্রেরণ করিলেন। সকলে তাঁহার অসুস্থতার জন্য কিয়ৎ-পরিমাণে উদ্বিগ্ন হইলেও বহুল পরিমাণে আনন্দেই মাতোয়ারা হইয়া উঠিল। তাঁহার শিষ্যসংখ্যা তখন বেশী নয়, এবং তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই অত্যন্ত দরিদ্র। তথাপি তাঁহারা সানন্দচিত্তে আপনাদের মধ্যে চাঁদা ধরিয়া কলিকাতা যাত্রার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বিধি ব্যবস্থা করিতে ব্রতী হইলেন।

ইতিমধ্যে হবিগঞ্জের প্রসিদ্ধ উকীল, বাবাজীর শিষ্য, শ্রীযুত উমেশচন্দ্র দাস মহাশয় এক রাত্রে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করিলেন। এই স্বপ্ন দর্শন করিয়াই তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, গুরুমহারাজ তাঁহার কলিকাতা যাত্রার ও চিকিৎসা প্রভৃতির সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য তাঁহার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেন। এ বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ হইল না। তাঁহার তখন অর্থকৃচ্ছ্রতা ছিল। কিন্তু অন্তর্যামী প্রভু যখন প্রাণে প্রেরণা দান করেন, তখন হিসাব নিকাশের অবসর থাকে না, ভবিষ্যৎ চিন্তা করিবারও প্রবৃত্তি থাকে না, নিজের উপর নিজের কোন কর্তৃত্বও থাকে না। দাস মহাশয় এই প্রেরণার উন্মাদনায় তৎক্ষণাৎ কতক পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করিয়া গোরক্ষপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আরও কয়েকজন শিষ্য গোরক্ষপুরে গমন করিয়াছিলেন। গোরক্ষপুর পৌঁছিয়াই তিনি উপস্থিত গুরুভাইদের সাহায্যে যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সকল স্থানের গুরুভাইদিগকে সংবাদ দেওয়া হইল। বাবাজীর আদেশে দমদমার গোরক্ষবংশীর মোহান্তের নিকটও সংবাদ প্রেরিত হইল। কলিকাতাস্থ শিষ্যগণ ও ভক্তগণ তাঁহার দর্শন পিপাসায় উৎকণ্ঠিত ও দর্শনাশায় উৎফুল্ল হইয়া দিন গণিতে লাগিলেন। বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানে যে সব শিষ্য ও ভক্ত ছিলেন, তাঁহারা কলিকাতা যাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। অনেক ধর্ম্মার্থী তাঁহার নাম ও মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার চরণাশ্রয় লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অভীপ্সিত

বস্তু এত নিকটে আপনা আপনি আসিতেছে শুনিয়া তাঁহাদের চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

তখন পৌষের প্রথম ভাগ। বাবাজী হিন্দু সাধারণের চিরন্তনী রীতি অনুসারে জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ডাকাইয়া যাত্রার শুভদিন নির্দ্ধারিত করিলেন, যাত্রার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ও সাধুদিগকে ভোজন করাইয়া দক্ষিণা প্রদান করিলেন এবং দরিদ্রনারায়ণ দিগকে অর্থ বিতরণ করিলেন; যাত্রার সময় পূর্ণকুম্ভ প্রভৃতি মঙ্গলকর দ্রব্য সম্মুখে রাখিয়া যথাবিধি যাত্রা করিলেন। বলা বাহুল্য, এ সকলই তাঁহার লোকশিক্ষার অঙ্গীভূত ছিল।

তিনি তাঁহার সন্ন্যাসীশিষ্য বাবা ব্রহ্মনাথ, ব্রহ্মচারী কালীনাথ, উপস্থিত বাঙ্গালীশিষ্যগণ এবং কয়েকজন হিন্দুস্থানী সাধু ও ভক্ত সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আগমন করিলেন। কলিকাতা হইতে পূজ্যপাদ শ্রীযুত রসিকবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শিষ্য ও ভক্তগণ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য মোটর কার সহ যথাসময়ে হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। হাওড়া হইতে তিনি সকলকে লইয়া দমদমা গোরক্ষবংশীতে গমন করিলেন। গোরক্ষবংশীর মোহান্ত-মহারাজ যথারীতি অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার ভক্তগণকে গ্রহণ করিলেন, এবং আন্তরিক আদর আপ্যায়নের সহিত সকলের সমুচিত আহারাদি ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। গোরক্ষবংশী তখন বাঙ্গালী ভক্তদের আশ্রমেই পরিণত হইল। দলে দলে ধর্ম্মপিপাসু লোকসকল অলোক-সামান্য মহাপুরুষের দর্শনলাভ করিয়া কৃতার্থ হইবার মানসে

কলিকাতা হইতে দমদমা যাইতে লাগিলেন। মহাত্মা রামদাস কাঠিয়া বাবার প্রধান শিষ্য, কলিকাতা হাইকোর্টের তাৎকালীন অন্যতম প্রধান উকীল, শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় (বর্ত্তমানে ইনি শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধামের ব্রজবিদেহী মোহান্ত শ্রীমৎ বাবা সন্তদাসজী), মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য শ্রীযুত অভয়নারায়ণ রায়, এবং আরও অনেক ধর্ম্মপ্রাণ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি দমদমা গিয়া তাঁহাকে দর্শন ও অভিবাদন করিয়া আসিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ অনেকেই সেখানে গমন করিয়া তাঁহার সঙ্গ করিতে লাগিলেন। গোরক্ষবংশীতে সারাদিন লোকে লোকারণ্য হইতে লাগিল। একটা অবিরাম আনন্দহিল্লোলে সকলের প্রাণ উন্মাদিত হইতে লাগিল। সেখানে যাঁহারাই যাইতেন, সকলকেই কিছু না কিছু প্রসাদ পাইয়া আসিতে হইত। এটী আশ্রম-ধর্ম্ম, ইহার অন্যথা হইবার যো ছিল না। একদিন সেখানে বিশেষ ভাণ্ডারা দেওয়া হইল, বহু সংখ্যক সাধু ও ভক্ত সেখানে প্রসাদ পাইলেন। বাবাজী তাঁহার একজন বীর্য্যবান্ উদারচেতা যুবকশিষ্যকে এই ভাণ্ডারা ও সাধুসেবার ব্যয়ভার বহন করিতে আদেশ করিলেন, এবং শিষ্যটী তাঁহার প্রতি গুরুদেবের এই বিশেষ কৃপার নিদর্শনে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ও নিজকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিয়া ইহার সম্পূর্ণ খরচ বহন করিলেন। এই ভাবে শিষ্য ও ভক্তগণ সহ বাবাজী তিন দিন গোরক্ষবংশীতে অবস্থান করেন। বলা বাহুল্য যে, যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া এত আনন্দ, এত লোকসমাগম, এত আহারাদির ব্যবস্থা, তিনি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ

সমাহিত ভাবেই সর্ব্বদা বিরাজিত থাকিতেন, কেবলমাত্র মাঝে মাঝে একটু স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে ও এক আধটুকু আশীর্ব্বাদ সূচক অস্ফুট শব্দোচ্চারণে সমাগত ভক্তমণ্ডলীর প্রাণ সুশীতল করিয়া দিতেন। অথচ, মাঝে মাঝে তাঁহার দু' একটি আদেশেই সকলে অনুভব করিতেন যে, সর্ব্বপ্রকার বিধিব্যবস্থার দিকে, সকলের সুবিধা অসুবিধার দিকে, নিরন্তর তাঁহার সুতীক্ষ্ণ ও সপ্রেম দৃষ্টি রহিয়াছে।

ইতোমধ্যে কলিকাতায় প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ষ্ট্রীটের ২০নং ত্রিতল বাটী ভাড়া লওয়া হইল। দমদমায় আগমনের তৃতীয় দিবস অপরাহ্নে বাবা গম্ভীরনাথ সেখানকার আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া শিষ্যবৃন্দ সমভিব্যাহারে কলিকাতায় উক্ত বাড়ীতে গমন করেন। দমদমার আশ্রমে আহারাদি শেষ করিয়া যাত্রা করিতে বেলা অবসানপ্রায় হইয়াছিল। প্রায় সন্ধ্যা সময় বাবাজী কলিকাতার বাড়ীতে পৌঁছিলেন। সে রাত্রে কাহারও আহারাদির প্রয়োজন ছিল না, এবং সেই হেতু শিষ্যগণ তদ্বিষয়ে কোন বন্দোবস্তও করিলেন না। বাবাজী সেখানে পৌঁছিয়া তেতালার উপরে তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনে স্বভাবসিদ্ধ সমাহিত ভাবে বসিয়া আছেন। একজন শিষ্যকে সম্মুখে দেখিয়া হঠাৎ মৃদুভাবে তিনি আদেশ করিলেন,—'কিছু খাদ্যদ্রব্য কিনিয়া আনিয়া সকলের আহারের ব্যবস্থা কর।' শিষ্যটী সরলভাবে বাবাজীকে বুঝাইয়া দিলেন যে, আজ এই মাত্র সকলে আহার করিয়া আসিয়াছেন, কাহারও রাত্রিতে আহারের প্রয়োজন নাই, সুতরাং আহার্য্য আনিবার আবশ্যকতা হইতেছে না। বাবাজী সে কথায় কর্ণপাত করিলেন কিনা

বুঝা গেল না, তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। শিষ্য অনুমান করিলেন যে, তিনি আদেশ প্রত্যাহার করিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে আর একটি শিষ্যকেও তিনি ঐরূপ আদেশ দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। সে শিষ্যটীও মনে করিলেন যে, আমাদের কাহারও কাহারও ক্ষুধা বোধ হইয়া থাকিতে পারে, এরূপ অনুমান করিয়া স্নেহবশতঃই বাবাজী ঐরূপ কথা বলিয়াছেন। তিনিও ইহার অনাবশ্যকতা প্রতিপাদন পূর্ব্বক, বাবাজীর মৌন ভাব হইতে প্রথম শিষ্যের মতই সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহার আদেশ প্রতিপালনে নিবৃত্ত হইলেন। তৃতীয় বারে অপর একজন শিষ্যকে উপস্থিত দেখিয়া বাবাজী বলিলেন যে,—'দেখ, নূতন বাড়ীতে গেলে সেদিন সেখানে কাহারও অভুক্ত থাকা উচিত নয়, ইহারা আশ্রম-ধর্ম্মের নিয়ম জানে না, স্মরণ করাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও ইহারা বুঝিতে পারিল না, বাজার হইতে ভাল মিষ্টি আনাইয়া সকলের মধ্যে বিতরণ কর।' শিষ্যটী এই কথা অন্য শিষ্যদের নিকট বলা মাত্র পূর্ব্বোক্ত শিষ্যদ্বয় আপনাদিগকে অপরাধী বোধ করিয়া লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইলেন।

সকল স্থানে, সকল অবস্থায়, আশ্রম-ধর্ম্মের সকল বিধি-নিষেধের প্রতি সর্ব্ববিধ প্রয়োজনের অতীত, নির্ব্বিকার নিত্য-সমাহিত মহাপুরুষের এইরূপ সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখিয়া সকলেই বিস্ময়ে অভিভূত হইল। সাংসারিক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে বিজ্ঞতাভিমানী ব্যক্তিগণই সেখানে কার্য্যনির্ব্বাহক ছিলেন। কিন্তু এই প্রথম সূচনা হইতেই পদে পদে তাঁহারা অনুভব করিতে লাগিলেন যে, গার্হস্থ্যধর্ম্ম সম্বন্ধে এবং সাংসারিক কর্ত্তব্য পরিপাটীরূপে সম্পাদন

করা সম্বন্ধেও এই সংসারাতীত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিহীন পুরুষটীর নিকট তাঁহারা কত শিশু! তৎক্ষণাৎ বাজার হইতে মিঠাই আনিবার জন্য লোক ছুটিল, প্রচুর পরিমাণে মিঠাই আনিয়া বাবাজীর সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। তাঁহার জন্য কিছু পৃথক্ করিয়া রাখিয়া দেওয়া হইল এবং তাঁহার অনুমতিক্রমে উপস্থিত সকলের মধ্যে অবশিষ্ট মিষ্ট সামগ্রী বিতরিত হইল। সকলেই সানন্দ-চিত্তে 'মিষ্টমুখ' করিলেন। স্বয়ং বাবাজীও আশ্রমের নিয়ম পালনার্থে কিছুঅধিক রাত্রে যৎকিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ভোজন করিয়াছিলেন।

পরদিন হইতে এই বাড়ীতে অগণিত লোকের সমাগম হইতে লাগিল। বাবাজীর শিষ্যগণ ও ভক্তগণ তাঁহাদের নিকটস্থ ও দূরস্থ বহু আত্মীয় স্বজন লইয়া ক্রমে ক্রমে আসিয়া জুটিতে লাগিলেন। বহু কৃপাপ্রার্থী নরনারী সহর হইতে ও মফঃস্বল হইতে আসিতে লাগিলেন। তখন বড়দিনের ছুটী আরম্ভ হইয়াছে; বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন স্থানের অনেক ধর্ম্মপ্রাণ লোক এই সুযোগে তাঁহার দর্শন ও কৃপা লাভ করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। যাঁহাদের বিশেষ কোন নিকট আত্মীয় কলিকাতায় ছিলেন না, তাঁহারা সকলেই এই আশ্রমের অতিথিরূপে গৃহীত হইতেন। বাবাজীর ভাণ্ডার সকলের জন্যই উন্মুক্ত। কোন্ দিন কতলোক আশ্রমের অতিথি হইবেন, কতলোকের জন্য আহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে, আশ্রম সেবক-গণের—কার্য্যনির্ব্বাহক শিষ্যগণের—পক্ষে তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন ছিল। কার্য্যনির্ব্বাহকগণ বলিয়াছেন যে, এই কারণে

প্রথম প্রথম তাঁহাদিগকে কিছু অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল, কিছু বিশৃঙ্খলার মতও বোধ হইতেছিল। প্রায়ই যত লোকের জন্য আয়োজন করা হইত, লোকসংখ্যা তদপেক্ষা অনেক বেশী হইত। কিন্তু সে অসুবিধা হইতে অব্যাহতির পথ তাঁহারা শীঘ্রই আবিষ্কার করিলেন। সমাগত ব্যক্তিদের সুবিধা অসুবিধার দিকে নিজাসনে উপবিষ্ট, অর্দ্ধ নিমীলিতনেত্র মহাপুরুষেরও সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে, তাহা তাঁহাদের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তখন হইতে তাঁহারা বাবাজীর আদেশ গ্রহণ করিয়াই আহারাদির ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহার নিকট তৎসম্বন্ধে আদেশ গ্রহণ করিবার জন্য উপস্থিত হইলে, প্রথমতঃ তিনি লৌকিক ভাবে তাঁহাদিগকেই জিজ্ঞাসা করিতেন যে তাঁহারা কত লোকের সমাগমের আশা করেন। তাঁহারা তাঁহাদের অনুমান অনুসারে উত্তর করিলে, তিনি তাঁহার আদেশ জ্ঞাপন করিতেন। শিষ্যগণ যেরূপ আন্দাজ করিতেন, দেখা যাইত, তিনি সাধারণতঃ তদপেক্ষা বেশী আয়োজন করিতে বলিতেন। প্রতিদিন আয়োজনের পরিমাণ অবশ্য সমান হইত না। কিন্তু তিনি যেদিন যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত করিতে আদেশ করিতেন, লোকসংখ্যা যাহাই হউক না কেন, তাহাতেই সঙ্কুলান হইয়া যাইত। এই সব সাংসারিক বিষয়েও তাঁহার বিধিব্যবস্থা দেখিয়া তাঁহারা অবাক হইয়া থাকিতেন। তখন হইতে প্রায় সব ব্যাপারেই তাঁহারা তাঁহার উপদেশ ও অনুমতি লইয়া বন্দোবস্ত করিতেন। তিনিও তাঁহার স্বভাবানুরূপ 'হাঁ' 'আচ্ছা' 'নেহি' বা তদ্রূপ সংক্ষিপ্ত দু' একটি বাক্য উচ্চারণ করিয়া সকল ব্যাপার

পরিচালিত করিতেন। অতিথিসেবা উপলক্ষে অনুসন্ধিৎসু শিষ্যগণ কখন কখন কিঞ্চিৎ অলৌকিক শক্তির প্রকাশও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। হয়ত ইহা অবস্থানুসারে আপনা আপনি প্রকাশিত হইয়া পড়িত, কিংবা হয়ত তিনি তদ্দ্বারা শিষ্যদিগকে সেবাধর্ম্মের গুরুত্ব বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহারা বলেন যে, তদবধি ভাণ্ডারা সম্বন্ধে আর কোন গোলমান উপস্থিত হয় নাই, বাবাজীর নির্দ্দেশ অনুসারে সকল প্রকার বিধিব্যবস্থা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়া যাইত।

কলিকাতার বাড়ীতে আগমনের ২।৩ দিন পরেই গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য ডাক্তার শ্রীযুত নরেন্দ্র সামন্তের পরামর্শানুসারে নেত্র-চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ মৈত্র ও ডাক্তার মেনার্ড্‌কে আনাইয়া চক্ষু পরীক্ষা করান হয়। তাঁহারা তৃতীয় দিবসে অস্ত্রোপচারের দিন নির্দ্ধারিত করিয়া বাবাজীর অভিমত জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন 'যেদিন তোমাদের খুসী, সেই দিনই হইবে।' ডাক্তার মেনার্ড্‌ যথাসময়ে অস্ত্রোপচার করিলেন। ড্রেস্‌ করা প্রভৃতি অন্যান্য সমস্ত কার্য্যের ভার ডাক্তার নরেন্দ্র সামন্ত মহাশয় গ্রহণ করিলেন। তিনি কেবলমাত্র ডাক্তার ভাবে নয়, নিজের ভক্তির প্রেরণায়, প্রাণের আবেগে, কায়মনোবাক্যে বাবাজীর সেবা করিতে লাগিলেন। অস্ত্রোপচারের পর ডাক্তারগণ আদেশ করিলেন যে, বাবাজী যেন কয়েকদিনের মধ্যে মলমূত্র-ত্যাগের জন্যও শায়িত অবস্থা হইতে উত্থান না করেন। বাবাজী তাহা শুনিয়া একবার নাকি বলিয়াছিলেন যে, 'তাহা কেমন করিয়া হয়?' কিন্তু ডাক্তারগণ যখন এ নিয়ম পালন করা

প্রয়োজনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, তখন তিনিও সম্মতি জানাইলেন। বাবাজী সেই নিয়ম পালনের জন্য ২।৩ দিনের মধ্যে মলমূত্র ত্যাগের কোন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না, ঠিক এক অবস্থাতেই শায়িত থাকিয়া কয়েকদিন অতিবাহিত করিলেন। এই দুই তিন দিনের পর আরও কয়েক দিন তিনি অধিকাংশ সময় শায়িত অবস্থাতেই থাকিতেন, মাঝে মাঝে উঠিয়া শয্যার উপরেই উপবেশন করিতেন, সেই ঘরেই মলমূত্র ত্যাগ করিতেন, ঘরের বাহির হইতেন না। লোকজনের বেশী যাতায়াতে অসুস্থতা বৃদ্ধি পাইতে পারে আশঙ্কায় ডাক্তারগণ ৬।৭ দিন সে ঘরে লোক-সমাগম নিষেধ করিলেন। শিষ্যগণ বাবাজীর তদনুরূপ অনুমতি গ্রহণ করিয়া সে সময় প্রায় সমস্ত দিনই ঘরের দরজা বন্ধ রাখিতেন। তাঁহাদের মধ্যে ২।১ জন মাত্র সময়ানুরূপ সেবার জন্য কখনও ঘরের ভিতরে, কখনও বা ঘরের বাহিরে দরজার নিকটে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন।

বাবাজী যতদিন কলিকাতায় ছিলেন, প্রায় প্রত্যহই সারাদিন দর্শনার্থী লোক দ্বারা সে বাড়ী পরিপূর্ণ থাকিত। যে দিন তাঁহার চক্ষুতে অস্ত্রোপচার হয়, তদবধি কয়েকদিন মাত্র তাঁহার ঘরে কাহাকেও যাইতে দেওয়া হইত না। সে সব দিনেও নীচের তলায় লোকে লোকারণ্য হইত। অনেকে তিনি কিরূপ আছেন, তাহার খবর নিয়া যাইতেন। অনেকে একটিবার মাত্র তাঁহার দর্শনের প্রার্থনা জানাইতেন। সেবকগণ সকলকেই যথারীতি অভ্যর্থনা করিতেন। কোন আগন্তুক কোনরূপে ক্ষুণ্ণ না হইয়া

স্থান, এ দিকে তাঁহাদের সংর্কদৃষ্টি থাকিত। বাবাজীরই তদ্রূপ আদেশ ছিল। যখন দর্শনার্থীদিগের অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভবপর হইত না, তখনও তাঁহারা সানুনয়ে ডাক্তারদের আদেশ ও বাবাজীর স্বাস্থ্যের কথা বুঝাইয়া তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিতেন, কোনরূপ কর্ক্কশ ব্যবহার করিতেন না। কাহারও প্রতি কর্ক্কশ ব্যবহার করিলে বাবাজীর প্রতিই সেবাপরাধ হইবে, এ কথা তাঁহাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইত।

নিষিদ্ধ কয়েক দিন ব্যতীত প্রায় প্রতিদিনই বহুসংখ্যক লোক দর্শনার্থী হইয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিতেন ও তাঁহার আসনের নিম্নস্থ বিস্তৃত বিছানায় বসিয়া থাকিতেন। বৈকাল বেলায়ই বেশী ভিড় হইত। বাবাজী তাঁহার খাটের উপর অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় সমাহিত ভাবে উপবিষ্ট থাকিতেন। ভক্তগণ আসিয়া প্রণাম করিয়া নীচের বিছানায় উপবেশন করিতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইতেছে; কাহারও মুখে কথাটী নাই, অথচ উঠিয়া যাইতেও ইচ্ছা হইতেছে না। কদাচিৎ কোন জিজ্ঞাসু কোন বিষয়ে উপদেশ প্রার্থনা করিলে বাবাজী অতি সংক্ষেপে দু' এক কথায় তাহার উত্তর প্রদান করিতেন। কেবলমাত্র প্রশ্নের জন্য কেহ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, অথবা ঘরের নীরবতা ভঙ্গ করিবার জন্য বা তাঁহার মুখের কথা শুনিবার জন্য কেহ কোন কথা উত্থাপন করিলে, তিনি নীরবই থাকিতেন। একজন ভক্ত * এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"তেতালায় ঠাকুরের ঘরে নীচে বিছানা

* শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী দত্ত গুপ্ত।

পাতিয়া দেওয়া হইত, উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী সেখানে বসিয়া থাকিতেন। ঠাকুর, যেমন বরাবরই দেখিয়াছি, কোন কথা বলিতেন না, খাটের উপর বসিয়া আছেন, দৃষ্টি আনত; এক ঘর মানুষ সামনে বসিয়া, যেন তঁাহার নীরবতার সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছে; মাঝে মাঝে এক এক জন শিষ্য তামাক দিতে যাওয়া আসাতেই যেন নিস্তব্ধতা চঞ্চল হইতেছে। ক্বচিৎ কোন দিন যদি বা কেহ সাহস করিয়া ২।১টী কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, তিনি এক আধ কথায় প্রশ্নের সঠিক উত্তরটী দিয়া, অথবা 'হাঁ' কি 'না' বলিয়া সমাপ্ত করিয়া দিতেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে সেই বৈকালিক বৈঠকে প্রায় কেহই বসিতেন না, কারণ, অভ্যাগত লোক দ্বারাই ঘর ভরিয়া থাকিত। একটা মজা দেখিতাম যে, এই নিস্তব্ধ বৈঠকে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর যেন ধৈর্য্যের পরীক্ষা হইত। একাদি ক্রমে এরূপ ৩।৪ ঘণ্টা সকলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিতেন না। কেহ কেহ অর্দ্ধ ঘণ্টা, সিকি ঘণ্টা বসিয়াও চলিয়া যাইতেন। আবার কেহ কেহ সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিয়া দীক্ষার অনুমতি প্রার্থনার সুযোগ খুঁজিতেন। ক্বচিৎ পূর্ব্বাহ্ণে, প্রায়ই অপরাহ্ণে এরূপ বৈঠক বসিত। কলিকাতা নিবাসী গণ্যমান্য বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী, অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত থাকিতেন। অনেক দিনই এইরূপ নীরবে চলিয়া যাইত। এক আধটুকু কথা যাহা হইত, তাহা প্রায়ই সম্মুখস্থ ঠাকুর বাড়ীর সান্ধ্য নহবতের বাজনার পরে হইত।"

গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ অবসর পাইলেই আসিয়া বাবাজীর সঙ্গ সম্ভোগ করিতেন। গোস্বামী মহাশয়ের অন্যতম শিষ্য, সুপ্রসিদ্ধ গায়ক, শ্রীযুক্ত রেবতী মোহন সেন মহাশয় মাঝে মাঝে আসিয়া বাবাজীকে কীর্ত্তন শুনাইতেন। বাবাজী তাঁহার কীর্ত্তন শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন। কখন কখন তিনি সঙ্গীতের তালে তালে অঙ্গুলি দ্বারা টোক্কাও দিতেন। একদিন রেবতী বাবু তাঁহার 'মূক ও বধির বিদ্যালয়ের' কয়েকটি ছাত্র সঙ্গে আনিয়া তাহারা যে কথা বুঝিতে ও বলিতে পারে, ইহা বাবাজীকে দেখাইলেন। বাবাজী দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন, এবং তাহাদিগকে মিঠাই খাওয়ার জন্য কয়েকটি টাকা দিলেন।

অল্পবয়স্ক বালক বালিকাদিগকে আদর করিয়া খাওয়াইতে তিনি বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন বলিয়া মনে হইত। গোরক্ষপুরেও ইহা অনেক সময় দেখা যাইত। কখন কখন দেখা গিয়াছে যে, ভক্তগণ তাঁহাকে যে ফল কি মিষ্টদ্রব্যাদি অর্পণ করিতেন, ছোট বালক বালিকা উপস্থিত থাকিলে, ইহার অগ্রভাগ তিনি তাহাদিগকে প্রদান করিতেন। তাহারা তাঁহার সম্মুখে খেলা করিতে করিতে খাইতে থাকিলে তিনি আনন্দের সহিত তাহা দেখিতেন। কেহ তাহাদের চঞ্চলতা নিবারণ করিতে গেলে তিনি তাহাকে নিষেধ করিতেন। তিনি যখন গোরক্ষপুরে তাঁহার গুরুজীর সমাধিমঠের রোয়াকের উপর বসিয়া থাকিতেন, তখন কোন শিশু তাঁহার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকিলে, তিনি গোরক্ষনাথ মন্দির হইতে মিষ্টি বা ফল আনিয়া তাহাকে

দিবার জন্য উপস্থিত কোন সাধুকে আদেশ করিতেন। তিনি যখন নিজের ঘরে বসিয়া থাকিতেন, তখন কোন বালক বা বালিকা তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলে, তিনি অনেক সময় নিজের হাতে প্রসাদী ফল বা মিষ্ট দ্রব্য তাহাকে আশীর্ব্বাদ স্বরূপ প্রদান করিতেন। গোরক্ষপুরে একদিন বিকালে তাঁহার জনৈক শিষ্যের শিশু-পুত্র পিতার সঙ্গে গিয়া বাবাজীর সম্মুখে শৈশবোচিত ক্রীড়া করিতেছিলেন, বাবাজীও তাহার দিকে প্রসন্নদৃষ্টি স্থাপন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছিলেন। কথায় কথায় তাহার পিতা বলিলেন যে, শিশুটীর দুগ্ধপানে বড় অরুচি। সে দিন বাবাজীকে রাত্রে যে দুগ্ধ দেওয়া হইয়াছিল, তিনি তাহা হইতে সামান্য এক চুমুক পান করিয়া সেবককে বলিলেন,—"বাঁ—কা লেড়কাকো দেও।" শিশুটী সেই প্রসাদী দুগ্ধ সে রাত্রে সবটুকুই বিনা আপত্তিতে পান করিয়া ফেলিল।

তাঁহার একজন শিষ্য লিখিয়াছেন যে, কলিকাতায় "এক অপরাহ্নে ঠাকুর বসিয়া আছেন, নীচের পাতা বিছানায় উপস্থিত ভদ্রলোকদের পুরোভাগে কয়েকটী বালক উপবিষ্ট আছে; ঠাকুর আমাকে ডাকিয়া খাটের নীচ দেখাইয়া বলিলেন যে,—কৌটার আঙ্গুর ফলগুলি ইহাদিগকে দেও। আমি এক কৌটা হইতে আঙ্গুর লইয়া প্রত্যেককে বণ্টন করিয়া দিতে অগ্রসর হইতে ছিলাম। বাবাজী ইঙ্গিত করিলেন যে, আরও দুই একটি কৌটার সব ফল গুলি একত্র করিয়া তাহাদিগকে প্রদান কর এবং তাহারা আপনারাই বণ্টন করিয়া গ্রহণ করুক। আমি নিজ সঙ্কীর্ণতায় ও কর্ত্তৃত্বের প্রবৃত্তিতে সঙ্কুচিত হইলাম।"

ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, পুরুষ, নারী, উচ্চপদস্থ, পদমর্য্যাদা-বিহীন, উচ্চজাতীয়, নিম্নজাতীয়—সকল প্রকার লোকই তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেন। তাঁহার দৃষ্টি সকলের প্রতিই সমান ছিল, তাঁহার ব্যবহারও সকলের প্রতিই প্রায় সমান দেখা যাইত। তবে ধনাভিমানী, পাণ্ডিত্যাভিমানী, পদাভিমানী ও জাত্যভিমানী লোকদের প্রতি কখন কখন তাঁহার একটু বাহ্যিক উপেক্ষার ভাব লক্ষিত হইত। সেবকেরা কখন কখন লক্ষ্য করিয়াছেন যে, এক একদিন সকাল বেলাই তিনি হঠাৎ একটু বেশী অসুস্থ বোধ করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ করিতেন এবং কাজেই সে দিন তাঁহার ঘরে লোক সমাগম নিষিদ্ধ হইত, এবং ঘটনাক্রমে এমন দিনেই মটর কারের পর মটর কার আসিয়া উপস্থিত হইত ও অনেক ধনী ব্যক্তি তাঁহার দর্শনের জন্য আসিয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতেন। আবার, যথার্থ সম্মানার্হ ব্যক্তিকে সম্মানদান করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না।

বাবাজী কলিকাতায় আসিবার কয়েকদিন পরেই কয়েক জন ধনী ও উচ্চপদস্থ ভক্ত তাঁহাকে এই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বাড়ী হইতে চৌরঙ্গী রাস্তার উপরে একটি স্বাস্থ্যকর সুবৃহৎ সুসজ্জিত অট্টালিকায় লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং সর্ব্ব-প্রকার ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হইলে, তিনি উক্ত ভক্তদের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই হউক, বা শিষ্যদিগকে একটু পরীক্ষা করিবার জন্যই হউক, শিষ্যদের নিকট কথাটি

উত্থাপন করিলেন। একজন শিষ্য একটু অভিমান ভরে ও কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিলেন যে,—'আমরা দরিদ্র এবং ভক্তিহীন, আপনার উপযুক্ত সেবা করিতে পারি, এমন সাধ্য আমাদের নাই, উঁহাদের যথেষ্ট ধনবল আছে, ভক্তিবলও আছে, উঁহারা আপনাকে লইয়া গেলে আমরা রাখিব কিরূপে ?' বাবাজী অমনি বলিলেন,— 'হারে, না, না, আমি যাব না'। বাবাজী উক্ত ভক্তদিগকে বুঝিতে দিলেন যে ইহাদের প্রাণে আঘাত লাগিবে বলিয়াই তিনি অন্যত্র যাইতে পারিলেন না। ধনীর অট্টালিকা অপেক্ষা দরিদ্রের ক্ষুদ্র কুটীর চিরদিনই তাঁহার প্রিয়তর।

বাবাজী যখন কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে বহুবাঙ্গালীর গুরু, স্বনামখ্যাত মহাপুরুষ, পূজ্যপাদ বাবা ভোলানন্দ গিরি মহারাজও কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার দর্শনলাভ ও উপদেশ শ্রবণের জন্য অনেক লোক তাঁহার আবাসে যাতায়াত করিতেন। বাবাজীর শিষ্যগণও কেহ কেহ মাঝে মাঝে তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিতে যাইতেন। গিরি মহারাজ তাঁহাদের সহিত কখন কখন বাবাজীকে ফল ও মিষ্ট সামগ্রী উপহার পাঠাইতেন এবং প্রণাম জানাইতেন।

গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য শ্রীযুত কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় একদিন বাবাজীকে দর্শন করিতে আসেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার ২।৩টী শিষ্য ছিলেন। তখন বাবাজী আহারান্তে বিশ্রাম করিতে ছিলেন। সে সময় সাধারণতঃ তাঁহার ঘরে কাহাকেও যাইতে দেওয়া হইত না। কিন্তু ব্রহ্মচারীজীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবশতঃ

সেবকগণ বাবাজীর অনুমতি লইয়া সশিষ্য ব্রহ্মচারীজীকে তেতালায় লইয়া গেলেন। বাবাজী তাঁহাকে সস্নেহে গ্রহণ করিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যদের প্রতি তাঁহার একটু বিশেষ কৃপাদৃষ্টি সর্ব্বদাই লক্ষিত হইত। তিনি প্রণামান্তে আসন গ্রহণ করিয়া বাবাজীর নিকট অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। অনেক বিষয় নিবেদন করিতে লাগিলেন। বাবাজী প্রসন্নচিত্তে দু' একটি কথা বলিলেন এবং মাঝে মাঝে 'আনন্দ' 'আনন্দ' উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। বিদায় কালে ব্রহ্মচারীজী সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া, তৎপর নতজানু হইয়া বসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিলেন যে 'গোঁসাইজীর উপর আপনার যেরূপ কৃপাদৃষ্টি ছিল, এ অধীনের উপরও যেন সেইরূপ থাকে'। বাবাজী আনন্দোৎফুল্লনেত্রে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া 'হাঁ', 'হাঁ' বলিতে লাগিলেন। কেবলমাত্র এইরূপ ভক্তিগদ্‌গদচিত্ত ভক্তদের আন্তরিক আবেগ-যুক্ত প্রার্থনা ও কথাবার্ত্তার সময়েই বাবাজীর মুখে চোখে একটু উচ্ছ্বাসবিশিষ্ট ভাবের বিকাশ দেখা যাইত।

একদিন কয়েকজন ভদ্রলোক একজন খঞ্জ ভদ্রলোককে কোলে তুলিয়া তেতালায় বাবাজীর নিকটে আনিলেন। ভদ্রলোকটি বাবাজীর আসনের অতি নিকটে উপবেশন করিলেন। তিনি প্রথমে দু' একটি কথা বলিলেন। তৎপর উভয়েই নীরব, তাঁহাদের মধ্যে কোন কথাবার্ত্তা হইতে শোনা গেল না। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে অবস্থান করিয়া ভদ্রলোকটি শরণাগতির ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক অবলুণ্ঠিত মস্তকে বাবাজীকে প্রণাম করিলেন;

বাবাজী বিশেষ কারুণ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একবার মাত্র 'হাঁ' বলিলেন। ভদ্রলোকটি যুক্তকরে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক সঙ্গীদের উপর ভর করিয়া দোতালার বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। তিনি নাচে আসিয়া উপস্থিত ভক্তগণের নিকট বলিয়াছিলেন, যে এই খঞ্জত্ব প্রাপ্তির পূর্ব্বে তিনি প্রায় ৩০ বৎসর অনেক সাধু মহাত্মার সঙ্গ করিয়াছিলেন, এবং তন্মধ্যে একজন মহাপুরুষ তাঁহার প্রতি কৃপা পূর্ব্বক কয়েকটি প্রণালী শিক্ষা দিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন যে, যে কোন সাধু সন্ন্যাসীর নিকট তিনি যাইবেন, তিনি তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিবেন, এবং সেই সাধু কেমন, তাহা বুঝিতে পারিবেন। তিনি বাবাজীর সম্বন্ধে বলিলেন, 'আপনারা কেন এখানে বসিয়া আছেন? কায়মনোবাক্যে ইঁহার শরণাগত হউন। একমাত্র ইঁহার কৃপা ব্যতীত কিছুতেই ইঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারিবেন না। ত্রিগুণাতীত মহাপুরুষ,—আমি প্রথমতঃ স্তব স্তুতি করিয়া দেখিলাম, ভ্রূক্ষেপ নাই; ক্রোধ করিয়া দেখিলাম, টলিলেন না; অবশেষে শরণাপন্ন হইলাম ও প্রণাম করিলাম, তখন তিনি 'হাঁ' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।' বলা বাহুল্য, তিনি বাহিরে এ সব কিছুই করেন নাই। বাহির হইতে বাবাজীর ও তাঁহার সামনাসামনি স্থিরনিস্তব্ধ ভাবে উপবেশন, মাঝে মাঝে বাবাজীর সকরুণ দৃষ্টিপাত, ভদ্রলোকটির ভক্তিপূর্ণ প্রণাম এবং বাবাজীর কারুণ্যপূর্ণ 'হাঁ' শব্দ উচ্চারণ ব্যতীত আর কিছুই অন্যান্য জনকর্ত্তৃক লক্ষিত হয় নাই।

একদিন একজন ভদ্রলোক একটি কমলালেবু হাতে করিয়া বাবাজীকে দর্শন করিতে আসেন। তখন বাবাজীর অসুস্থতানিবন্ধন ঘরের দরজা বন্ধ ছিল, এবং সে ঘরে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না, সুতরাং ভদ্রলোকটিও প্রবেশ করিতে অনুমতি পাইলেন না। দর্শনলাভ ঘটিল না বলিয়া নিজের দুর্ভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে বিষণ্ণমুখে তিনি কিয়ৎকাল প্রতীক্ষা করিলেন, তৎপর কমলালেবুটি বাবাজীকে দিবার জন্য সেবকের হস্তে প্রদান পূর্ব্বক উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সেবক লেবুটি নিয়া বাবাজীর বিছানার একপার্শ্বে রাখিয়া দিলেন। বাবাজী অধিক রাত্রে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বিছানার পার্শ্ব হইতে কমলালেবুটি গ্রহণ পূর্ব্বক স্বহস্তে খোসা ছাড়াইয়া সবটাই খাইয়া ফেলেন। পরদিন সকালে তাঁহার বিছানার নীচে খোসা দেখা গেল। সেবকগণ অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অচিন্তিতপূর্ব্ব ঘটনা দর্শন করিয়া ভদ্রলোকটিকে ঐকান্তিক ভক্তিমান্ ও সৌভাগ্যবান্ মনে করিতে লাগিলেন এবং অজ্ঞাত ভক্তের প্রতি বাবাজীর কৃপা দর্শনে বিমোহিত হইলেন। পরে জানা গিয়াছে যে, ভক্তটী গোস্বামী মহাশয়ের একজন শিষ্য। বাবাজী ভক্তের সাত্ত্বিক আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখিতেন না। তাঁহার এইরূপ কৃপার নিদর্শন কত সময় কত ভাবে পাওয়া গিয়াছে, তাহা সবিশেষ বর্ণন করা অসম্ভব।

একদিন কলিকাতার মহানির্ব্বাণমঠের জনৈক ভক্ত কিছু ফল লইয়া বাবাজীকে দর্শন করিতে যান। তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার আন্তরিক আগ্রহ হইয়াছিল যে, নির্জ্জনে বাবাজীর নিকট

২।৪টী কথা নিবেদন করেন এবং বাবাজীর উপদেশ গ্রহণ করেন। তিনি মুখে এ প্রার্থনা জানাইতে সঙ্কোচ বোধ করিলেন, এবং মনে মনে প্রার্থনা করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন আরও কয়েকজন ভক্ত সে ঘরে উপস্থিত ছিলেন। বাবাজী যেন তাঁহার আন্তরিক প্রার্থনায় দয়ার্দ্র হইয়া, উপস্থিত ভক্ত কয়েকটীকে এ কাজে সে কাজে পাঠাইয়া বিদায় করিয়া দিলেন, এবং তাঁহাকে দু' একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার সংকোচ দূর করিয়া দিলেন। তখন ভক্তটী বাবাজীর করুণায় বিগলিত হইয়া আবেগ-ভরে আপনার বক্তব্য বলিতে লাগিলেন, এবং বাবাজীও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মৃদু ভাবে ও অল্প কথায় ভক্তটির জিজ্ঞাস্য বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিতে লাগিলেন।

কলিকাতায় বহুসংখ্যক নরনারী বালকবৃদ্ধ বাবাজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার নিকট পূর্ব্বে যাঁহারা দীক্ষা লাভ করিয়া প্রাণে শান্তি অনুভব করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্বভাবতঃই তাঁহাদের স্ত্রী পুত্র ও আত্মীয় স্বজন দিগকে নিজেদের সৌভাগ্যের অংশী করিবার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন; তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনগণও অনেকেই তাঁহার চরণাশ্রয় লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্র, এবং দরিদ্রদের মধ্যেই যে ধর্ম্ম-পিপাসা অধিক হইয়া থাকে, ইহা একটি চিরন্তন সত্য, এবং বোধ হয় ইহা ভগবানের একটি বিধান। এই শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার নাম ও মাহাত্ম্য শ্রবণে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট

হইয়া, অথবা কোন অলৌকিক উপায়ে তাঁহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া, প্রাণের আবেগে কোন সুযোগ করিয়া গোরক্ষপুর গিয়াছিলেন। কিন্তু পরিবারস্থ সকলকে নিয়া গোরক্ষপুর পর্য্যন্ত যাইবার পাথেয় প্রভৃতি সংগ্রহ করা অনেকের পক্ষেই কষ্টসাধ্য ছিল। তাঁহারা মনে করিলেন যে এই দীক্ষালিপ্সু দরিদ্রের জন্যই ঠাকুরকে এই নিম্নভূমিতে অবতরণ করিতে হইয়াছে। অনেক ধর্ম্মপিপাসু তাঁহার নাম ও মহিমা শ্রবণ করিয়া মনে মনে তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সাংসারিক নানারূপ বাধাবিঘ্ন বশতঃ গোরক্ষপুর যাওয়ার সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহারা ভাবিলেন যে, তাঁহাদিগকে কৃপা করিবার উদ্দেশ্যেই অহেতুক-কৃপাসিন্ধু গুরুদেব স্বীয় নেত্রচিকিৎসার ছলে স্বয়ং আসিয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন! অনেক ধর্ম্মপ্রাণ বালক-বালিকা তাঁহার নাম ও মহিমা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিল, কিন্তু পিতামাতা বা অন্য অভিভাবকদিগের সহানুভূতি ও সাহায্যের অভাবে গোরক্ষপুর যাইবার কোন সুবিধা পায় নাই। তাহারা এবার তাঁহাকে নিকটে পাইয়া গোপনে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণের সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। বাঙ্গালা দেশে যাঁহারা যেখানে তাঁহার চরণাশ্রয় লাভের জন্য ব্যগ্র ছিলেন, তাঁহার কলিকাতায় আগমনে তাঁহাদের অনেকেরই ধারণা হইল যে, তিনি তাঁহাদের জন্যই এত নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এবং এ সুযোগ গ্রহণ করিতেই হইবে। যাঁহাদের প্রাণে ধর্ম্ম-পিপাসা ছিল এবং সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা-

বোধও ছিল, কিন্তু কোন মহাপুরুষের শরণাপন্ন হইলে তাঁহাদের অভীষ্টসিদ্ধি হইবে, তৎসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিতে-ছিলেন না, (বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশে সময়ের গুণে বা দোষে 'মহাপুরুষ' বলিয়া প্রথিত লোকের বড় অভাব নাই!), এমন অনেক ভক্ত তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিতে যাইয়া সেই সংশয় ও দ্বিধা হইতে মুক্তিলাভ করিলেন এবং তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইলেন। কেহ কেহ কৌতূহল বশতঃ বা বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে অথবা দলে পড়িয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মূর্ত্তি দর্শন করিবার পরই যেন 'সোণার কাঠির' স্পর্শে তাঁহাদের অন্তরের সুপ্ত ধর্ম্মভাব জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, এবং অলক্ষিতে তাঁহাদের চিত্তকে তাঁহার চরণে সংলগ্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

এইরূপে বহুসংখ্যক ধর্ম্মার্থী লোক কলিকাতায় তাঁহার আশ্রয় লাভ করেন। তাঁহাদের মধ্যে পুরুষ, স্ত্রী, বালক, যুবক, বৃদ্ধ, ধনী, নির্ধন, উচ্চবর্ণ সম্ভূত, নিম্নবর্ণজাত,—সকল প্রকার ভক্তই ছিলেন। অকপটচিত্তে দীক্ষাপ্রার্থী হইলে, তিনি কখনও প্রত্যাখ্যান করিতেন না। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, বাস্তবিকই বাবাজী তখন কল্পতরু হইয়া বসিয়াছিলেন। যাহাদের চিত্তে কপটতা থাকিত, অথবা যাহারা কোন সাংসারিক অভীষ্টসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণের মতলব করিয়া যাইত, তাহারা তাঁহার নিকট দীক্ষার প্রার্থনা জানাইতেই সমর্থ হইত না। তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেই তাহাদের মতলব শিথিল হইয়া যাইত, দীক্ষার কথা ভুলিয়া যাইত, অথবা সেরূপ কোন প্রস্তাব করিতে

সঙ্কোচ বোধ করিত। এই প্রকার অবস্থা অনেক ব্যক্তির সম্বন্ধেই শোনা গিয়াছে।

বাবাজীর নিকট কয়েক জন ভক্ত ও শিষ্য একদিন প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন যে, পূর্ব্ববঙ্গের অনেক নরনারী আপনার চরণাশ্রয় লাভের জন্য ব্যাকুল, অথচ তাঁহারা কলিকাতা পর্য্যন্ত আসিতেও সমর্থ হইতেছেন না, আপনি দয়া করিয়া যদি ঢাকায় যাইতে স্বীকৃত হন, তবে তাঁহারা কৃতার্থ হইতে পারেন; আপনি অনুমতি প্রদান করিলে আমরা তদ্রূপ বন্দোবস্ত করি। তাঁহাদের সাগ্রহ প্রার্থনা সত্ত্বেও বাবাজী তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। লোক-সকলকে কৃপা করিবার প্রকাশ্য উদ্দেশ্য লইয়া তিনি কোথাও যাইবেন, বা কোন কার্য্যে ব্রতী হইবেন, ইহা তাঁহার ব্যাবহারিক জীবনের নীতির বিরুদ্ধ ছিল। ইহাতে যে অভিমানের গন্ধ পাওয়া যায়! তিনি শিষ্য ও ভক্ত দিগকে সম্পূর্ণ নিরভিমান হইতে শিক্ষা দিতেন। লোকশিক্ষা দেওয়ার অভিমানও অভিমান। অভিমান যে পরিমাণে থাকে, আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হইবার পথ সেই পরিমাণে রুদ্ধ থাকে। অভিমান বর্জ্জনের চেষ্টাই আধ্যাত্মিক জীবনের সর্ব্বপ্রধান সাধনা। তত্ত্বজ্ঞানে তাঁহার নিজের অভিমান অবশ্য সম্পূর্ণরূপেই ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল, তাহার পুনরুত্থানের কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ভক্ত ও শিষ্যদিগকে অভিমান বর্জ্জন শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার ব্যাবহারিক জীবনও এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইত, যেন তাঁহারা তাঁহাদের স্থূলদৃষ্টিতেও কোনরূপ অভিমানের চিহ্ন তাঁহার আচরণে

লক্ষ্য করিয়া ভ্রমে পতিত না হন। প্রকাশ্যতঃ তিনি স্বীয় নেত্র-চিকিৎসার জন্যই কলিকাতায় আসিয়াছিলেন,—লোক সকলকে কৃপা করিতে নয়। ভক্তদের ব্যাকুল প্রার্থনার উত্তরে তিনি আস্তে আস্তে বলিয়াছিলেন যে, যাহাদের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহারা সকলেই আসিয়া জুটিবে, এবং তাহাদের দীক্ষা-লাভের কোন উপায় হইয়া যাইবে।

বাবাজীর কলিকাতা পৌঁছিবার ২।৩ দিন পর হইতেই কিছু কিছু করিয়া দীক্ষা আরম্ভ হয়। চক্ষুতে অস্ত্রোপচারের পর হইতে কয়েকদিন মাত্র তাঁহার গৃহে লোকসমাগম নিষিদ্ধ ছিল এবং দীক্ষা-প্রদান কার্য্যও বন্ধ ছিল। কিন্তু তাহার পর হইতে চক্ষুতে ব্যাণ্ডেজ লইয়াই তিনি দীক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। দীক্ষা দান সাধারণতঃ পূর্ব্বাহ্নেই হইত, কদাচিৎ অপরাহ্নেও হইত। একদিন প্রাতে ৮॥।৯টা হইতে আরম্ভ করিয়া ১২।১২॥টা পর্য্যন্ত প্রায় ত্রিশ জন স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকার দীক্ষা হইয়াছিল। তৎকালে যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা বলেন যে, সে দিন দীক্ষার স্থান হইতে আসিবার কালে দেখিলাম যে, ঠাকুর রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছেন, এবং সেই মধ্যাহ্নে তিনি একটু ফলের রস ব্যতীত আর কিছুই আহার করিলেন না। দিনের পর দিন এইরূপ দীক্ষা চলিতে লাগিল। কোন ভক্ত হয়ত বিকালে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, এবং চাকরী বা সাংসারিক কর্ত্তব্যের অনুরোধে সেই দিনই সন্ধ্যার পর তাঁহার কলিকাতা ত্যাগ করা প্রয়োজন। করুণাময় ঠাকুর ফুলফল বা অন্য কোনরূপ আয়োজন বিনা তখনই তাঁহাকে দীক্ষা

প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিলেন। কোন স্ত্রীলোক হয়ত দূরদেশ হইতে আসিয়াছেন, শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন না করিলে চলে না, অন্য সময় আসাও তাঁহার পক্ষে কষ্টকর, অথচ দীক্ষালাভের জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ ; ঠাকুরের ঘর হয়ত তখন ডাক্তারের আদেশে বন্ধ, দর্শনাদি প্রদানও নিষিদ্ধ ; দীক্ষার্থিনীর আগ্রহে ঠাকুরকে তাঁহার কথা একবার জানান হইল, 'জীবকল্যাণৈকদীক্ষ' ঠাকুর ডাক্তারের নিষেধ অবমাননা করিয়াও উঠিয়া বসিয়া দীক্ষার্থিনীর অভীষ্ট পূরণ করিয়া তাঁহাকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ দিলেন। এই ভাবে ঠাকুর কল্পতরু হইয়া কৃপা বিতরণ করিতে লাগিলেন, এবং আধ্যাত্মিক-কল্যাণ-পিপাসু নরনারীর প্রাণে স্বীয় সাধনলব্ধ আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিয়া তাঁহাদের মানবজন্মকে সম্যক্ সফলতার দিকে চালিত করিলেন।

বাবাজী শিষ্যদিগকে প্রচলিত ধর্ম্মের অনুশাসন মানিয়া চলিতে শিক্ষা দিতেন এবং তদুদ্দেশ্যে নিজেও তাহাতে যোগদান করিতেন, ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার কলিকাতায় অবস্থান কালে তাঁহারই নির্দ্দেশ অনুসারে কালীঘাটে কালীমাতাকে একটি বিশেষ পূজা দেওয়া হইয়াছিল, এবং তদুপলক্ষে সায়াহ্নে একটি বিশেষ ভোজের আয়োজন করা হইয়াছিল। বাবাজী অসুস্থতা-নিবন্ধন কালীঘাটে গমন করিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি পূজার দিন মধ্যাহ্নে অন্ন বা রুটী আহার করিলেন না, রাত্রিতে ভোজন করিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের অনেক শিষ্য এবং তদ্ব্যতীত অনেক ভক্ত এই পূজায় ও ভোজে যোগদান করিয়াছিলেন।

সেবার উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিনে গঙ্গাসাগর-স্নানের বিশেষ যোগ ছিল। সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন বাবাজী শিষ্যগণকে বলিলেন যে, তোমরা সকলে কাল সকালে গঙ্গাস্নান করিবে, এবং আমার জন্যও কিছু গঙ্গোদক আনিবে। তদনুসারে শিষ্যগণ সকলেই শেষরাত্রে গাত্রোত্থান করিয়া মহোল্লাসে গঙ্গাস্নান করিতে যাত্রা করিলেন। স্নানান্তে গঙ্গোদক লইয়া তাঁহারা আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলে, বাবাজী স্বীয় আসন হইতে নামিয়া আসিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক ধৌত বস্ত্র পরিধান করিলেন ও গঙ্গোদক মস্তকে ধারণ করিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি সেদিন বড়ই প্রসন্ন ও জ্যোতি-র্মণ্ডিত দেখা গেল। শিষ্য ও ভক্তগণ আনন্দে ভরপুর হইয়া সেই আনন্দময় মূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। তৎপর পৌষ-পার্ব্বণের-উৎসবের আয়োজন হইতে লাগিল। সেই পর্ব্বদিনে আশ্রমে আহারাদির কিরূপ ব্যবস্থা হইবে, বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করা হইলে, তিনি বাঙ্গালা দেশের প্রচলিত নিয়ম জানিতে চাহিলেন। শিষ্যগণ বলিলেন যে বাঙ্গালা দেশে পৌষ পার্ব্বণে পিষ্টকাদি প্রস্তুত হইবার নিয়ম। গোরক্ষপুরে এই দিনে খিচুড়ীর বন্দোবস্ত হয়। তখন বাবাজী উভয় নিয়মই অনুসরণ করিতে আদেশ দিলেন। শিষ্যগণ মহোল্লাসে আদেশানুযায়ী ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আনন্দের তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। উৎসব ও প্রসাদ বিতরণ যথাবিধি সুচারুরূপে সম্পাদিত হইল।

যত ভক্ত বাবাজীকে দর্শন করিতে আসিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সাধুদর্শনের রীতি অনুসারে কিছু ফল বা মিষ্টদ্রব্য

প্রভৃতি লইয়া আসিতেন। সেই সব ফল ও মিষ্টাদি সমাগত ভক্তদের মধ্যেই বিতরিত হইত। আশ্রমের রীতি অনুসারে, যত লোক সেখানে আসিতেন, সকলকেই কিছু প্রসাদ দেওয়া হইত। প্রসাদ না পাইয়া কাহারও যাইবার নিয়ম ছিল না। তদ্ভিন্ন দূরাগত কত ভক্ত যে আশ্রমে আহারাদি করিতেন, তাহার কোন হিসাবই ছিল না। কিন্তু বাবাজীর ব্যবস্থায় সকল ব্যাপারই সহজে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া যাইত, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

বাবাজীর কলিকাতায় অবস্থান কালে তাঁহার জনৈক শিষ্য একটি অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তাহার উল্লেখ পূর্ব্বক এই অধ্যায় শেষ করা যাইতেছে। শিষ্যটীর মুখে ব্যাপারটী যেমন শুনিয়াছি, তাহারই মর্ম্ম লিখিতেছি। সেই সময় 'পরদেহপ্রবেশী' উপাধিধারী একজন শক্তিশালী ব্যক্তি কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন। লোকের নিকট তাঁহার স্বীয় যোগশক্তি প্রখ্যাপন করার অভ্যাস ছিল। অনেক লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেন। বাবাজীর উক্ত শিষ্যটীও সাধুদর্শনের নিমিত্ত তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলেন। তিনি দর্শকবৃন্দের নিকট বলিতেন যে, গৃহে বসিয়াও কেহ তাঁহাকে মনে মনে স্মরণ করিয়া আহ্বান করিলে তিনি তাহার নিকট গিয়া উপস্থিত হন। উক্ত শিষ্যটীও তাহা শুনিয়াছিলেন। একদিন তিনি একাকী বসিয়া আছেন; কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি কিছুক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে পরদেহপ্রবেশীর চিন্তা করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই তিনি দেখিতে

পাইলেন যে, সেই মহাপুরুষ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। মহাপুরুষ তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করিতে চাহিলেন। ভদ্রলোকটী তাহাতে ভীত হইলেন। তিনি এক মহাপুরুষের শিষ্য হইয়া কেন অন্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবেন? কিন্তু এই মহাত্মাকেও বিনা প্রয়োজনে আহ্বান করা অন্যায় হইয়াছে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি বিমূঢ় হইলেন। পরদেহপ্রবেশী তাঁহাকে বুঝিতে দিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্বলব্ধ মন্ত্রের শক্তি নষ্ট করিয়া তিনি তাঁহাকে দীক্ষা দান করিবেন। এমন সময়ে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, পশ্চাৎ-দিক হইতে বাবাজীর জ্যোতিঃপূর্ণ মূর্ত্তি পরদেহপ্রবেশীর দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে এবং সেই দৃষ্টি হইতে যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বিকির্ণ হইয়া পরদেহপ্রবেশীকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে। পরদেহপ্রবেশী সেই তেজে বিহ্বল হইয়া ভীত-চকিত ভাবে নমস্কার করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন, বাবাজীর মূর্ত্তিও অন্তর্হিত হইল। কৃপাসিন্ধু গুরুদেব তাঁহাকে একটি বিশেষ বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন, ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে ইহা চিন্তা করিতে করিতে শিষ্যটী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মহারা হইয়া রহিলেন। তৎপর শিষ্যটী স্বীয় অপরাধের জন্য অনুতপ্ত চিত্তে বাবাজীর নিকট গমন করিয়া অনেকক্ষণ মনে মনে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, এবং শেষে প্রকাশ্যে করযোড়ে ক্ষমাভিক্ষা করিলেন। বাবাজী তাঁহাকে আশ্বাস বাক্যে সান্ত্বনা করিলেন, কিন্তু উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না।

বাবাজী জানুয়ারী মাসের শেষভাগে কলিকাতা হইতে গোরক্ষপুর ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু হায়! তখন কে জানিত যে তাঁহার বাংলা দেশে আর ফিরিয়া আশা হইবে না! তখন কে বুঝিয়াছিল যে, তিনি বুঝি নশ্বর দেহ ত্যাগ করিবেন বলিয়াই বাংলা দেশে আসিয়া একেবারে কল্পতরু হইয়া বসিয়াছিলেন !!

হরিদ্বার কুম্ভে গমন
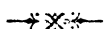
কলিকাতা হইতে গোরক্ষপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বাবাজী কিছুদিন সেখানে অবস্থান করেন। সেই বৎসরই চৈত্রমাসে হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ। বাবাজী কুম্ভমেলায় যোগদান করিবেন বলিয়া পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার যাত্রার দিনের পূর্ব্বে অনেক শিষ্য গোরক্ষপুরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের জন্য যথাসময়ে হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডের অনতিদূরে 'নাথজীর দলিচা'র সন্নিকটে একটি বাড়ী ভাড়া করা হইল। তিনি যাত্রার দিন ঠিক করিয়া শিষ্যগণ এবং অনেক সাধুসন্ন্যাসী সঙ্গে লইয়া হরিদ্বারাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কোন কোন শিষ্য সপরিবারেও গমন করিয়াছিলেন।

বাবাজীর সন্ন্যাসীশিষ্য পূজ্যপাদ শ্রীমৎ বাবা শান্তিনাথজী তখন তপশ্চর্য্যার জন্য হৃষীকেশে গুহানিবাসী হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, এবং দিবসরজনী অবিশ্রান্ত ভাবে অনন্যকর্ম্মা ও অনন্যচিন্ত হইয়া গুরূপদেশানুযায়ী সাধনভজনে নিরত ছিলেন। গুরুমহারাজ কুম্ভমেলায় আসিতেছেন জানিয়া তিনি হরিদ্বারে আসিয়া তাঁহার প্রতীক্ষায় রহিলেন। শেষরাত্রে গাড়ী হরিদ্বার ষ্টেশনে পৌঁছিলে শান্তিনাথজী আসিয়া বাবাজীকে সম্বর্দ্ধনা

করিলেন। বাবাজী ভাড়াটীয়া বাড়ীতে না উঠিয়া প্রথমেই নাথজীর দলিচায় গমন করিলেন। এই দলিচাই হরিদ্বারে নাথ-সম্প্রদায়ের আশ্রম। এখানে গোরক্ষনাথের মন্দির আছে, সাধুদের জন্য সাধন গুহা আছে, এবং নাথ-সম্প্রদায়ের সাধুমণ্ডলী এখানেই অবস্থান করিয়া থাকেন। দলিচার বিস্তৃত প্রাঙ্গণে নানাস্থান হইতে সমাগত সাম্প্রদায়িক সাধুগণ কম্বল বিছাইয়া ও ধুনী জ্বালাইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। সম্প্রদায়ের মোহান্তগণ অবশ্য এখানে এই ভিড়ের মধ্যে থাকিতেন না। তাঁহারা সাধারণতঃ ভাড়াটীয়া বাড়ীতে অথবা ধর্ম্মশালায় শিষ্যসেবকসহ আরাম ও আড়ম্বরের সহিত অবস্থান করিতেন, এবং সকালে বিকালে দলিচায় মন্দিরপূজা, সাম্প্রদায়িক 'দরবার' প্রভৃতি উপলক্ষে আসিতেন। কিন্তু নাথ-সম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্থান গোরক্ষপুরের গোরক্ষনাথ মন্দিরের অধ্যক্ষ এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বলিয়া স্বীকৃত, বাবা গম্ভীরনাথ বহু শিষ্য-সংবেষ্টিত হইয়া উপস্থিত হইলেও নিজে সম্প্রদায়ের ও সাম্প্রদায়িক আশ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবার জন্য দলিচায় গোলমাল ও অসুবিধা সত্ত্বেও সাধারণ সাধুদের মধ্যেই অবস্থান করিতে গমন করিলেন, তাঁহার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে তিনি গমন করিলেন না। শিষ্যগণ অনেকে সেই বাড়ীতে গেলেন, কতিপয় শিষ্য তাঁহার সেবার জন্য তাঁহার সঙ্গে রহিলেন।

তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া দলিচায় পদার্পণ করা মাত্র, উপস্থিত সাধুমণ্ডলী মন্ত্রচালিতবৎ এক সঙ্গে দণ্ডায়মান হইয়া

মহোল্লাস পূর্ব্বক তাঁহাকে এমন ভাবে সম্বর্দ্ধনা করিলেন যে, বহুদিনের বিচ্ছেদের পর তাঁহারা যেন তাঁহাদের স্নেহময় পিতাকে নিজেদের মধ্যে অপ্রত্যাশিত ভাবে লাভ করিয়াছেন। বাবাজী যে এখানে এই প্রকার গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে অবস্থান করিবেন, শিষ্যগণ সে জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহারা রাস্তার পরপারস্থ ভাড়াটীয়া বাড়ীতে একটী পরিষ্কার কক্ষে বাবাজীর আসন প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে নিতে আসিলেন। তাঁহার নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত করা মাত্র সমীপস্থ সাধুগণ অত্যন্ত আবদারের সহিত তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে শিষ্য-গণকে লক্ষ্য করিয়া একবাক্যে বলিতে লাগিলেন,—"না, মহারাজ আমাদের মধ্যেই থাকিবেন, ইনি যে আমাদের, ইত্যাদি।" তাঁহাদের বদন মণ্ডল, তাঁহাদের অন্তরের ভাব, এমনই জ্বল জ্বল করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে, শিষ্যগণও তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। বাবাজী তৎক্ষণাৎ সহাস্যবদনে তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"হাঁ হাঁ, আমি তোমাদের নিকটেই থাকিব।" আশ্রমস্থ ইষ্টকনির্ম্মিত কুটীরের এক পার্শ্বে তাঁহার আসন স্থাপিত হইল, এবং সেখানেই তিনি রহিয়া গেলেন। সেখানে সাধারণ সাধুদের জন্য ভাণ্ডারায় যাহা প্রস্তুত হইত, তিনিও তাহাই আহার করিতেন। মাঝে মঝে শিষ্যগণ তাঁহাদের আস্তানা হইতেও বিশেষ কোন কোন দ্রব্য পাক করিয়া ঠাকুরের ভোগের জন্য দিয়া আসিয়া কৃতার্থ হইতেন।

দলিচায় সমাগত সাধুমণ্ডলীর সেবা ও ভাণ্ডারার সমুচিত ব্যবস্থা করিবার জন্য, সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে একজন সাধুর উপর

ভার অর্পিত হইয়াছিল। তিনি বাবাজীকে পাইয়া অত্যন্ত স্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। বাবাজী সেখানে আসন গ্রহণ করা অবধি সেই ভারপ্রাপ্ত সাধু তাঁহার সকল প্রকার কর্ত্তব্যসম্বন্ধে বাবাজীর উপদেশ ও অনুমতি লইয়া কার্য্য করিতেন। এ সব বৈষয়িক ব্যাপারেও বাবাজীর যে অসাধারণ দক্ষতা ছিল, তাহার আভাস পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার একজন শিষ্য*— যিনি বহুদিন তাঁহার সঙ্গ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে,—"বাবা যদিও চিরকাল গুফায়ই কাটাইয়াছেন, তথাপি খাওয়া দেওয়া ব্যাপারে তিনি জিনিষের যেরূপ হিসাব ধরিয়া দিতেন, তাহাতে একদিনও জিনিষ কম হইত না। তিনি গোরক্ষপুরের কর্তৃত্বভার নেওয়ার পূর্ব্বে কখনও টাকা পয়সা ছুঁইতেন না, এবং কখনও কোন জিনিষ সঞ্চয় করিতেন না। কিন্তু আমাদের কাগজ কলম নিয়াও যে সব হিসাব করা ভয়ানক মুস্কিল হইত, তাহা তিনি মুখে মুখে এমন পট্ পট্ করিয়া হিসাব করিয়া দিতেন যে, আমরা দেখিয়া অবাক হইতাম।"

বাবাজী নিজেও এই কুম্ভমেলা উপলক্ষে অনেক টাকা খরচ করিয়াছিলেন। এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটি আশ্চর্য্য ব্যাপারের উল্লেখ করা যাইতেছে। বাবাজী যখন কলিকাতায় ছিলেন, তখন অনেক ভক্ত তাঁহাকে ফল ও মিষ্ট দ্রব্যাদির সহিত প্রণামী স্বরূপ টাকাও দিতেন। এ সব টাকা কার্য্যনির্ব্বাহক শিষ্যদের

* শ্রীযুত বরদাকান্ত বসু।

নিকট থাকিত, এবং ইহা হইতে তাৎকালীন ব্যয়ও নির্ব্বাহিত হইত। কিন্তু শিষ্যগণ ইহার পৃথক্ হিসাব রাখিতেন। এ বিষয়ের ভার প্রধানতঃ শ্রীযুত প্রসন্নকুমার ঘোষ মহাশয়ের উপর ছিল। কলিকাতার আশ্রম উঠাইয়া যখন গোরক্ষপুরে প্রত্যাগমন করা হইল, তখন আয়ব্যয়ের হিসাব করিয়া দেখা গেল যে, যত টাকা খরচ হইয়াছে, প্রণামী স্বরূপ আয়ও ঠিক তত্তই হইয়াছে, একআনাও বেশী কি কম হয় নাই। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া শিষ্যগণ বিস্ময়ে মগ্ন হইলেন। এই আয়-হইতে যে টাকা খরচ করা হইয়াছিল, উমেশ বাবু তাহা পূর্ণ করিয়া একটি থলিতে পূরিয়া সব টাকা বাবাজীকে অর্পণ করিলেন। বাবাজী বলিলেন যে এই টাকায় তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই, উহা তাঁহারাই গ্রহণ করুন। উমেশ বাবু অবশ্য তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন। তখন বাবাজী বলিলেন যে,—আচ্ছা, উহা রাখিয়া দেও, কুম্ভমেলার সময় খরচ হইবে। ইহাতে কিঞ্চিদধিক দেড় হাজার টাকা সঞ্চিত হইয়াছিল। কুম্ভমেলায় কতিপয় শিষ্য, ভক্ত ও সাধুর যাতায়াতের ব্যয় ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্ত টাকা সাধুসেবায় ও দীনদুঃখীদের সেবায় ব্যয়িত হইয়াছিল।

এখানেও তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মৌনভাবে সমাহিত অবস্থায় স্বীয় আসনে অবস্থান করিতেন। অসংখ্য গৃহী ও সন্ন্যাসী তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইয়া যাইতেন। সাধুগণ বলিতেন "মহারাজ সমাধি স্বরূপ, তাঁহার চক্ষু সর্ব্বদাই

সমাধিগর্ভে নিমগ্ন।" কিন্তু তিনি যখন অর্দ্ধবাহ্যাবস্থায় বসিয়া থাকিতেন, তখনও তাঁহার সৌজন্যের কোন ত্রুটী হইত না। নিতান্ত অল্প বয়স্ক মোহান্তগণও তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি এমন সম্ভ্রম ও সমাদরের সহিত তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতেন যে, তাঁহারা লজ্জা ও সঙ্কোচে অবনত হইয়া পড়িতেন। সাধু সন্ন্যাসী আসিলেই তিনি তাঁহাদের প্রতি সম্মান ও আদর দেখাইতেন। গৃহী ভক্তগণও তাঁহার স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে ও আদর আপ্যায়নে বিমুগ্ধ হইতেন। অথচ সব সময়েই বোধ হইত যে, তাঁহার চেতনার অতি অল্পাংশই বাহিরের সহিত যুক্ত, অধিকাংশই বিশ্বাতীত চৈতন্যস্বরূপের মধ্যে বিলীন হইয়া আছে। তাঁহার সৌজন্য, আদরাপ্যায়ন, বৈষয়িক উপদেশ, তত্ত্বোপদেশ, সবই যেন তাঁহার চেতনা-সমুদ্রের ঐ ক্ষুদ্রাংশ হইতে বুদ্‌বুদের মত, বিনা চেষ্টায়, বিনা চিন্তায়, বিনা মনঃসংযোগে, আপনা আপনি বাহিরে প্রকাশিত হইয়া আসিত। দর্শকগণ ব্রাহ্মীস্থিতির সহিত লৌকিক সৌজন্যের এরূপ অপূর্ব্ব-সমন্বয় দেখিয়া বিস্মিত ও বিমোহিত হইয়া যাইতেন। এ স্থানেও কতিপয় বাঙ্গালী ভক্ত তাঁহার নিকট ব্যাকুলভাবে কৃপাপ্রার্থী হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে যাঁহারা তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীভুক্ত হন, তাঁহাদের মধ্যে একজন যুবকসাধকের কথা একটু বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে করি। এই সাধকটী বাল্যকাল হইতেই বৈরাগ্যবান্ ও অধ্যাত্ম-নিষ্ঠ ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি যোগাভ্যাসে রত হন।

হঠযোগের অনুশীলন করিয়া তিনি অনেক পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ধৌতি, বস্তি, প্রভৃতি কতকগুলি যোগ-ক্রিয়ায় তিনি প্রায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। দূরদর্শন, ভবিষ্য-দ্দর্শন ও সূক্ষ্মদর্শনের শক্তিও কতক পরিমাণে লাভ হইয়াছিল। অধ্যাত্মনিষ্ঠা প্রবল থাকায় এ সব তিনি বহিরঙ্গ লোকের নিকট প্রকাশ করিতেন না। তথাপি তিনি যে স্থানে বাস করিতেন, তাহার নিকটবর্ত্তী অনেক লোকে তাঁহাকে একজন শক্তিমান্—'সিদ্ধাই-সম্পন্ন'—পুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। একদিকে তিনি যেমন যোগাভ্যাসী ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি তিনি সেবাকার্য্যেও অত্যন্ত দক্ষ ও আগ্রহান্বিত ছিলেন। রোগি-সেবা, আর্ত্তসেবা, ক্ষুধাতুরকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, দরিদ্র বিদ্যার্থীকে বিদ্যালাভে সাহায্য, প্রভৃতি নানাপ্রকার সেবাকার্য্যে তাঁহার উৎসাহ ছিল। তাঁহার তেজ এবং স্বাধীন-চিন্তাও অসাধারণ ছিল; কাহারও ভয়ে বা খাতিরে তিনি কপট ভাবে কথা বলিতেন না, অথবা নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেন না।

তিনি প্রথম অবস্থায় নিজ গৃহে থাকিয়াই যোগাভ্যাস ও লোক-সেবা করিতেন। অবশেষে নিজের বিষয় সম্পত্তি আত্মীয় স্বজনকে লিখিয়া দিয়া গৃহত্যাগ করেন। তিনি বদরিকাশ্রম, রামেশ্বর প্রভৃতি অনেক তীর্থ পরিভ্রমণ এবং অনেক সাধু ও মহাপুরুষের সঙ্গে কালক্ষেপন করিয়াছিলেন। তখন তিনি বাবা গম্ভীরনাথের নাম ও মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় গমন করিয়া সেখানে এক নিঃসহায় ব্যক্তিকে

পীড়িত দেখেন এবং সেবাপরায়ণ সাধক সেবাশুশ্রূষা দ্বারা কথঞ্চিৎ সুস্থ করিয়া তাহাকে কাশীধামে রাখিতে আসেন। বাবাজী তখনও হরিদ্বার যান নাই। কাশী হইতে গোরক্ষপুর গিয়া তিনি বাবাজীর সঙ্গগ্রহণ করেন; বাবাজীর আরও কয়েকজন শিষ্য ও বাবাজীর সহিত পুনরায় হরিদ্বার গমন করেন এবং সেখানে পৌঁছিয়া বাবাজীর শিষ্যগণের সর্ব্বপ্রকার সেবার ভার গ্রহণ করেন। তিনি নিজে বাজার করিতেন, তরকারী কাটিতেন, পাকের সর্ব্ব-প্রকার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন, পাচককে পাক শিখাইয়া দিতেন, দেখিয়া শুনিয়া তত্ত্বাবধান করিয়া সকলকে আহার করাইতেন, এবং সকলের আহারান্তে নিজে আহার করিতেন। কাহারও ব্যারাম হইলে তিনি প্রাণপণে সেবাশুশ্রূষা করিতেন। তাঁহার সেবা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

কুম্ভমেলা হইতে গোরক্ষপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি বাবাজীর সেবায় দেহ-মন-প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। তদবধি তিনি প্রায় কখনও বাবাজীর সঙ্গ ছাড়া হন নাই। বাবাজীর সমাগত শিষ্যগণের সেবাও তিনি অত্যন্ত প্রেমের সহিত করিতেন। বাবাজী স্বয়ং একদিন কোন উপলক্ষে একজন শিষ্যের নিকট বলিয়াছিলেন,—"যজ্ঞেশ্বর কৈসা প্রেম্‌সে সব্‌কোইকো সেবা কর্‌তা হ্যায়"! তাঁহার ব্যবহারে হিন্দুস্থানী সাধুগণও তাঁহার প্রতি অত্যন্ত প্রীত ছিলেন। রুক্ষ মেজাজের দরুণ কালীনাথ ব্রহ্মচারীর প্রতি তাঁহাদের যে বিদ্বেষ ভাব ছিল, ইঁহার প্রতি তাঁহাদের সেরূপ কোন মন্দভাব ছিল না। তিনি বাবাজীর সেবায় ব্রতী

হওয়ার পর হইতে ব্রহ্মচারীজীকে আর বিশেষ কিছু করিতে হইত না।

কিছুদিন সেবকভাবে অবস্থানের পর তিনি সাধনসম্বন্ধে বাবাজীর উপদেশপ্রার্থী হইলেন। বাবাজী তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করিয়া বেদান্তানুগত বিচারমার্গের উপদেশ করিলেন। বাবাজী তাঁহাকে বলিলেন,—'বিচারই রাজযোগ। হরদম বিচার করিতে পারিলে একজন্মেই মুক্ত হইতে পারিবে'। বাবাজীর উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া তিনি হঠযোগের ক্রিয়া পরিত্যাগ করিলেন, এবং গুরুসেবা ও বিচার সাধনে আত্মনিয়োগ করিলেন।

বাবাজীর তিরোধানের পর তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার ব্যবহৃত জিনিষপত্র কাশীধামে স্থানান্তরিত করিয়া সেখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলে, এই ত্যাগী ও যোগী সাধকই আশ্রমের সেবাপূজার ভার গ্রহণ করেন, এবং দেহত্যাগের সময়পর্য্যন্ত এই ভার বহন করেন। সেবাপূজায় তাঁহার উৎসাহ ও দক্ষতা দেখিলে অবাক্ হইতে হইত। শেষরাত্রে ৪টার সময় উঠিয়া সারাদিন ও রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত প্রায় অবিশ্রান্তভাবে তিনি সেবাকার্য্যে ব্রতী থাকিতেন। আশ্রমে অনেক সময় ভৃত্য থাকিত না। তিনি নিজে একাকী স্বহস্তে বাসনপত্র পরিষ্কার করিতেন, মন্দির ও তৎসংলগ্ন গৃহসমূহ ধৌত করিতেন, ধূপধূনা দিয়া আরতি করিতেন, বাজার হইতে পূজার ও ভোগের দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করিয়া আনিতেন, ভোগের জন্য অন্নব্যঞ্জনাদি পাক করিতেন, পূজার্চ্চনা ও ভোগ নিবেদন করিতেন, আশ্রমে

অতিথি উপস্থিত থাকিলে তাঁহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক ভোজন করাইতেন ও তাঁহাদের আরামের ব্যবস্থা করিতেন। এইরূপে দিনের পর দিন অতিবাহিত হইত। হঠযোগের প্রক্রিয়া হঠাৎ পরিত্যাগ করার দরুণই হউক, অথবা অন্য কোনও কারণেই হউক, শেষ কয়েক বৎসর তাঁহার শরীরটী ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই ব্যাধিপীড়িত অবস্থাতেও তিনি নিত্যনিরন্তর অদম্য উৎসাহে এই প্রকার সেবাকার্য্য পরিচালিত করিতেন। অনেক দিন ভোর ৪টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত খাটিয়া সামান্য এক মুষ্টি খই খাইয়া অথবা দুখানি বাতাসার সহিত কিঞ্চিৎ জল গ্রহণ করিয়া তিনি শয়ন করিতেন, এবং আবার শেষরাত্রি হইতে সেবায় ব্রতী হইতেন। কখন কখন দেখা গিয়াছে যে, রাত্রে তাঁহার ১০৩ ডিগ্রীর উপর জ্বর হইয়াছে, পরদিন কিভাবে সেবা চলিবে তাহা চিন্তা করিয়া অভ্যাগত গুরুভাইগণ একটু উদ্বিগ্ন হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা ভোরে নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া দেখেন যে তাঁহার বাসন মাজা, ঘর ধৌত করা, প্রভৃতি অনেক কাজ এর মধ্যেই শেষ হইয়া গিয়াছে এবং তিনি কৌপীন আটিয়া খালি গায়ে অদম্য তেজে কাজ করিয়া যাইতেছেন!

এসব সময়ে তাঁহাকে নিবিড়ভাবে আসনস্থ হইয়া সাধন করিতে প্রায়ই দেখা যাইত না। কিন্তু তাঁহার সহিত আধ্যাত্মিক বিষয়ে ঘনিষ্টভাবে আলাপ করিলে বুঝা যাইত যে, তাঁহার শাস্ত্রীয় জ্ঞান বেশী না থাকিলেও সাধ্যসাধন সম্বন্ধীয় জ্ঞান যথেষ্ট ছিল, এবং এমন অনেক কথা তাঁহার নিকট শোনা

যাইত, যাহা সাধনলব্ধ সূক্ষ্ম অনুভূতি ব্যতীত এরূপ পরিষ্কার ভাবে কাহারও হৃদয়ে প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ইনিই চিরকুমার, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, সেবাব্রতী সাধক যজ্ঞেশ্বর বসু। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর তারিখে ৺কাশীধামের আশ্রমে ইনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

বাবাজী শিষ্য ও ভক্তগণকে গঙ্গাস্নান করিতে উপদেশ দিতেন। তিনি হরিদ্বারে পৌঁছিয়াই ব্রহ্মকুণ্ডে গিয়া স্নান করিয়াছিলেন। কিন্তু বিষুব সংক্রান্তির দিন অত্যধিক ভিড়ের জন্য তিনি নিজে ঘাটে গিয়া স্নান করিতে পারেন নাই। সে দিন শিষ্যগণ গঙ্গা-স্নান করিলেন। বাবাজীর জন্য ঘড়ায় করিয়া গঙ্গা হইতে জল লইয়া আসা হইল, তিনি আশ্রমেই ঐ গঙ্গাজল দ্বারা স্নান করিলেন। সেই দিন যোগস্নানের সময় এত ভিড় হইয়াছিল যে, অনেক লোক ঠেলাঠেলিতে ঘাটের উপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তখন হরিদ্বারে কলেরারও প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। বাবাজীর শিষ্যগণ যেখানে ছিলেন, সেখানেও কলেরা আরম্ভ হইল। শ্রীযুত উমেশ বাবু সপরিবারে বাবাজীর সহিত গিয়াছিলেন। তাঁহার মুহুরীর একমাত্র পুত্র তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল। সেই ছেলেটি রোগাক্রান্ত হইল এবং অবস্থা এত নিরাশাব্যঞ্জক হইল যে, চিকিৎসকগণও তাহার মৃত্যু নিশ্চিত বলিয়া ত্যাগ করিয়া গেলেন। উমেশ বাবু অনন্যোপায় হইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল ভাবে বাবাজীর চরণোপান্তে পড়িয়া ছেলেটীর জীবন ভিক্ষা করেন। উমেশ বাবু আবদার করিতে লাগিলেন যে, ছেলেটীকে বাঁচাইতেই হইবে। তিনি

বলিয়াছেন যে, তাঁহার তখন মনে এমন ভাব হইতেছিল যে, তাঁহার নিজের স্ত্রী-পুত্রাদির মধ্যে কাহারও জীবনের বিনিময়েও যদি এই দরিদ্রের একমাত্র পুত্রের জীবন রক্ষিত হয়, তাহাতেও তিনি খুসী হইবেন। এই কথা মনে হওয়া মাত্র বাবাজী তাঁহার দিকে একটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং একটি হুঙ্কার করিলেন। উমেশ বাবু বলিয়াছেন যে ইহার অর্থ তখন তাঁহার নিকট এইরূপ মনে হইয়াছিল, 'হুঁ! তুমি এত বড় বীর হইয়াছ যে নিজজনের প্রাণের বিনিময়ে পরের ছেলের প্রাণরক্ষা করিতে প্রস্তুত!' ইহাতে তিনি একটু কম্পিত হইলেন, এবং নিজেকে অপরাধী বোধ করিলেন। তারপর অনেক কাতর প্রার্থনার ফলে বাবাজী চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন,—"হাঁ, বাঁচে গা"। উমেশ বাবু নিশ্চিন্ত হইয়া বাসায় গমন করিলেন। বালকটী পরদিনই সুস্থ হইল। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী রোগাক্রান্ত হইলেন। উমেশ বাবু ইহাতে আশঙ্কান্বিত হইলেন, এবং ইহা নিজ বেয়াদবীর শাস্তি বলিয়া তাঁহার মনে ধারণা হইল। যাহা হউক, ঠাকুরের কৃপায় তিনিও ক্রমে সুস্থ হইলেন। দুর্ব্বল অবস্থাতেই তাহাকে লইয়া উমেশ বাবু কলিকাতার দিকে রওনা হইলেন।

বাবাজী কয়েক জন শিষ্যকে তাঁহাদের সেবাশুশ্রূষার জন্য রাখিয়া তৎপূর্ব্বেই কতিপয় শিষ্য এবং সাধু সন্ন্যাসীদের সহিত গোরক্ষপুরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

—o—

ব্যাবহারিক জীবনের অবসান
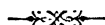
যোগিরাজ গম্ভীরনাথ হরিদ্বার কুম্ভমেলা হইতে গোরক্ষপুরে প্রত্যাগমন করিয়া দুই বৎসর কাল মাত্র স্থূলদেহে বিদ্যমান ছিলেন। এই দুই বৎসর প্রায় অনবরতই সেখানে বাঙ্গালী-ভদ্রলোকদিগের যাতায়াত হইত। অনেক লোক দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন, অনেকে কেবলমাত্র দর্শন ও প্রণাম করিবার নিমিত্ত গমন করিতেন। গৃহস্থ শিষ্যগণ বৎসরের অধিকাংশ সময় অর্থোপার্জ্জনে ও সাংসারিক কর্ত্তব্য-সম্পাদনে আবদ্ধ থাকিয়া দৈহিক ভাবে তাঁহার নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের চিত্ত তাঁহার স্নেহ ও প্রেমের আকর্ষণে তাঁহার চরণেই সংলগ্ন থাকিত এবং সাক্ষাৎ-ভাবে তাঁহার দর্শন স্পর্শনের জন্য সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত থাকিত। তাঁহারা অনেকে যখনই কর্ম্ম হইতে অবসর প্রাপ্ত হইতেন, তখনই তাঁহার নিকটে ছুটিয়া যাইতেন। কেহ কেহ এত ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন যে, কর্ম্মস্থলের নিয়মিত অবকাশের অপেক্ষায় থাকিতে পারিতেন না, কর্ম্মের মধ্যেই মাঝে মাঝে ছুটী লইয়া সেখানে গমন করিতেন। কেহ কেহ স্থায়ীভাবে সেখানে অবস্থানের অধিকার লাভ করিবার জন্য উপায় অন্বেষণ করিতেন।

এইরূপে সমস্ত বৎসর ব্যাপিয়াই গোরক্ষনাথ মন্দিরে শিষ্য ও ভক্তদের গমনাগমন হইতে থাকিত।

শারদীয় পূজার সময় বাঙ্গালীদের সকল প্রকার অফিস ছুটি থাকে। সেই সময় গোরক্ষনাথ মন্দির প্রায় সম্পূর্ণরূপেই বাঙ্গালীর আশ্রমে পরিণত হইত। তখন সেখানে এত ভিড় হইত যে, স্থানের সঙ্কুলান হওয়া কঠিন হইয়া উঠিত। স্ত্রীলোক-দের জন্য মন্দিরসংলগ্ন উদ্যানগৃহ নির্দ্দিষ্ট থাকিত; পুরুষগণ যিনি যেখানে একটুকু স্থান করিতে পারিতেন, সেখানেই রাত্রিতে কয়েক ঘণ্টার জন্য মাথা গুঁজিয়া থাকিতেন। সারা দিন-রাত্রি একটানা নিরাবিল আনন্দের হিল্লোল খেলিতে থাকিত। এই সকল নরনারীর যে এক একটা সংসার আছে ও সাংসারিক দায়িত্ব আছে, তাহা তখন তাঁহারা প্রায় ভুলিয়াই যাইতেন। সমস্ত চিন্তা ভাবনা, জ্বালা যন্ত্রণা, প্রথম প্রণামের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীগুরুর চরণে সমর্পণ করিয়া, তাঁহারা 'রাজার দুলালের' ন্যায় আনন্দ-স্রোতে ভাসিতে থাকিতেন। তাঁহাদের আহারাদি সমস্ত বিষয়ের ব্যবস্থা গুরুজীই করিতেন। সে সময়ের জন্য তাঁহারা একেবারে নিশ্চিন্ত।

তাৎকালীন অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মনে হইত যে, শিষ্যসন্তাপহারী গুরু গম্ভীরনাথ শিষ্যদিগকে কার্য্যতঃ বুঝাইয়া দিতেছেন যে, নিজেকে সর্ব্বদা গুরুগৃহে গুরুর সন্নিধানে অবস্থিত বোধ করিতে পারিলে, সারা জীবনই এইরূপ নিশ্চিন্ত থাকা যায়, জীবনের সকল বিভাগের সমস্ত দায়িত্ব 'শ্রীগুরবে নমঃ'

বলিয়া তাঁহার চরণে সমর্পণ পূর্ব্বক শিশুর মত আনন্দ হিল্লোলে নাচিতে নাচিতে সংসারবক্ষে বিচরণ করা যায়। বাস্তবিক ত সদ্‌গুরু সর্ব্বদা শিষ্যের নিকটেই থাকেন। স্থূলদেহে প্রত্যক্ষীভূত হওয়া বা না হওয়াতে তাঁহার উপস্থিতির ত কোন তারতম্য হয় না। গুরু যে শিষ্যের সকল প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, ইহাও ত মিথ্যা নয়; ধন জন গৃহ প্রভৃতি, এমন কি, স্বীয় দেহ পর্য্যন্ত, কিছুই যে নিজের নয়, ইহাও তত্ত্বতঃ সত্য কথা। কিন্তু তবু গুরুজীর দৈহিক সান্নিধ্যে শিষ্যগণ আপনাদিগকে যেরূপ হাল্‌কা বোধ করিতেন, যেরূপ সর্ববপ্রকার কুচিন্তা ও দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া আনন্দে ভাসিয়া বেড়াইতে পারিতেন, তিনি বস্তুতঃ সর্ববদা শিষ্যদের সমগ্র জীবনকে অধিকার করিয়া অতি নিকটে বর্ত্তমান থাকিলেও, কেবলমাত্র স্থূলদেহের নৈকট্যের অভাবে তাহা সম্ভব হয় না কেন?

মানবজীবনে অনুভূতির তারতম্যেই সকল প্রকার তারতম্য হয়; সকল প্রকার বৈচিত্র ও বৈষম্যের মূলে অনুভূতির বৈচিত্র ও বৈষম্য। অনুভূতি দ্বারাই মানবজীবন গঠিত এবং অনুভূতির বৈশিষ্ট্য অনুসারেই মানুষের কর্ম্ম ও ভোগের বৈশিষ্ট্য হয়। বস্তুতঃ একই প্রকার অবস্থা বিদ্যমান থাকিলেও, একপ্রকার অনুভূতির ফলে এক ব্যক্তি তাহাতে সুখ প্রাপ্ত হয়, অন্য প্রকার অনুভূতির ফলে অপর এক ব্যক্তি তাহাতে জ্বালা যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হয়। স্বীয় অনুভূতিকে তত্ত্বানুগত করাই মানুষের প্রধান সাধন। তত্ত্বতঃ যাহা সত্য, অনুভূতি তদ্রূপ হইলেই

মঙ্গল ও আনন্দ লাভ হয়, কারণ তত্ত্বতঃ সকলই যে মঙ্গলময় ও আনন্দময়ের সত্তারই অভিব্যক্তি।

তত্ত্বতঃ যাহা সত্য, তাহার প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ অনুভূতি যে পর্য্যন্ত না হয়, যে পর্য্যন্ত জ্ঞানদৃষ্টিতে তাহা দর্শন করা না যায়, সে পর্য্যন্ত বিশ্বাসদৃষ্টি ও বিচারদৃষ্টির সাহায্যে তাহা অনুভব গোচর করিতে চেষ্টা করা আবশ্যক এবং তদনুসারে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া জ্ঞানদৃষ্টিতে অনুভব করিবার যোগ্যতা লাভের জন্য প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। বাবা গম্ভীরনাথ তাঁহার উপদেশের মধ্যে এই দুইটী কথা অনেক সময়ই বলিতেন—'বিশ্বাস রাখ্‌না' এবং 'বিচার কর্‌না'। যে পর্য্যন্ত গুরুর দৈহিক সান্নিধ্যের অভাবেও তাঁহাকে ভিতরে বাহিরে সাক্ষাৎ অনুভব করিবার উপযুক্ত জ্ঞানদৃষ্টি প্রস্ফুরিত না হয়, যে পর্য্যন্ত গুরুর যথার্থ তাত্ত্বিক স্বরূপ হৃদয়ে পূর্ণভাবে প্রকাশিত না হয়, সে পর্য্যন্ত বিশ্বাসদৃষ্টিতে অনুভব করা উচিত যে, গুরু ঐহিক ও পারলৌকিক সকল ভার গ্রহণ করিয়াছেন, সংসারের সকলই তাঁহার, তিনি আমার জীবনের ও জগতের সকল স্থান ব্যাপিয়া স্বীয় মহিমায় বিরাজ করিতেছেন, আমি তাঁহারই শিশু এবং তাঁহার সহিতই আমার নিত্যসম্বন্ধ। বিচারদৃষ্টিতে দর্শনের অনুশীলন করিতে করিতে এবিষয়ে নিঃসংশয় হইয়া অহংকার ও মমতা বর্জ্জন পূর্ব্বক নিজকে সংসারবিমুক্ত ও তাঁহার সহিত নিত্যযুক্ত অনুভব করিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। এই বিশ্বাস ও বিচার যখন স্বভাবে পরিণত হইবে, জীবনের সকল বিভাগ

এইরূপ বিশ্বাস ও বিচারের অনুবর্ত্তী হইয়া পরিচালিত হইতে হইতে যখন সকল প্রকার কালিমা হইতে মুক্ত হইবে, তখন জ্ঞানদৃষ্টি সম্পূর্ণ উন্মীলিত হইবে, তখন গুরুর সহিত নিজের, কেবলমাত্র দূরত্ব নয়, কোনরূপ ভিন্নতাও অনুভূত হইবে না, তখন গুরু ব্রহ্মময় বলিয়া অনুভূত হইবে এবং শিষ্য অহংশূন্য ও গুরুময় হইয়া সৎস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। বাবাজী বলিতেন—'বিশ্বাস রাখ্ না'—'বিচার কর্ না'—'সব তরফ আচ্ছা হো যায়গা।' যে পর্য্যন্ত জ্ঞানদৃষ্টি উন্মীলিত না হয়, সে পর্য্যন্ত বিশ্বাসদৃষ্টি এবং বিচারদৃষ্টির সাহায্যেও যদি জীবনের সকল বিভাগে গুরুর সান্নিধ্য অনুভব করা যায়, তাহা হইলেও সংসারসমুদ্রে সেই নিশ্চিন্তভাব ও প্রেমের আনন্দতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে নাচিতে নাচিতে পরপারের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, গুরুজীর দৈহিক সামীপ্যের অভাবেও নিজকে অনাথ মনে হয় না, এবং অভিমানের ও স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া সংসারের কুচিন্তা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে হাবুডুবু খাইতে হয় না।

যাহা হউক, গুরুর প্রতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হইয়া ও গুরুভ্রাতাদিগের সহিত প্রেমের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া, গুরুর সংসারে, গুরুর সন্নিধানে, জীবন যাপন করাতে যে কিরূপ আনন্দ, এবং সে আনন্দ যে নিজের (অভিমানের) সংসারের সকল প্রকার ভোগের আনন্দ অপেক্ষা কত উচ্চ, কত প্রসারিত ও কত গভীর, সদ্গুরু গম্ভীরনাথ মাঝে মাঝে শিষ্যমণ্ডলীকে আকর্ষণ পূর্ব্বক নিজ

সকাশে একত্রিত করিয়া তাহা তাঁহাদিগকে অনুভব করাইয়া দিয়াছেন।

শারদীয় পূজার সময় গোরক্ষপুরে 'নবরাত্র' উৎসব হয়। তদুপলক্ষে রামলীলা প্রভৃতির অভিনয় হয়। অভিনেতৃগণ ও কীর্ত্তনকারিগণ গোরক্ষনাথ মন্দিরে আসিয়া অভিনয় ও কীর্ত্তন করিয়া থাকে। বাবাজী তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে শিষ্যমণ্ডলী-পরিবেষ্টিত হইয়া তাহা দর্শন ও শ্রবণ করিতে বসিতেন। এই সব ধর্ম্মবিষয়ক অভিনয় ও সঙ্গীত হিন্দুসমাজে বহুকাল হইতে জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, সমাজসম্বন্ধীয়, নীতিসম্বন্ধীয় জ্ঞান-বিস্তারের যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। যাত্রাভিনয়, কীর্ত্তন, রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদির পাঠ, কথকতা ও গান, প্রভৃতি লোকরঞ্জক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সমূহ শাস্ত্রাধ্যয়নে ও তত্ত্ববিচারে পরাঙ্মুখ ও অসমর্থ জনসাধারণের চিত্তকে আকর্ষণ করে, হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করে, এবং তৎসঙ্গে পুস্তকাদি পাঠের সাহায্য ব্যতীতও তাহাদিগকে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে শাস্ত্রসঙ্গত নানাপ্রকার শিক্ষাপ্রদান করে। এই ভাবেই শাস্ত্রের অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্ব, অনেক মহাপুরুষের সাধনলব্ধ জ্ঞান, সমাজের নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে; এই সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ফলে হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরে অসংখ্য নিরক্ষর লোক থাকিলেও সম্পূর্ণ অজ্ঞলোকের সংখ্যা অধিক নয়। সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের এরূপ সুকর উপায় আর নাই। বাবা গম্ভীরনাথ এই সকল অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া, অনুষ্ঠানকারীদিগকে উৎসাহ ও পুরস্কার

প্রদান করিয়া, তাঁহার সুশিক্ষিত শিষ্য ও ভক্তদের দৃষ্টি নিজের আচরণ দ্বারা সে দিকে আকর্ষণ করিয়া, সমাজের পক্ষে যে ইহারা কল্যাণকর, তাহা নির্দ্দেশ করিতেন।

দশহরার দিবস গোরক্ষমন্দিরের সংলগ্ন বিস্তৃত ময়দানে বিশেষ মেলা বসে। বহুদূরবর্ত্তী স্থান হইতে বহু লোক সেখানে আগমন করিয়া থাকে। সেখানেও রামলীলা প্রভৃতির অভিনয় হয়। বাবা গম্ভীরনাথ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক সদর রাস্তা দিয়া ঘুরিয়া সেই মেলায় গিয়া উপস্থিত হইতেন। যাইবার পথে তিনি দরিদ্র ভিক্ষুকদের মধ্যে পয়সা বিতরণ করিতে করিতে যাইতেন। সাধুগণ, শিষ্যগণ ও ভক্তগণ আনন্দোৎসব করিতে করিতে পদব্রজে তাঁহার সহিত গমন করিতেন। দীপালির রাত্রিতে মন্দির দীপমালায় সুসজ্জিত হয়; বাবাজী মাঝে মাঝে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই দীপসজ্জা দর্শন করিতেন। আশ্রমে মধ্যে মধ্যে সাধু ও ব্রাহ্মণদের বিশেষ ভোজনের ব্যবস্থা হইত। শিষ্যগণও মধ্যে মধ্যে ভাণ্ডারা দিতেন।

এইরূপে শিষ্যগণ গোরক্ষনাথ-মন্দিরে গুরুসন্নিধানে আনন্দোৎ-সবে সমগ্র পূজার ছুটী অতিবাহিত করিতেন। বাবাজী অধিকাংশ সময় নিজের স্বাভাবিক মৌনভাবে সমাহিত অবস্থায় স্বীয় আসনে অবস্থিত থাকিলেও, শিষ্য ও ভক্তগণের কতদূর আদরযত্ন করিতেন, তাঁহাদের আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিবার দিকে কতদূর দৃষ্টি রাখিতেন, ইহার পরে তাহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদত্ত হইবে।

শিবরাত্রির সময় বাবা গম্ভীরনাথ গোরক্ষপুরের নিকটবর্ত্তী, গোরক্ষনাথের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত, 'যোগী চৌক' নামক স্থানে গমন করিতেন। সেখানে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ প্রসিদ্ধ; এবং সেখানে একটি পুষ্করিণী আছে, তাহাতে স্নান করিলে কুষ্ঠাদি মহাব্যাধি হইতে মুক্ত হওয়া যায় বলিয়া প্রবাদ আছে। শিবরাত্রির সময় সেখানে মেলা হয় এবং নানাস্থান হইতে বহুলোক সেখানে গমন করে। তিরোধানের কিছুদিন পূর্ব্বে বাবাজী অসুস্থ অবস্থাতেও সেখানে গমন করিয়াছিলেন। সে সময় তিনি সেখানে তিনজন ভদ্রলোক এবং একজন ভদ্রমহিলাকে দীক্ষা প্রদান করেন এবং সেখানেই তাঁহার দীক্ষাপ্রদান ব্রতের পরিসমাপ্তি হয়।

গ্রীষ্মের দুইমাস বাবাজী গোরক্ষনাথের জমিদারীর অন্তর্গত কোন গ্রামে বাস করিতেন, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি সাধারণতঃ কোন শিষ্যকে সেখানে তাঁহার সঙ্গে যাইতে অনুমতি দিতেন না। দু' একজন বিশিষ্ট সেবক তাঁহার সঙ্গে থাকিত।

হরিদ্বার হইতে প্রত্যাগমনের পর যে দুই বৎসর মাত্র তিনি স্থূলশরীরে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার মধ্যে উপরোক্ত দুই স্থান ব্যতীত আর কোথাও গমন করেন নাই।

১৩২৩ বঙ্গাব্দের পৌষমাসে হঠাৎ একদিন বাবাজীর কম্প জ্বর হয়। হাঁপানি ও কফের কিছু উপদ্রব পূর্ব্ব হইতেই ছিল, এই সময় তাহারও প্রকোপ বর্দ্ধিত হয়। ডাক্তার শ্রীযুত কান্তিচন্দ্র সেন মহাশয় চিকিৎসা করেন, কিন্তু বিশেষ কোন উপকার দেখা গেল না। ৫।৬ দিন পরে তাঁহার শিষ্য

ডাক্তার (তৎকালে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র) শ্রীযুত রোহিণী কুমার বর্ম্মনের দুইমাত্রা ঔষধে সেবার তাঁহার ব্যারামের উপশম হয়। কিন্তু তদবধিই তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। শ্রীযুত বরদাকান্ত বসু ও যজ্ঞেশ্বর বসু কায়-মনপ্রাণে তাঁহার সেবা করিতে থাকেন। কালীনাথ ব্রহ্মচারীর পরে এই দুইজন ভক্ত বিশেষভাবে বাবাজীর সেবা করিবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনায় তিনি তদবধি ঘরেই মলমূত্র ত্যাগ করিতেন। প্রায় সেই সময় হইতে তিনি বহির্জ্জগতের সহিত সম্বন্ধ ক্রমশঃ কমাইয়া দেন। শরীর যত দুর্ব্বল হইতে লাগিল, তিনি ততই গভীর ভাবে ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন; শরীর যখন বাহির হইতে বেশী ক্লিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হইত, তিনি তখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সমাধিগর্ভে নিমগ্ন হইয়া ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করিতেন। শ্রীমৎ বাবা শান্তিনাথজী বলিয়াছেন যে, ক্রমশঃ বাবাজীর অন্তর্মুখীনতা ও বহির্জ্জগতের প্রতি ঔদাসীন্য এত বৃদ্ধি পাইতেছিল যে, তিনি শীঘ্রই বহির্জ্জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন বলিয়া আশঙ্কা হইয়াছিল। বাবাজীর শারীরিক অবস্থা দেখিয়া যখনই কেহ তৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, তখনই তিনি বলিতেন যে তিনি ভালই আছেন। তাঁহাকে রীতিমত ঔষধ সেবনের জন্য অনুরোধ করিলে, তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান না করিলেও, কখন কখন নিষ্প্রয়োজন বলিয়া উল্লেখ করিতেন। কিন্তু হায়! সেবকগণ তাঁহার এই ইঙ্গিত বুঝিতে পারিতেন না।

শিবরাত্রির সময় তিন দিনের জন্য বাবাজী 'যোগী চৌক' ঘুরিয়া আসিলেন। তাঁহার শরীর তখনও অত্যন্ত দুর্ব্বল। কিছুদিন পরে হঠাৎ তিনি একদিন বলিলেন যে তিনি শীঘ্রই মফঃস্বল যাইবেন। কিন্তু হায়! শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কাহারও মনে তখন এ প্রশ্ন উদিত হইল না যে, এই মফঃস্বল-শব্দের যথার্থ অর্থ কি, কোন্ মফঃস্বলে গমন করিবার জন্য তিনি এ ভাবে স্থূল শরীরের ক্ষয় সাধন করিতেছেন! কাহারও প্রাণে এ আশঙ্কার উদয় হইল না যে, যোগীশ্বর মহাপুরুষ তাঁহার ব্যবহার-ক্ষেত্র-রূপ সদরের লীলা শেষ করিয়া, চিরতরে সর্ব্ব ব্যবহারাতীত ব্রহ্মধামরূপ সম্যক্ প্রশান্ত সম্যগ্ গম্ভীর পরিপূর্ণানন্দনিলয় মফঃস্বলে আপনাকে বিলীন করিবার জন্যই এই উদ্যোগপর্ব্ব আরম্ভ করিয়াছেন। স্থূল দৃষ্টিতে তাঁহারা ধরিয়া লইলেন যে মঠাধ্যক্ষ গম্ভীরনাথ মঠের সম্পত্তির অন্তর্গত কোন গ্রামে গমন করিবার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছেন। অসুখের কথা উল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহারা আপত্তি উত্থাপন করিলে তিনি বলিলেন যে, গন্তব্য স্থানের নির্জ্জন প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যে ও পবিত্র জলবায়ুতে স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে ভাল হইবার সম্ভাবনা।

তাঁহার শিষ্যগণ আর একবার তাঁহাকে কলিকাতা আনয়ন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। অসংখ্য নরনারী তাঁহার চরণাশ্রয় লাভ করিবার জন্য সমুৎকণ্ঠিত ছিলেন। গোরক্ষপুর পর্য্যন্ত যাইবার সামর্থ্য ও সুবিধা অনেকের ছিল না। তিনি কলিকাতায় আসিলে তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইবেন, এই ভরসায় তাঁহারা উদ্গ্রীব হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন।

তাঁহারা মনে মনে তাঁহার কলিকাতা আগমনের জন্য প্রার্থনা এবং তাঁহার শিষ্যদিগকে তদ্বিষয়ে বন্দোবস্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন। প্রকাশ্যভাবে এই উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহাকে আনয়ন করিবার চেষ্টা করাই অসম্ভব। কিন্তু একটি সুযোগ উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে তাহার একটি চক্ষুতে অস্ত্র চিকিৎসা হইয়াছিল। অপর চক্ষুটিতে ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও, তখন তাহা অস্ত্রোপচারের উপযুক্ত হয় নাই। এখন তাহা অস্ত্রোপচারের যোগ্য হইয়াছে। তদুপলক্ষে পুনরায় কলিকাতা আসিবার জন্য বাবাজীর নিকট সাগ্রহ আবেদন করা হইতে লাগিল। শিষ্যদিগকে শান্ত করিবার জন্য তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তিনি বলিলেন যে, মফঃস্বল হইতে ফিরিয়া আসিলে কলিকাতায় যাওয়া হইতে পারে। মফঃস্বল যাইবার দিন-স্থির করিবার জন্য পঞ্জিকা দেখান হইল। ৮ই চৈত্র ২১শে মার্চ্চ বুধবার বারুণী ত্রয়োদশীতে যাত্রার দিন স্থির হইল। কিন্তু মায়ামুগ্ধ শিষ্য ও সেবকগণের কাহারও বুক এই যাত্রার দিনের কথা শুনিয়া তখন কাঁপিয়া উঠে নাই, কেহই ইহা তাঁহার মহাযাত্রার দিন বলিয়া কল্পনা করিতে পারেন নাই, কাহারও প্রাণ তাঁহার চিরবিচ্ছেদের আশঙ্কায় তখন হাহাকার করিয়া উঠে নাই। ধন্য মায়াময়ের মায়া!

৫ই চৈত্র রবিবার তাঁহার হাঁপানি ও কফের উপদ্রব কিছু বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থায় তিনি কিরূপে মফঃস্বলে যাইবেন, এইরূপ কাতর জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি কতক্ষণ মৌন

অবলম্বন করিয়া থাকিয়া বলিলেন যে, সেখানে ত বিপদের কোন কারণ নাই, সেখানে গেলেই স্বাস্থ্য ভাল হইয়া যাইবে। কিন্তু সে স্থান যে ভাল মন্দের অতীত চিরশান্তিধাম, তাহা স্পষ্টরূপে বলিলেন না।

তাঁহার অসুস্থতার সংবাদ শিষ্যগণকে জ্ঞাপন করিবার জন্য তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনি নিষেধ করিতেন। তাঁহার অসুখের সংবাদ শিষ্যগণ যথাসময়ে জানিতে পারিলে গোরক্ষনাথ মন্দিরে তাঁহাদের স্থান সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব হইত, ইহা সহজেই অনুমেয়। যাঁহাকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত আছেন, যিনি গোরক্ষনাথ মন্দিরে স্বীয় আসনে আত্মসমাহিত ভাবে অবস্থান করিয়াই তাঁহাদের ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্ব-প্রকার কল্যাণসাধন করিতেছেন জানিয়া তাঁহারা সকল রকম বিঘ্ন বিপত্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছেন, সেই নাথজী তাঁহাদিগকে অনাথ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, এ সংবাদ যদি যথাসময়ে তাঁহারা অবগত হইতে পারিতেন, তবে যে শিষ্য যেখানে যে অবস্থায় থাকিতেন, সেখান হইতে সেই অবস্থাতেই ছুটিয়া তাঁহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইতে চেষ্টিত হইতেন। তাঁহারা তাঁহার স্থূলশরীরের সহিতই যে বিশেষভাবে পরিচিত, তাঁহার সর্ব্বগত সচ্চিদানন্দ স্বরূপের সহিত ত তাঁহাদের বিশেষ পরিচয় সংস্থাপিত হয় নাই। তাঁহার স্থূলশরীরের অভাব হইলে যে তাঁহারা আপনাদিগকে অনাথ বোধ করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বাবাজী তাঁহার অন্তর্দ্ধানের সম্ভাবনা কাহাকে জানিতে

দিলেন না। তিনি এমন কতকগুলি ব্যবস্থা করিলেন যে, যাঁহারা তাঁহার চরণপ্রান্তে থাকিয়া তাঁহার শরীরের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের মনে পর্য্যন্ত কোনরূপ আশঙ্কার উদয় হইল না।

বাবা ব্রহ্মনাথ, ব্রহ্মচারী যজ্ঞেশ্বর ও শ্রীযুত বরদাকান্ত বসু তাঁহার সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। ব্রহ্মচারী যজ্ঞেশ্বরও তখন কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন। সে সময় সেবার কোনরূপ ত্রুটী না হয়, এইহেতু বাবা শান্তিনাথ ও বাবা নিবৃত্তিনাথকে তার করা হইল, বাবাজী ইহা অনুমোদন করিলেন। তাঁহারা তার পাইয়াই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বরদা বাবু চিঠিপত্রে বাবাজীর শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও অসুস্থতার কথা স্থানে স্থানে লিখিয়া জানাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে আশঙ্কার কোন কারণ আছে বলিয়া কেহই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

অকস্মাৎ ৭ই চৈত্র মঙ্গলবার বরদা বাবুর নিকট হইতে টেলিগ্রাম পাওয়া গেল যে, বাবাজী অত্যন্ত অসুস্থ। এই টেলিগ্রাম প্রাপ্তি মাত্র, যাঁহারা সুবিধা পাইলেন, তাঁহারা সেই দিনের গাড়ীতেই গোরক্ষপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন, অনেকে পরদিনের গাড়ী ধরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু গাড়ী ধরিবার পূর্ব্বেই আবার টেলিগ্রাম পাওয়া গেল যে, সব শেষ !! এইরূপ অকস্মাৎ বজ্রপাতে শিষ্যদের প্রাণে কি অবস্থা হইল, তাহার আভাস দিতে চেষ্টা করাও বাতুলতা মাত্র। ১৩২৩ বঙ্গাব্দের ৮ই চৈত্র (১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ্চ) বুধবার মধুকৃষ্ণা-ত্রয়োদশী তিথিতে মহাবারুণীর দিনে বেলা ১০ ঘটীকা

১৫ মিনিটের সময় যোগীরাজ বাবা গম্ভীরনাথের ব্যাবহারিক জীবনের অবসান হইল। তাঁহার তিরোধানের অব্যবহিত পরে (২৩শে মার্চ্চ, ১৯১৭ ইং) শ্রীযুত বরদাকান্ত বসু বিভিন্ন স্থানের গুরুভাইদের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা হইতেছে।

* * * * *

"—গত বুধবার ২১শে মার্চ্চ বেলা ১০ ঘটীকা ১৫ মিনিটের সময় আমাদের হৃদয়রাজ পরম দেবতা, আমাদের আশা ও শান্তির রাজ্যে আগুন লাগাইয়া, আমাদিগকে চিরজীবন তপ্ত ভোগ-সাগরে হাবুডুবু খাইতে ফেলিয়া, অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। এত হঠাৎ পূর্ব্বে কোন আভাস না দিয়া যে আমাদিগকে অনাথ করিয়া চলিয়া যাইবেন, তাহা স্বপ্নেও কল্পনা করি নাই। এমন কি বিজয়ার (তিরোধানের) পূর্ব্বদিবসও তাঁহার ব্যবহারে ইহার লক্ষণ আমাদিগকে জানিতে দেন নাই। এমন অবসর দিলেন না, যাহাতে সমস্ত ভাইদিগকে তাঁহার চরণপ্রান্তে ডাকিয়া আনিয়া, সমগ্র হৃদয় গুলি তাঁহার চরণতলে এক সঙ্গে উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইতে পারিতাম।

* * * * *

প্রাতে ৪টার সময় অভ্যাস মত বাবা উঠিয়া বিছানায় বসিয়া-ছিলেন; * * * শেষ সময় পর্য্যন্ত তিনি একাসনে ধ্যানস্থ অবস্থায় উপবিষ্ট ছিলেন, কোন কথাই বলেন নাই।

তাঁহার পবিত্র দেহ যথাবিধি আশ্রমে প্রবেশ করিবার পথের বাম পার্শ্বে সমাহিত করা হইয়াছে।" * * *

বাবাজীর বাঙ্গালী শিষ্যগণের সমবেত চেষ্টায় এই সমাধি-স্থানের উপর একটি সুরম্য প্রস্তর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৩২৯ বঙ্গাব্দে ১১ই আশ্বিন শ্রীশ্রীমহাষ্টমী তিথিতে শিষ্যগণ সম্মিলিত হইয়া প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া এবং শোকে ও আনন্দে আত্মহারা হইয়া শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব উদ্‌যাপিত করেন। সমাধি-আসনে প্রত্যহ রীতিমত সেবা পূজা হইয়া থাকে।

—— o ——
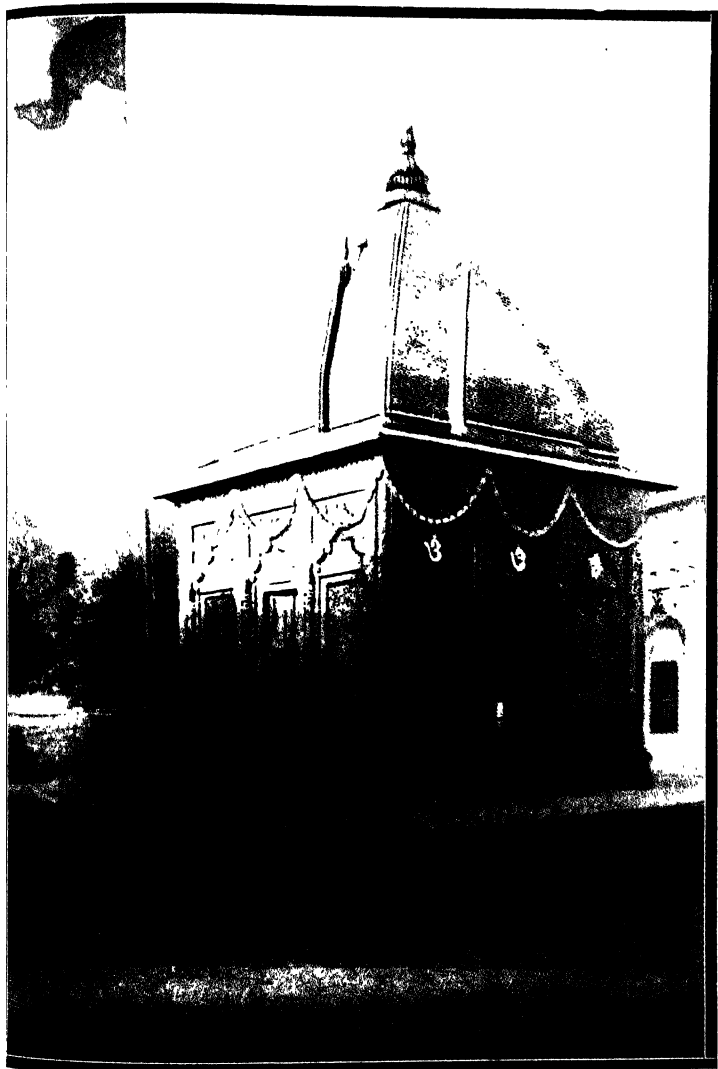
সমাধি মন্দির

ভক্ত বাৎসল্য ও জীবপ্রেম

বাবা গম্ভীরনাথের ভক্তবাৎসল্য সম্বন্ধে তাঁহার একজন শিষ্য* লিখিয়াছেন,—"যাহারা তাঁহার নিকট আসিত, তাহারা আসিয়াই অনুভব করিত, যেন গোরক্ষপুর তাহাদের চিরপরিচিত স্থান, এবং বাবাজীর সহিত তাহাদের কতদিনের পরিচয়। প্রবাস-প্রত্যাগত সন্তানকে পিতামাতা যেমন ভাবে আদরযত্ন করেন, চিরপুরাতন আপনার জিনিষকে নূতন করিয়া পাইলে স্বভাবতঃ যেরূপ ব্যবহার লোকে করিয়া থাকে, বাবাজী তাঁহার শিষ্যগণের সহিত সেইরূপ চিরপরিচিত স্নেহ-পরিপূর্ণ সুহৃদের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। প্রায়শঃ দেখা যাইত, কোন ভক্ত আসিবার পূর্ব্বেই তাহার আহারাদির ব্যবস্থা হইয়া থাকিত। এই সব ব্যাপার এমন ভাবে ঘটিত যে বিশেষ অনুসন্ধিৎসুর চক্ষু ব্যতিরেকে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত না! তাঁহার ব্যবহারে জননীর কোমলতা এবং পিতার উদারতা ও সহৃদয়তার একত্র সমাবেশ লক্ষিত হইত। তাঁহার ব্যবহার যে কেমন, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই, তাহার তুলনা নাই। অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ পিতা মাতৃহীন সন্তানের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহা কতকটা তাহার অনুরূপ। তাঁহার শান্ত-স্নিগ্ধ সস্নেহ দৃষ্টি, মৃদু মধুর সম্ভাষণ, যে দেখিয়াছে ও

---

* কুচবিহার কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য।

শুনিয়াছে, সেই বুঝিতে পারিয়াছে, তাহার মধ্যে কত স্নেহ, কত করুণা, কত শুভাকাঙ্ক্ষা, কত ক্ষমা, কত সহিষ্ণুতা। পিতামাতার আদর হইতেও তাঁহার আদর কত মধুর, কত উচ্চস্তরের, তাহা যে তাঁহার আদর লাভ করিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে। পিতামাতা আদর যত্ন করেন বটে, তাতে প্রাণের অভাব নাই, মায়ামমতার অভাব নাই, কিন্তু পিতামাতা যে শিশুর মতই অসহায়। আমাদের দৈহিক কিংবা মানসিক দুঃখ উপস্থিত হইলে পিতামাতা তাহার উপশমার্থ কি করিতে পারেন? যুক্তকরে ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। কাজেই তাঁহাদের আদর যত্নের ভিতরে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার তীব্র তাপ সর্ব্বদাই লক্ষিত হয়, তাঁহাদের অক্ষমতার পরিচয় প্রতিপদে পাওয়া যায়। কিন্তু বাবাজীর ব্যবহারে কোন উৎকণ্ঠার আভাস কদাপি পাওয়া যাইত না। তিনি সব জানিতেন, সব বুঝিতেন, সব করিতে পারিতেন, কাজেই তাঁহার ব্যবহারের ভিতরে কোন উৎকণ্ঠার চিহ্ন ছিল না, কোনরূপ অমঙ্গলের আশঙ্কা ছিল না। তিনি যে শুভাশুভের পরপারে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাই তাঁহার ব্যবহার অচঞ্চল, স্থির, স্নিগ্ধ, মধুর ও করুণ ছিল। তাঁহার মুখে চিরপ্রসন্নতা বিরাজ করিত। কাজেই তাঁহার স্নেহধারা পিতামাতার স্নেহধারা হইতেও অধিকতর প্রীতি-প্রদ ছিল। তাঁহার নিকটে আমরা যখন থাকিতাম, তখন আমরা নির্ভীক ভাবে বিচরণ করিতাম। তাঁহার সান্নিধ্য আমাদিগকে সকল প্রকার ভয়ভাবনা ভুলাইয়া দিত। তাঁহার স্নেহধারা আমাদিগকে নিরাবিল আনন্দের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিত।"

বাবাজীর এই বাৎসল্যের নিদর্শন স্বরূপ দু' চারটী মাত্র ঘটনা যদি উল্লেখ করা যায়, তাহা কাহাকেও পরিতৃপ্তির আনন্দ দিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার ব্যাবহারিক জীবনের কোন ঘটনাই খুব বড় রকমের, জাঁকাল রকমের ঘটনা নয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারের ভিতর দিয়াই তাঁহার লৌকিক জীবনে প্রেমমাখা ভাব-সমূহ প্রকাশ পাইত। ঘটনাগুলি বাহিরে যেমন দেখা গিয়াছে, ঠিক তেমনি ভাবে তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিলে, মহাপুরুষ-চরিত্র সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বাহির্মুখ লোকদিগের নিকট সেই সব ঘটনার অন্তঃস্বরূপ কিছুমাত্র প্রকাশিত হইবে না, অথবা সেই সব ঘটনার মধ্যে যে দিকটা অকিঞ্চিৎকর, সেই ঐশ্বর্য্যের দিকটাই প্রধান বলিয়া প্রতীত হইবে; সুতরাং তাহাদের নিকট এই বর্ণনা প্রায় অর্থহীন হইবে। অন্যদিকে, যাঁহারা মহাপুরুষচরিত্র প্রত্যক্ষ ভাবে সূক্ষ্মদৃষ্টিতে পরিদর্শন ও পর্য্যালোচনা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা এই প্রকার সামান্য ঘটনার ভিতর দিয়া অতলস্পর্শী প্রাণসমুদ্রের যে মধুরিমার পরিচয় স্ব স্ব হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়াছেন, ভাষার বর্ণনার মধ্যে তাহা পরিস্ফুট দেখিতে না পাইয়া এই বর্ণনাকে নিতান্ত শুষ্ক ও ভাসা ভাসা বোধ করিয়া ক্ষুণ্ণ হইবেন। বাস্তবিকই, "তাঁহার ব্যবহার যে কেমন, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই।" সাধারণ মনুষ্যের অগভীর হৃদয়ের ভাবসমূহও ভাষায় সম্যক্ রূপে প্রকাশ করা সম্ভব নয়, যদিও তাহার অধিকাংশই দেহেন্দ্রিয়ের ব্যাপারের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়। কিন্তু যে মানুষটী অসাধারণ, যাঁহার হৃদয়-সমুদ্রের গভীরতা ও

বিস্তারের কোন ইয়ত্তা পাওয়া যায় না, যাঁহার চেতনার প্রায় পনর আনা নিত্যনিরন্তর বিশ্বাতীত চৈতন্যস্বরূপের মধ্যে বিলীন এবং বাকী এক আনা মাত্র লৌকিক জীবনের কার্য্য পরিচালনে নিয়োজিত বলিয়া বোধ হয়, সেই মানুষটীর হৃদয়ের ভাব তাঁহার বাহিরের কার্য্য বর্ণন দ্বারা প্রকাশ করিবার কল্পনাও বাতুলতা।

ভাষা যেখানে বাস্তবকে প্রকাশ করিতে পারে না, অথবা বাস্তব সম্বন্ধে একটা যথার্থ ধারণা উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না, সেখানে ভাষার পক্ষে নীরবতা অবলম্বন করাই সমীচীন, সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন এই মহাপুরুষের জীবন আলোচনা করিবার জন্য এই গ্রন্থ আরম্ভ করা হইয়াছে, তখনই এই সমীচীনতাকে অতিক্রম করা হইয়াছে। এই অপরাধ সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া লইয়াই ইহাতে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য তাঁহার জীবন বর্ণন করা নয়, তৎসম্বন্ধে সামান্য কিছু ইঙ্গিত দেওয়া মাত্র। যাঁহারা মহাপুরুষ-জীবন দেখিবার ও আলোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা এই জীবনহীন ইঙ্গিত অনুধাবন করিয়া তাহার অন্তরালে যে জীবনটী আছে, তাহা কল্পনা ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টির সাহায্যে বুঝিয়া লইবেন। এই উদ্দেশ্যেই অন্যান্য ঘটনার ন্যায় শিষ্য ও ভক্তদের প্রতি তাঁহার বাৎসল্যের পরিচায়ক কয়েকটি মাত্র ঘটনা উল্লেখ করা হইতেছে।

সাধারণতঃ কোন ভক্ত আশ্রমে উপস্থিত হইলে, ভক্তবৎসল বাবা গম্ভীরনাথ স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় নেত্র উন্মীলিত করিয়া ও দৃষ্টিটী করুণামণ্ডিত করিয়া তাঁহার মুখের উপর স্থাপন পূর্ব্বক স্নেহার্দ্র

মৃদু মধুর স্বরে এমন ভাবে তাঁহার সম্বন্ধে দু' একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, যে ভক্তের হৃদয় সেই করুণা-ধারায় যেন স্নাত হইয়া যাইত এবং তাঁহাকে নিতান্ত আপনার জন বলিয়া বরণ করিয়া লইত। তৎপর তিনি তাঁহাকে 'আরাম কর' বলিয়া ক্লান্তি দূর করিবার জন্য আদেশ প্রদান পূর্ব্বক ব্রহ্মচারীর নিকট পাঠাইয়া দিতেন, এবং ব্রহ্মচারীকে তাঁহার সুখ সুবিধা সম্বন্ধে সকল প্রকার ব্যবস্থা করিতে আদেশ করিতেন। ব্রহ্মচারী বাবাজীর গৃহে আসিলে বাবাজী অর্দ্ধ বাহ্যাবস্থাতেই, ভক্তটীর ভোজন ও আরাম প্রভৃতির জন্য কিরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিতেন, এবং আর কিছু করণীয় থাকিলে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন। আশ্রম সংলগ্ন উদ্যান বাটীতে কাহারও শয়নের ব্যবস্থা হইলে, বিশেষতঃ তাহাদের মধ্যে স্ত্রীলোক থাকিলে, তিনি আশ্রমের আহারাদির পর হইতে সারারাত্রি পাহারা দিবার জন্য দু একজন প্রহরী নিযুক্ত করিতেন। কাহারও সঙ্গে শিশু সন্তান থাকিলে, তাহার দুগ্ধের বন্দোবস্ত হইয়াছে কিনা, অনুসন্ধান করিতেন, এবং কখন কখন আপনার পানীয় দুগ্ধ শিশুর জন্য প্রেরণ করিতেন।

যদিও বাবাজী প্রায় সর্ব্বদাই স্বীয় আসনে আত্মস্থ হইয়া অবস্থান করিতেন, তথাপি তাঁহার চাহনি, কথা ও বিধিব্যবস্থার ভিতর দিয়া তাঁহার হৃদয়ের বাৎসল্য ভাবটি এমন ভাবে প্রকটিত হইত, যে, ভক্তগণ যতদিন সেখানে থাকিতেন, সর্ব্বদাই তাঁহারা অনুভব করিতেন যে বাবাজীর সর্ব্বতোমুখী দৃষ্টি স্নেহে ও করুণায় অত্যন্ত কোমল হইয়া নিরন্তর তাঁহাদের স্বাচ্ছন্দ্য ও সন্তোষ

বিধানের জন্য তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছে। কয়েক জন নবাগত শিষ্যশিষ্যা হয়ত উদ্যানবাটীতে পাক করিবার সময় কাষ্ঠের অভাব বোধ করিতেছেন বা কাষ্ঠ ভিজা বলিয়া অসুবিধা বোধ করিতেছেন, হঠাৎ বাবাজীর আদেশে সেবকেরা উপযুক্ত পরিমাণ ভাল কাঠ তাঁহাদের নিকট আনয়ন করিলেন। কোন শিষ্যশিষ্যা হয়ত আশ্রম সংলগ্ন 'হাতীশালার' উপরের কোঠায় (অতিথিশালায়) ভাল ঘৃতের অভাব বোধ করিতেছেন, বাবাজীর নিকট হইতে উৎকৃষ্ট ঘৃত তাঁহাদের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। কোন মৎস্যাশী ভক্তের চিত্তে হয়ত রাত্রে আহারের সময় বা আহারান্তে মৎস্যাহারের আকাঙ্ক্ষা উদিত হইয়াছে, পরদিন মৎস্য আসিয়া উপনীত হইল। কাহারও হয়ত চা পান করিবার অভ্যাস আছে, অথচ তিনি লজ্জায় বলিতেছেন না, বাবাজীর নিকটে গেলেই তিনি তাহাকে বলিলেন—'জাও, চা পিলেও'। কোন কোন স্ত্রীলোক হয়ত বেশী গহনা পত্র লইয়া উদ্যানগৃহে অবস্থান করিতে শঙ্কা অনুভব করিতেছেন, এবং তজ্জন্য রাত্রে সুনিদ্রা হইতেছে না, পরদিন বাবাজী তাঁহাদের গহনার বাক্স তাঁহার গৃহে রাখিয়া দিতে বলিলেন। এই প্রকারে আশ্রমে অবস্থান কালে বাবাজী প্রত্যেক ভক্তের অভাব বুঝিয়া আপনা হইতে তাহা পূরণ করিতেন।

একদিন বাবাজীর ঘরে অনেক ভক্ত বসিয়া আছেন। বাবাজী তাঁহার স্বাভাবিক অর্দ্ধ বাহ্যাবস্থায় খাটের উপর উপবিষ্ট। হঠাৎ তিনি একটা ঘৃতের টিনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া এক সেবককে উহা রৌদ্রে রাখিতে আদেশ করিলেন, আদেশ

প্রতিপালিত হইল। তিনি আবার স্ব-ভাবে স্থিত হইলেন। সকলেই নীরবে তাঁহার সুপ্রসন্ন নিশ্চল মূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। ঘণ্টাখানেক পরে আবার হঠাৎ গৃহের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সুপ্তোত্থিতের ন্যায় তিনি একটি ভক্তকে নিকটে ডাকিয়া ঘৃতের টিনটি আনিতে বলিলেন এবং আর একটি পরিষ্কার পাত্র দেখাইয়া সেই পাত্রে টিন হইতে কতকটা ঘৃত ঢালিতে আদেশ করিলেন। আদেশানুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন হইলে তিনি বলিলেন—'উপর লে জাও'। বলিয়া তিনি আবার অন্তর্মুখ হইলেন। ভক্তটী তাঁহার স্ত্রী ও শিশু পুত্র লইয়া আশ্রমের হাতীশালার উপরে দোতালায় অবস্থান করিতেন, এবং একমাস ব্যাপিয়া প্রতিদিন নানাপ্রকার অন্নব্যঞ্জন পাক করিয়া বাবাজীর সেবা করিতেছিলেন। বাবাজী মাঝে মাঝে তাঁহাদিগকে খাদ্যোপকরণ পাঠাইতেন। উৎকৃষ্ট ঘৃত কিনিতে পাওয়া শক্ত। বাবাজীকে কেহ উৎকৃষ্ট ঘৃত উপহার দিয়াছিলেন। উক্ত-দম্পতি নানাপ্রকার ঘৃতপক্ক জিনিষ তৈয়ার করিতেন। তিনি তাঁহাদিগকে উৎকৃষ্ট ঘৃত পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহাদের সেবা গুরুজী কিরূপ আদরের সহিত গ্রহণ করিতেছেন, এবং তাঁহাদের সেবাব্রতে তিনি কিরূপ উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করিতে সমুৎসুক, আত্মস্থ মহাপুরুষের নিকট হইতে তদ্বিষয়ে এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিদর্শন মাঝে মাঝে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা আনন্দে মগ্ন হইতেন।

শ্রদ্ধা ভাজন শ্রীযুত প্রসন্নকুমার ঘোষ (তখন হবিগঞ্জ সরকারী স্কুলের শিক্ষক ছিলেন, এখন সহকারী ইন্‌স্পেক্টর) চাকরী হইতে

বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক কয়েকমাস বাবাজীর সঙ্গ ও সেবা করিবার উদ্দেশ্যে গোরক্ষপুরে অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্মৃতিলিপিতে লিখিয়াছেন যে, তিনি বাবাজীর যতটুকু সেবা করিতেন, বাবাজী যেন তাঁহার করুণা ও বাৎসল্য দ্বারা তদপেক্ষা তাঁহার অধিক সেবা করিতেন। তাঁহার আহার, শয়ন, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সকল বিষয়ের দিকে বাবাজীর সস্নেহ ও সযত্ন দৃষ্টি ছিল। স্নানান্তে বাবাজীর ঘরে গিয়া বসিলে তিনি তাঁহার অন্তর্মুখীন অবস্থাতেই আস্তে আস্তে খাটের নীচ হইতে লাড্ডু, বাতাসা বা যে কোন মিষ্ট দ্রব্য থাকিত, তাহা লইয়া নিজ হাতে তাঁহাকে প্রদান পূর্ব্বক বলিতেন—'জাও, পানি পিলেও'। আহারের উপযুক্ত সময়ে তাঁহাকে নিকটে দেখিলে প্রায়ই বাবাজী জিজ্ঞাসা করিতেন 'ভোজন পায়া'? রাত্রি ৮৷৯ টার সময় তাঁহাকে বসিয়া থাকিতে দেখিলে তিনি বলিতেন—'জাও, আরাম কর'। এ সব বিষয়ে বিভিন্ন ভক্তের প্রতি বাবাজীর ব্যবহারের মধ্যে অবশ্যই কোন বৈষম্য ছিল না। প্রায় সব ভক্তই এরূপ সুমধুর সস্নেহ ব্যবহার নিজ নিজ জীবনে লাভ করিয়াছেন, এবং অমূল্য সম্পদের ন্যায় তাহার স্মৃতি হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন।

প্রসন্ন বাবু গোরক্ষপুরে অবস্থান কালে কিছুদিন সেখানে ছাত্র পড়াইতেন। এক বড় লোকের বাড়ী হইতে তাঁহাকে গাড়ীতে নিয়া যাওয়া হইত ও গাড়ীতে আশ্রমে পৌছাইয়া দেওয়া হইত। ফিরিয়া আসিতে প্রায়ই তাঁহার রাত্রি হইত। একদিন সন্ধ্যার পর বাবাজী কয়েকজন ভক্ত ও সাধু দ্বারা পরিবৃত হইয়া বসিয়া

আছেন। হঠাৎ তিনি স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় যেন একটু উৎকণ্ঠার ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাষ্টার বাবু আয়া হৈঁ" ? তখনও তিনি আসেন নাই। কিছুক্ষণ পর আবার বাবাজী জিজ্ঞাসা করিলেন ; পরে তাঁহার সন্ধান করিবার জন্য লণ্ঠন সহ লোক প্রেরিত হইতেছিল, ঠিক এমন সময় প্রসন্ন বাবু আশ্রমে পৌঁছিলেন। সে রাত্রে আসিবার পথে ঘোড়া উত্তেজিত হইয়া গাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলে, কোচ্‌মান ও সহিস অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হয়, প্রসন্ন বাবুও অল্প আঘাত পাইয়াছিলেন। পরে একখানা একা করিয়া তিনি আশ্রমে আসেন। বাবাজী দূরবর্ত্তী শিষ্যেরও বিপদে আপদে কখন কখন প্রকাশ্যভাবে এইরূপ খোঁজ খবর করিতেন, ইহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

প্রসন্ন বাবু তৎপর কয়েকদিন জ্বরে ভুগিয়াছিলেন। বাবাজী রীতিমত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন ও সেবা শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিলেন। একজন পণ্ডিত কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন যে, বাবুর আরোগ্যার্থে মহাবীরের পূজা দিলে ভাল হয়। অমনি যোগিবর স্নেহময়ী জননীর ন্যায় সে কথার অনুমোদন করিলেন। মহাবীরজীর পূজা দেওয়া হইল, এবং ব্রাহ্মণকে চাউল ও পয়সা দান করা হইল। জ্বর বিরাম হইলে, যেদিন অন্ন পথ্য করিবার কথা, তাহার পূর্ব্বদিন বাবাজী ব্রহ্মচারীকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যে, পরদিন যেন মাষ্টার বাবুর জন্য সকাল সকাল ভাত এবং দধি-সংযুক্ত আলু ও ডালের বড়ার তরকারী পাক করিয়া দেওয়া হয়। তিনি পাকের প্রণালীও উপদেশ করিলেন, এবং সম্ভবতঃ

সকাল সকাল ভাল করিয়া পাক করিতে ব্রহ্মচারীর উৎসাহ পূর্ণমাত্রায় বর্দ্ধিত করিবার জন্য বলিলেন যে, 'হামভি পায়েঙ্গে।' প্রসন্ন বাবু বাঙ্গালী ভদ্রলোক। জ্বর বিরামের পর প্রথম অন্ন পথ্যের দিনই দধি সংযুক্ত তরকারীর ব্যবস্থা স্বভাবতঃই তাঁহার নিকট একটু অদ্ভুত বোধ হইল। রাত্রে তাঁহার মনে হইল যে বাড়ীতে থাকিলে প্রথমদিন কাঁচা মুগের ডাল ও ভাত খাওয়া হইত। যাহা হউক, বাবার কথাই শিরোধার্য্য। কিন্তু বাবা তাঁহার মনের কথাই গ্রহণ ও অনুমোদন করিলেন। পরদিন ভোরেই তিনি ব্রহ্মচারীকে ডাকিয়া তাঁহার পূর্ব্বদিনের আদেশ প্রত্যাহার পূর্ব্বক বলিলেন যে, আজ মাষ্টার বাবুর জন্য কাঁচা মুগের ডাল ও ভাত পাক করিয়া দেও, ডালের বড়ী ও দধির তরকারী বরং কাল হইবে। 'এই ডালের বড়ী তাঁহার শিষ্য শ্রীযুত হেমন্তবিহারী ঘোষাল প্রেম ও ভক্তির সহিত বাসা হইতে গুরুজীর ভোগের জন্য আনিয়াছিলেন, সুতরাং তাহার যথোচিত ব্যবহার দ্বারা শিষ্যের চিত্তে আনন্দ বর্দ্ধনের জন্যই উক্ত তরকারীর ব্যবস্থা।

হরিদ্বার কুম্ভমেলা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের কয়েকদিন পরে এক সময় বাবাজী নিজ গৃহে নিজ ভাবে উপবিষ্ট আছেন। কয়েকজন ভক্ত সম্মুখে বসিয়া আছেন। হঠাৎ তিনি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, উমেশের কোন সংবাদ পাইয়াছেন কিনা। তাঁহারা কোন সংবাদ পান নাই। বাবাজীর প্রশ্নে তাঁহাদের মনে হইল যে, উমেশ বাবু হয়ত কোন বিপদে পড়িয়াছেন। উমেশ বাবু

তখন হরিদ্বারে, সেখানে কলেরার প্রাদুর্ভাব, তাঁহার স্ত্রী কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হন নাই, নূতন কোন বিপদ হওয়াও আশ্চর্য্য নয়; সুতরাং একজন বলিলেন যে, উমেশ বাবুর নিকট টেলিগ্রাম করিয়া দেওয়া যাউক। তখন রাত্রি হইয়াছে। বাবাজীর অনুমতি চাহিলে, তিনি বলিলেন যে 'আচ্ছা, কাল দেখা যাবে'। পরদিন সকালে আবার বাবাজীকে টেলিগ্রামের কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, প্রয়োজন নাই। এ দিকে সেই দিনই উমেশ বাবু তাঁহার রুগ্না স্ত্রীকে লইয়া হরিদ্বার হইতে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। পথি মধ্যে জলের অভাব হওয়ায়, রুগ্না স্ত্রীর জন্য জল আনিতে উমেশ বাবু এক ষ্টেষণে নামিয়াছেন। জল লইয়া আসিতে আসিতে গাড়ী ষ্টেষণ ছাড়িয়া রওনা হইল। উমেশ বাবু দৌড়িয়া আসিয়া পশ্চাদ্দিকের এক গাড়ীর পা-দানীর উপর লাফাইয়া উঠিলেন, গাড়ীতে ঢুকিতে পারিলেন না। এক হাতে জলপূর্ণ ঘটী ও অন্য হাতে গাড়ীর হ্যাণ্ডেল ধরিয়া দ্রুতগামী মেল্‌ট্রেণের পাদানীর উপর দাঁড়াইয়া তাঁহাকে এক ষ্টেষণ হইতে অপর ষ্টেষণে যাইতে হইল। গাড়ীতে তাঁহার পরিবারবর্গ ব্যতিব্যস্ত হইয়া ঠাকুরকে ডাকিতে লাগিলেন। ঠাকুরও সেই সময়ই তাঁহার সম্বন্ধে খোঁজ খবর করিতেছিলেন। ভক্তগণ পরে উমেশ বাবুর চিঠি পাইয়া ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন এবং দূরস্থ শিষ্যের প্রতিও গুরুদেবের কিরূপ সকরুণ দৃষ্টি ও মাতৃবৎ বাৎসল্যের প্রকাশ, তাহা চিন্তা করিয়া বিমোহিত ও আনন্দিত হইলেন।

অনেক ভক্ত তাঁহার নিকটে গমন করিবার সময়, ভক্তি ও প্রেমের বশে তাঁহার সেবার জন্য নিজেদের কর্ম্মস্থান হইতে বিশেষ বিশেষ খাদ্যদ্রব্যাদি স্বগৃহে প্রস্তুত করিয়া বা বাজার হইতে ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেন। সেই সব দ্রব্যসামগ্রী নিতান্ত সামান্য ও মূল্যহীন হইলেও, তাহার সঙ্গে যে ভক্তি ও প্রেমের মসল্লা মাখা থাকিত, তাহার মূল্য সামান্য নহে। ভক্তবৎসল বাবা গম্ভীরনাথও তাহার সমুচিত মূল্য প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। সেই সব জিনিষ তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হইলে, ভক্তদের হৃদয়ে আনন্দবর্দ্ধনের নিমিত্ত, সেই বিষয়বিমুখ, আত্মারাম, আত্মক্রীড় যোগিরাজ অভিনিবেশ সহকারে সেই সব জিনিষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন, কখন কখন সেই সব জিনিষের সম্বন্ধে কৌতুহলব্যঞ্জক দু একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, যাঁহারা সে সকল আনিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি মাঝে মাঝে প্রসন্ন দৃষ্টি স্থাপন করিতেন, তাঁহার জন্য ঐসব জিনিষ কিছু কিছু রাখিয়া দিতে বলিতেন এবং অবশিষ্ট সকলের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে আদেশ করিতেন; কখন কখন ভক্তদের সম্মুখে তিনি নিজে ঐসব জিনিষ কিছু কিছু আহারও করিতেন। ইহাতে ভক্তগণের প্রাণে যে কিরূপ আনন্দের লহরী খেলিত, তাহা ভক্তের প্রাণ যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই নিজ নিজ প্রাণে অনুভব করিতে পারেন।

বাবাজীর জনৈক শিষ্য লিখিয়াছেন—'আমি গোরক্ষপুরে একদিন ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, বাবাজী কি ফল ভালবাসেন। (যদিও তাঁহার হেয় বা উপাদেয় কিছুই ছিল না,

তথাপি) ব্রহ্মচারী কিছু চিন্তা করিয়া বলিয়াছিলেন—সর্দ্দা। কলিকাতায় আসিয়া সুযোগ করিয়া একদিন বড়বাজার গিয়া সর্দ্দা কিনিয়া আনিলাম। বাবাজীকে দেওয়ার জন্য ব্রহ্মচারীর নিকট তাহা দিলাম। পরদিন উহা কাটিয়া দেওয়া গেল। বাবা যখন উহা গ্রহণ করেন, তখন ব্রহ্মচারী সেখানে ছিলেন। তিনি বলিলেন "উহা মাষ্টার বাবু আপনার জন্য আনিয়াছেন।" ঘটনা-ক্রমে আমি সেই ঘরে গিয়া উহা শুনিলাম। বাবা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এ তুমি আনিয়াছ ?" এবং তৎক্ষণাৎ আমার সম্মুখে কয়েক খণ্ড তাড়াতাড়ি শ্রীমুখে অর্পণ করিলেন। আমি বারান্দায় গিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিলাম। শরীর পুলকিত হইয়া গেল।'

কোন স্থানে হয়ত উৎকৃষ্ট চিপিটক পাওয়া যায়। তাহা তাঁহার জন্য কোন কোন ভক্ত লইয়া গেলেন। ভক্তগণ উৎকৃষ্ট দধির সহিত মিশ্রিত করিয়া উৎকৃষ্ট চিড়া আহার করা উত্তম খাদ্য বলিয়া জানেন। সেই খাদ্য বাবাজীকে দেওয়া হইল এবং তিনিও যেন তাহা বেশ স্বাদের সহিত আহার করিলেন। কোন কোন ভক্ত হয়ত নানাপ্রকার পিষ্টক নিয়া গেলেন, কোন কোন ভক্ত নানাপ্রকার আচার নিয়া গেলেন, কোন কোন ভক্ত ফল বা মিষ্ট দ্রব্য নিয়া গেলেন। সবই তিনি প্রীতি ও আদরের সহিত গ্রহণ এবং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভোজন করিয়া তাঁহাদের চিত্তে আনন্দ বর্দ্ধন পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ ও বাৎসল্যের পরিচয় দিতেন।

যোগিরাজ গম্ভীরনাথ দিবারাত্রির প্রায় সব সময়ই স্বীয় আসনে ধ্যানাবিষ্ট অবস্থায় বসিয়া থাকিলেও, আশ্রমের মধ্যে কোথায় কোন্ ভক্ত বা অতিথি কিভাবে অবস্থান করিতেছেন, কাহার কিরূপ সুবিধা বা অসুবিধা হইতেছে, কাহাকে কোন্ বস্তু দিলে বা কাহার সম্বন্ধে কি প্রকার ব্যবস্থা করিলে তাহার স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হইবে, সে সব বিষয়ের তত্ত্বাবধানে আশ্রমাধ্যক্ষের যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে তাঁহার কোনরূপ ত্রুটী লক্ষিত হইত না। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেও প্রসঙ্গক্রমে দু চারটি ব্যাপার উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্যাপারগুলি সবই ছোটখাট ; লৌকিক ব্যাপারের হিসাবে ইহাদের মূল্যও বেশী নয় ; কোন সাংসারিক 'বড়লোকের' কর্ম্মময় জীবন আলোচনার কালে এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা সাধারণতঃ উল্লেখযোগ্য বলিয়াই বিবেচিত হয় না ; কিন্তু এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারের মধ্যেই মানুষের প্রাণের যথার্থ পরিচয়টী পাওয়া যায়।

বিশেষতঃ যে সব মহাপুরুষ বস্তুতঃ সংসারের অতীত আধ্যাত্মিক রাজ্যেই নিত্য নিরন্তর বিহার করেন, সাংসারিক কোনরূপ 'বড় কাজের' সহিত যাঁহারা কখনও সংশ্লিষ্ট হন না, সাংসারিক জীবের প্রতি তাঁহাদের প্রাণের ভাবটি যে কি প্রকার, তাহার পরিচয় কোন প্রকার 'বড় কাজের' মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয় ; দু চারটি ছোট খাট কাজের বা কথার মধ্য দিয়া, একটু অর্থপূর্ণ দৃষ্টির ভিতর দিয়া, এই সব মহাপুরুষের স্নেহ ও প্রেমের পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে। বিশ্বাসী হৃদয়বান্ তত্ত্বানুসন্ধিৎসু বিচারশীল

ব্যক্তিগণই এই পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাহারা বহির্মুখ, যাহারা কর্ম্মের বাহ্যিক চেহারার ঔজ্জ্বল্য ও আড়ম্বরকেই বড় মনে করে এবং তাহা দেখিয়াই কর্ম্মের মূল্য নির্দ্ধারণ করে, তাহারা এসব মহাপুরুষের হৃদয়বত্তার পরিচয় প্রাপ্ত হয় না, এবং তাঁহারা যে সমাজের কতখানি কল্যাণ করিয়া থাকেন ও করিতে সমুৎসুক থাকেন, তাহা তাহারা কিছুই বুঝিতে পারে না। অনেক সময় মানুষের জীবন আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়া বহির্মুখ স্থূলদর্শী পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিগণ জীবনটীকে বাদ দিয়া বা পশ্চাতে ফেলিয়া কতগুলি বড় বড় ঘটনারই আলোচনা করিয়া থাকে। তাহারা বুঝিতে পারে না যে, এ ঘটনাগুলিই তাহার জীবন নয় এবং ইহারা অনন্যাপেক্ষভাবে একমাত্র তাহার জীবন হইতেই প্রসূত হয় না। যে ব্যক্তি দ্বারা বাহ্যতঃ যে সব ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, সে সকল যে সম্পূর্ণরূপে তাহারই কার্য্য, সেই ব্যক্তিই যে সে সকলের অন্য-নিরপেক্ষ কর্ত্তা, তাহা মনে করিলে ভুল বুঝা হইবে। সেই ব্যক্তির সহিত সংশ্লিষ্ট দেশ, কাল, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, উপকরণ, পদমর্য্যাদা, এবং আরও অনেক প্রকার শক্তি, সুবিধা ও অসুবিধা প্রভৃতি একত্র মিলিত হইয়াই বিশেষ বিশেষ কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত হয়। একই ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার অবস্থার মধ্যে পড়িয়া বিভিন্ন প্রকার কার্য্য করে, এবং একই কর্ম্ম বিভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়। এ সব বড় কাজের ভিতরে মানুষটী ও তাহার জীবনের যথার্থ স্বরূপটী

অনেক সময় চাপা পড়িয়া যায়। মানুষটীকে চেনা, তাহার জীবন বুঝা, বড় কাজ অপেক্ষা, যেসব কাজ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, সেই সব ছোট খাট আড়ম্বর বিহীন কাজের ভিতর দিয়াই সহজ ও যথার্থ হয়।

লোকোত্তর মহাপুরুষ বাবা গম্ভীরনাথের লৌকিক জীবনের প্রায় সব ব্যাপারই ছোট খাট আড়ম্বর বিহীন ছিল। কিন্তু যাঁহারা দেখিতে জানিতেন, তাঁহারা তাহার ভিতরেই তাঁহার হৃদয়ের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইতেন, জীবমাত্রের প্রতি, তন্মধ্যে মানুষের প্রতি, বিশেষতঃ ভক্তদের প্রতি, তাঁহার সহানুভূতি কত গভীর, তাহার নিদর্শন পাইতেন, তাহার ভিতরে অনেক দেখিবার, ভাবিবার ও শিখিবার জিনিষ পাইতেন। এ সব যাঁহারা বিশেষভাবে দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের চিত্ত তাঁহার প্রতি কেবলমাত্র সসম্ভ্রম ভক্তি শ্রদ্ধাতেই নত হইত না, তাঁহাকে নিতান্ত আপনার জন বলিয়া উপলব্ধি করিয়া নিঃসঙ্কোচে প্রাণের ভালবাসা অর্পণ করিত।

বাবাজীর একটি শিষ্য* তাঁহার স্মৃতিলিপিতে প্রসঙ্গক্রমে লিখিয়াছেন—"একা—রাস্তায় দাঁড়ান ছিল। আমি বাবাকে দেখা যাওয়া পর্য্যন্ত তাঁর দিকে মুখ করিয়া পিছনদিকে সরিতে সরিতে গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। যতক্ষণ দেখা গেল, ততক্ষণ তিনি মায়ের মত স্নেহসমুদ্র ঢালিয়া আমার চোখের উপরে চোখ রাখিয়া আমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। আহা! অমন প্রাণের

* শ্রীযুত বরদাকান্ত বসু।

জনকে ছাড়িয়া আবার কোন্ দেশে কতকালের জন্য যাইতে হইবে, ভাবিয়া বুকটা ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। সেই কথা মনে হইলে এখনও চোখে জল আসে। যখনই বাবার কাছ থেকে বিদায় নিতে হইয়াছে, তখনই এই অবস্থা। বাবার কাছ থেকে বিদায় নেওয়া অবধি আবার দিন গণা আরম্ভ হইত, কবে আবার বাবার সঙ্গে দেখা হইবে। সময়টাকে বড়ই নিষ্ঠুর বলিয়া মনে হইত। ....এইটী আমি সকল সময়েই প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যিনিই বাবার আশ্রয় নিয়াছেন, তাঁহারই বাবার প্রতি একটা অসাধারণ মনের টান হইয়াছে। বাবার চোখে কেহ কখনও এক ফোঁটা জল দেখেন নাই, তথাপি তাঁহার চোখে এমনই একটা শান্ত, মধুর, স্নেহসিক্ত ভাব বিরাজ করিত যে, যে কেহ তাঁহার কাছে আসিতেন, তিনিই হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব তৃপ্তি লইয়া যাইতেন। তাঁহার সন্তানদের যে কেহ যখন তাঁহার কাছ থেকে বিদায় নিতেন, তখনই তাঁদের দিকে এমন স্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন যে, তাঁহারা আকুল না হইয়া থাকিতে পারিতেন না ; মনে হইত যে, স্নেহ বাবার নয়নপথ দিয়া বাহির হইয়া, যতদুর দেখা যাইত, ততদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া, তাঁহাদিগের অনুগমন করিয়া, তাঁহাদিগকে প্লাবিত করিয়া দিত। আমি যতদূর জানি, তাতে বলিতে পারি যে, গুরু ভাইদের মধ্যে প্রায় সকলেরই বাবার শরণ নেওয়ার পর হইতে সংসারভাব অনেকটা শিথিল হইয়া গিয়াছে। ইহার মুলে বাবার স্নেহই কার্য্য করিত বলিয়া মনে হইত। শিষ্যদের

মধ্যে যাঁহারাই তাঁহার স্নেহ দৃষ্টিটী বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই আত্মহারা হইয়াছেন !'

এই শিষ্যটী তাঁহার অভিজ্ঞতার যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন এবং নিজের যে ভাবটীর বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত অসাধারণ অভিজ্ঞতা বা ভাবুকতা নয়, বাবাজীর অনেক শিষ্য ও ভক্তই এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, এবং তাঁহারা অনেকেই এটী তাঁহাদেরই প্রাণের কথা বলিয়া উপলব্ধি করিবেন। উপরোক্ত শিষ্যটী অনেকদিন বাবাজীর সঙ্গ ও সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বাবাজীর স্নেহ ও যত্নের দৃষ্টান্ত স্বরূপ অনেক সামান্য সামান্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কয়েকটী দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে।

"মহাত্মা রামদাস কাঠিয়া বাবার শিষ্য, স্বনামখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুত সারদা প্রসন্ন দাস মহাশয়, তাঁহার ছোট দুই ভাই (বরদা ও জ্ঞানদা) ও কন্যাকে বাবার কাছে দীক্ষিত করিবার জন্য গোরক্ষপুর আসিয়াছিলেন। দীক্ষার পরে বিদায় লইবার জন্য বরদাপ্রসন্ন ও জ্ঞানদাপ্রসন্ন বাবার ঘরে গিয়া বাবাকে প্রণাম করিয়া কাঁদিয়া আকুল। বরদা বাষ্পজড়িত কণ্ঠে বাবাকে বলিলেন 'বাবা, আমরা অনেক দূরে থাকি,—'এই বলিয়া আর বলিতে পারিলেন না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। বাবাকে তখন দেখিলাম যেন একটু বিচলিত হইতে, তিনিত স্নেহসাগর ছিলেন,—তিনি বরদার মুখের উপর পূর্ণদৃষ্টি নিহিত করিয়া স্নেহকোমল স্বরে বলিলেন 'যখনই যেখানে থাক, চিঠি পত্র দিও, তা চিঠিপত্র না

দিলেও সংবাদ জানা যায়।' বরদা বাবার এই ভাব ও উত্তরে আরও আকুল হইয়া পড়িলেন, বাবা বার বার 'হাঁ হাঁ' করিতে লাগিলেন। বাবা নামেও যা, কাজেও তাই ছিলেন, তিনি অতি অল্পভাষী ও মৃদুভাষী ছিলেন, এবং প্রত্যেকটী শব্দের পর যেন ৩।৪টী পূর্ণচ্ছেদ দিয়া কথা বলিতেন। তাই তিনি আশীর্ব্বাদের সময়ও শুধু একটি ছোট্টো গম্ভীর 'হাঁ' করিতেন, তাতেই লোকের মন ভিজিয়া যাইত। যে কেহ বাবাকে দেখিয়াছেন, তিনিই বলিয়াছেন, বাবার মতন অমন শীতল মূর্ত্তি কখনও দেখেন নাই। বাবার সবই শীতল ছিল,—আকৃতি শীতল, প্রকৃতি শীতল, ব্যবহার শীতল, দৃষ্টিতে ত সর্ব্বদাই মধু বর্ষণ হইত। এত বড় জমিদারীর ও আশ্রম সম্বন্ধীয় 'গৃহস্থালীর' কর্ত্তৃত্বভার স্কন্ধে বহন করিলেও, তাঁহাকে কখনও কাহারও উপর কোনরূপ কটুকথা প্রয়োগ করিতে শোনা যায় নাই।

"বাবা দিবসের অধিকাংশ সময় তাঁর সাদাসিদে উচু খাটটীতে বসিয়া থাকিলেও, আশ্রমের শৃঙ্খলা বিষয়ে কোন জায়গায় একটু ত্রুটী থাকিবার উপায় ছিল না। একদিন দুপুরবেলা ভাণ্ডারার সময় সকল সাধুরা গিয়া খাইয়া আসিয়াছেন। বাবা হঠাৎ আমাকে বলিলেন, 'বট গাছের নীচে কয়েকজন উদাসী সাধু আছেন, তাঁদের ভোজন হইয়াছে কিনা, দেখিয়া আইস।' আমার সেদিন স্কুল না থাকায় আমি প্রাতঃকাল হইতেই নিয়ত বাবার কাছেই ছিলাম, এই উদাসী সাধুদিগকে বাবার কাছে আসিতে দেখি নাই, অথবা কেহ বাবার কাছে এই খবরও

দেয় নাই। এদিকে উদাসীরা অল্পক্ষণ পূর্ব্বে বেলা ১১ টার সময় গোরক্ষনাথে আসিয়াছেন। আমি বাবার আদেশানুসারে বটগাছের নীচে গিয়া দেখি বাস্তবিক কয়েকজন উদাসী সাধু সেখানে আছেন। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, যথা সময়ে তাঁহারা ভাণ্ডারে গিয়া প্রসাদ পাইয়া আসিয়াছেন।

"আমাদের গুরুভাই শ্রীমান্ মোহিনী মোহন বর্ম্মন্ যখনই গোরক্ষপুরে আসিতেন, তখনই বাবার কাছ ছাড়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে চাহিতেন না। তিনি সদা সর্ব্বদা নীরবে বাবার সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন এবং ছায়ার ন্যায় বাবার সঙ্গে থাকিতেন। মোহিনীর স্বভাবটী এমনই শান্ত, মৃদু ও মধুর যে, কেহই তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না। বাবাও তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। মোহিনীর মুখে শুনিয়াছি, যে, একদিন বাবার আহারের পরে বাবা তাঁহাকে খাইতে যাইতে বলেন। খাওয়ার ঘর বাবার ঘরের সংলগ্ন। বাবার ঘরের পিছনের দরজা দিয়া খাওয়ার ঘরে যাওয়া যায়। মোহিনী এই রাস্তায় খাওয়ার ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। বাবা সেই দরজার দিকে পিছন দিয়া তখন শয়ন করিয়াছিলেন। মোহিনী অত্যন্ত লাজুক। তিনি যে পাচককে ডাকিয়া পরিবেশনের জন্য বলিবেন, তাহাতে তাঁহার সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। পাচকও তাঁহাকে লক্ষ্য করিল না। কতক সময় বসিয়া থাকার পর তাঁহার মনে হইল যে, এবার আস্তে আস্তে ফিরিয়া যাওয়া যাউক। তিনি তখন দেখিলেন যে, একজন সাধু মাঝের দরজা খুলিয়া তাড়াতাড়ি

তাঁহার সম্মুখ দিয়া পাকের ঘরে গিয়া পাচককে কিছু বলিলেন এবং আবার ফিরিয়া বাবার ঘরে গেলেন। মোহিনী তাঁহাকে ফিরিবার পথে জিজ্ঞাসা করাতে সাধু বলিলেন যে, আপনাকে পরিবেশন করিতে পাচককে বলিয়া দিবার জন্য মহারাজজী আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। পাচক তাড়াতাড়ি ভাত আনিয়া দিল। মোহিনী অবাক হইয়া বাবার স্নেহ স্মরণ করিতে করিতে আহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

"পূজ্যপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিষ্য, পরলোকগত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার পুত্র, শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি একদা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বাবাকে দর্শন করিবার জন্য গোরক্ষপুরে আসেন। বাবা তাঁহাকে আদরের সহিত গ্রহণ করেন। চিত্তবাবুর মাথায় কয়েকদিন তৈল পড়ে নাই, তিনি তৈলের অভাবটা বোধ করিতেছিলেন। আশ্চর্য্য! যথাসময়ে বাবা তাঁর জন্য ফুল তৈল পাঠাইয়া দিলেন। প্রাতে সময় ছিল না বলিয়া বৈকালে তাঁর জন্য মাছের বন্দোবস্ত করিলেন। চিত্তবাবু বলেন যে, তিনি বাবার স্নেহ ও আদর কখনো ভুলিতে পারিবেন না। বাবা কখন কি দরকার তাহা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে ত্রুটী করিতেন না।

"আমার দীক্ষার ২।১ বৎসর পূর্ব্বে আমার ভাগিনেয় শ্রীমান্ কোহিনূর ও তাহার সমবয়স্ক কয়েকটী ছেলে বাড়ী হইতে পলাইয়া নেপাল প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া গোরক্ষপুরে বাবাকে দর্শন করিবার জন্য আসে। কোহিনূরের তখন ভয়ানক

জ্বর হয়। বাবা তৎক্ষণাৎ চিকিৎসক ডাকাইয়া তাহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেন, এবং তাহার সেবার জন্য একটি চাকর নিযুক্ত করিয়া দেন। কোহিনূরের সঙ্গীদের যাওয়ার সময় বাবা কোহিনূরকে জ্বর নিয়া যাইতে দিলেন না। তাহার জ্বর সারিলে আহার পাথেয় দিয়া তাহাকে ময়মনসিংহে নিজের বাসায় পাঠাইয়া দেন। এই কোহিনূর কিন্তু বাবার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে নাই।

"গোরক্ষপুরের লব্ধ প্রতিষ্ঠ ডাক্তার শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র সেন মহাশয় বাবার শিষ্য ছিলেন না, কিন্তু অনুগত ভক্ত ছিলেন। তিনি বাবার চিকিৎসকও ছিলেন। কান্তি বাবুর বাড়ীর কাহারও কখন গুরুতর ব্যারাম হইলে এবং ডাক্তারী ও আয়ুর্ব্বেদিক চিকিৎসায় নিরাশ হইলে, তিনি বাবার নিকট হইতে বিভূতি অথবা 'আশাপূরী ধূপ' নিয়া যাইতেন ও ব্যবহার মাত্রই রোগের উপশম হইয়া যাইত। একবার কান্তি বাবুর পুত্রবধূ প্রসবকালে তিন দিন অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। ডাক্তার ও ধাত্রীদের চেষ্টায় কোন ফল না হওয়ায় অবশেষে নিরাশ হইয়া কান্তি বাবু বাবার কাছে লোক পাঠান। বাবা একটু বিভূতি দেন। তাহা সেবন করা মাত্রই পুত্রবধূ টীর নির্ব্বিঘ্নে সন্তান প্রসব হয় এবং প্রসূতি সম্পূর্ণ ভাল হইয়া উঠেন। আর একবার কান্তি বাবুর ছোট ছেলেটীর সান্নিপাতিক জ্বর হয়, ইহার আনুসঙ্গিক লক্ষণ গুলিও সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। অবশেষে যখন জীবনের আর আশা রহিল না, তখন কান্তি বাবু বাবার কাছে লোক পাঠান। সেই লোকের হাতে বাবা কিছু আশাপূরী ধূপ দেন। তাহার ধোয়া কয়েকবার

শুঁকিতেই রোগীর জ্বর ত্যাগ হয় এবং তৎপরে কিছুদিনের মধ্যে ছেলেটী সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়। কান্তি বাবু বলিয়া থাকেন যে, বাবাই তাঁহার ছেলের প্রাণদাতা। এইরূপ কতবার যে বাবা তাঁহাকে কত বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার শেষ নাই। উপরোক্ত দু'টী ঘটনাই আমার গোরক্ষনাথে বাবার কাছে অবস্থিতি কালে ঘটিয়াছে। ব্যারাম আরোগ্য হইবে, এরূপ ভরসা দিয়া যে বাবা বিভূতি বা ধূপ দিতেন, তা নয়। তাঁহারা বাবার আশীর্ব্বাদ স্বরূপ ইহা চাহিতেন বলিয়াই বাবা বাৎসল্যের সহিত ইহা দিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাসের বলেই হউক, রোগীর কর্ম্মানুসারেই হউক, বা যে কারণেই হউক, রোগের নিবৃত্তি দেখা গিয়াছে। রোগ সারাইবার প্রকাশ্য উদ্দেশ্য লইয়া বাবা কখনও এ সব দিতেন না। তিনি বলিতেন যে ব্যারাম হওয়া ও তাহা হইতে আরোগ্য হওয়া নিজ কর্ম্মানুসারেই হয়। তবে লৌকিক উপায় অবলম্বন করা উচিত।

"আমার প্রতি বাবার অনুগ্রহের কথা কি বলিব? বাবার কথা মনে হইলে প্রাণে আবেগ ধারণ করা দুঃসাধ্য হয়। আমি যখন গিরিডিতে ছিলাম, তখন একবার ১৯১২ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের বন্ধে গোরক্ষপুর আসিলাম। বাবা প্রত্যেক বৎসর বৈশাখের মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত আশ্রমে জমীদারীর তত্ত্বাবধানের জন্য বাহিরে থাকিতেন। আমার জ্যৈষ্ঠমাসের বন্ধে বাবার গোরক্ষপুরে থাকার কোন কথা নাই। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে আমার গোরক্ষপুরে আসিবার ২।৩ দিন পূর্ব্বেই বাবা তথায় ফিরিয়া আসিয়াছেন দেখিলাম।

"তৎপরের বৎসর আমার জ্যৈষ্ঠমাসের ছুটীর অব্যবহিত পূর্ব্বেও খবর পাইলাম, বাবা মফঃস্বলে আছেন। মফঃস্বলে সাধারণতঃ বাবা কোন বাঙ্গালীকে সঙ্গে নিতেন না, এবং তাঁহার কাছে যাইতে অনুমতিও দিতেন না। আমি মনে করিয়াছি, এই কয়মাস ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাটাইলাম, এই বন্ধেও যদি বাবার সঙ্গে দেখা না হয়, তবে আর বাঁচিব না। আমি সংকল্প করিলাম, বাবা যেখানেই থাকুন, সেখানেই যাইয়া উপস্থিত হইব, বাবাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিবনা। আমি গোরক্ষপুরে পৌছিয়া ষ্টেষণ হইতে এক্কা করিয়া আশ্রমে যাইবার রাস্তায় একটী পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের নিকট শুনিলাম 'মহারাজজী ফিরিয়া আসিয়াছেন।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'কবে?' তিনি বলিলেন 'আজ প্রাতে'। কৃতজ্ঞতায় প্রাণ ভরিয়া গেল, বুকটা যেন প্রাণের আবেগ ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। আমি এক্কা হইতে নামিয়া বাবার কাছে যাইতেই তিনি আনন্দ প্রকাশ করিয়া একটু হাসিলেন। ...সে বার বাবা মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'স্কুল কবে খুলিবে এবং আমাকে কবে যাইতে হইবে।' আমি প্রত্যেক বার স্কুল খুলিবার একদিন বাকী থাকিতে বাবার কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করিতাম। এবার আমার রওনা হইবার দিন প্রাতে শুনিলাম, বাবা সেদিন দুপ্রহরের ভোজনের পরে আবার গ্রামে যাইবেন। আমাকে সন্ধ্যার গাড়ী ধরিতে হইবে। বাবা বেলা প্রায় একটার সময় হাতীতে চড়িয়া রওনা হইবার সময় আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'তুই আজই যাবি, নয়?'

"তার পরের বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের বন্ধে গোরক্ষপুর ষ্টেষণ হইতে একা করিয়া আসিবার সময় রাস্তায় শুনিতে পাইলাম, বাবা হঠাৎ কোন জরুরী সংবাদ পাইয়া তৎপূর্ব্ব দিবস সন্ধ্যার সময় জমিদারী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এবার বাবা গোরক্ষপুরে প্রায় দুই সপ্তাহ থাকিয়া আবার জমিদারীতে ফিরিয়া যাইবেন। আমিও বাবার সঙ্গে যাইব, ইহাতে বাবার অমত ছিল না। কিন্তু ব্রহ্মচারী বাবাকে বলিলেন "বরদা ৫ বৎসর যাবৎ বৃদ্ধা মায়ের ও আজন্ম মাতৃহীনা কন্যার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য দেশে যাইতেছে না; আপনি বরদাকে আপনার সঙ্গে না নিয়া দেশে যাইতে বলুন।" বাবা অত্যন্ত স্নেহের স্বরে বলিলেন 'তুই কয়েক দিনের জন্য মায়ের কাছে যা, তারপর আবার আসিস।' আমি বাধ্য হইয়া দেশের দিকে রওনা হইলাম। জীবনে বড় ছোট কত বিষয়ে যে বাবার দয়া উপলব্ধি করিয়াছি, বলিতে পারি না।"

বাবাজীর অপর একজন শিষ্য* তাঁহার স্মৃতিলিপিতে বাবাজীর স্নেহ ও দয়ার নিদর্শন স্বরূপ এই প্রকার অনেক ঘটনা তাঁহার নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বর্ণনা করিতে করিতে প্রসঙ্গ-ক্রমে একটি ঘটনা এইরূপ লিখিয়াছেন,—"রামেশ্বর নামে এক ছোকরা চাকর আশ্রমে ছিল। এক মধ্যাহ্নে ঠাকুর আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছিলেন। আমরা আহার করিয়া আসিবার পর আমার ইচ্ছা হইল, একবার ঠাকুর ঘরে যাই। আমি খুব চুপি

* শ্রীযুত বিনোদ বিহারী দত্ত গুপ্ত।

চুপি গেলাম, আশা, এই সময় চাকরের হাত হইতে লইয়া পাখার দড়িটা নিজে টানিব। ঘরে সামনের দরজা দিয়া ঢুকিয়া দেখি, ঠাকুর খাটে বসিয়া আছেন, রামেশ্বর বালক তাঁহার খুব নিকটে খাটের সামনে দাঁড়াইয়া আছে, ঠাকুর সকাল বেলার আনীত বেশ বড় বড় ২।১টি আপেল কি বেদানা (যাহা তিনি নিজ হাতে মাঝে মাঝে তাঁহারই বিছানার পার্শ্বে রাখিয়া দিতেন, অথচ পরে দেখিতাম না) হাতে লইয়া নাড়া চাড়া করিতেছেন। আমার আকস্মিক উপস্থিতিতে মনে হইল যেন তাঁহারা একটু চমকিত হইলেন,—তাঁহাদের চমক না হইলেও আমার ভিতরকার প্রকাশই আমি দেখিলাম। আমি আর কাল বিলম্ব না করিয়া চলিয়া আসিলাম। বিকাল বেলা দেখি সেই ফলগুলির অনেকই নাই। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে ঐরূপ সযত্নে রক্ষিত ফল কমিয়া যাইত। তখন বুঝিলাম ব্যাপারটা কি। দারিদ্র্য-পীড়িত বালককে স্নেহ করিয়া উৎকৃষ্ট বস্তু খাইতে দেয়, এমন কেহ নাই, তাই তিনি সেবক ভৃত্যের সেবা নিজেই করিতেছিলেন।” এসব কাজ তিনি সাধারণতঃ এইরূপ নীরবে ও গোপনেই করিতেন।

বরদা বাবু তাঁহার স্মৃতিলিপিতে লিখিয়াছেন যে “মানুষের আর কথা কি, কোন ইতর প্রাণীও তাঁহার স্নেহ ও সেবা হইতে বঞ্চিত হইত না। আশ্রমের গরুগুলি মাঠে চরিতে যাইবার সময় ও মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় বাবাকে ঘেঁসিয়া একটু আদর না নিয়া কিছুতেই যাইত না। বাবা

বাহিরে বসা থাকিলে কুকুরগুলি তাঁহাকে ঘিরিয়া শুইয়া থাকিত। তাহাদের গায়ে ধূলা কাদা থাকিত বলিয়া কেহ যদি তাহাদিগকে বাবার নিকট হইতে তাড়াইতে যাইত, বাবা নিষেধ করিতেন। একদিন শেষ রাত্রে বাবার ঘরে খট্ খট্ শব্দ শুনিয়া দরজা খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, বাবা তাঁর খাটের নীচ হইতে রুটী ছিঁড়িয়া ইন্দুর গুলিকে বাঁটিয়া দিতেছেন। আমাকে দেখিয়া যেন লজ্জা পাইয়া তিনি খাটে গিয়া বসিলেন, এবং আমার চিন্তাকে অন্যদিকে ধাবিত কারবার জন্য আমাকে তামাক সাজিতে বলিলেন। বাবার চোখে কেহ কখন এক ফোটা জল দেখে নাই, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণটী যে অত্যন্ত কোমল ছিল, তাঁহার দৃষ্টি ও ব্যবহারে প্রতিপদে ইহার সাক্ষ্য পাইয়াছি। বাবার কার্পাসবস্ত্র ও পশমীবস্ত্র পরিতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু তাঁহার শিষ্যসেবকগণ তাঁহাকে রেশমীবস্ত্র দেওয়া সত্ত্বেও তিনি তাহা প্রায়ই পরিধান করিতেন না; কেন পরিতেন না, তাহাও স্পষ্ট বলিতেন না। আমরা মাঝে মাঝে রেশমীবস্ত্র পরিতে অনুরোধ করিলে, তিনি বলিতেন—'আচ্ছা, এখন রেখে দে'। একদিন প্রসঙ্গক্রমে বাবা বলিলেন যে,—রেশমের সুতা কাটিয়া যাওয়ার ভয়ে, যারা গুটিপোকা পালে, তারা পোকাসহিত গুটিকা গুলি গরম জলে ফেলিয়া দেয়; এই রকমে শত সহস্র পোকা মারা যায়। তখন তাঁহার রেশমী কাপড় পরিতে অনিচ্ছার কারণ বুঝিতে পারিলাম। বাবার প্রেমে বনের হিংস্র জন্তুও তাঁর কাছে হিংসা ভুলিয়া যাইত। সাপ বাঘের পর্য্যন্ত তিনি যত্ন ও সেবা করিতেন।

"বাবা দীন দরিদ্র সকলেরই পিতাস্বরূপ ছিলেন। এখনও জমিদারীর প্রজারা এখানে (গোরক্ষনাথ মন্দিরে) আসিলে বাবার সমাধিমন্দিরের নিকট দাঁড়াইয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া থাকে,—'হে বুড়ো মহারাজ! আপনি কোথায় লুকাইয়া রহিয়াছেন? আমাদের যে প্রতিপালন করিবার আর কেহ নাই। যেখানেই থাকুন আমাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। আমাদের দুঃখের কথা শুনিয়া আমাদের অভাব মোচন করিবার আর কেহ যে নাই। মহারাজ! আপনিই আমাদের একমাত্র ভরসা ও নির্ভর। ধন্য মহারাজ! ধন্য আপনার মহিমা! ইত্যাদি।"

নিতান্ত পাপীও বাবা গম্ভীরনাথের অনুগ্রহ দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইত না। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে কেহ কোন অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াও ভীত ও অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি এমন স্মিত মুখে ও প্রসন্ননেত্রে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন, এমন স্নেহমাখা ভাষায় তাহার সহিত দু' একটি সান্ত্বনা, উৎসাহ ও অভয়ের কথা বলিতেন, এমন মধুর ভাবে তাহার সহিত ব্যবহার করিতেন, যে, সে তাহার অপরাধের কথা ভুলিয়া যাইত, তাহার চিত্তের মালিন্য তাঁহার স্নেহ ও করুণার অমৃতধারায় বিধৌত হইয়া যাইত, তাহার প্রাণে অভূতপূর্ব্ব শান্তি ও অভয় আসিত, তাহার পাপপ্রবৃত্তির আগুনও সেই অমৃতাভিষেকে চিরকালের জন্য নির্ব্বাপিত হইত। আশ্রমের কোন কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে কোনরূপ গুরুতর অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, তিনি তাহার সংশোধনের জন্য কিছু শাস্তির ব্যবস্থা করিতেন বটে, কিন্তু

তাহাকে একপদ হইতে বরখাস্ত করিয়া উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক অন্যপদে আবার নিযুক্ত করিতেন ; তাহাতে কেহ আপত্তি করিলে তিনি বলিতেন যে, বেচারী কি না খাইয়া মরিবে, না তাহাকে পাপের পথেই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত হইবে ?

একবার একটি শিষ্য তাঁহার নিকটে বসিয়া আছেন। একটি সুসজ্জিতা অনবগুণ্ঠিতা নারী গাড়ি হইতে নামিয়া গোরক্ষনাথ মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ফল মিষ্টাদির ডালি দিয়া প্রণাম করিলেন, এবং বাবাজীর অনতিদূরে আসিয়া করযোড়ে তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শিষ্যটীর মনে হইল যে, তিনি পতিতা নারী, অথচ তিনি মন্দিরে প্রবেশ করাতে তাঁহার এবিষয়ে বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হইল। বাবাজী শিষ্যের দিকে চাহিয়া কারুণ্যপূর্ণ ভাষায় বলিলেন—'রেণ্ডী হৈ মগর হিন্দু হৈ'। বিশ্বব্যাপি-হৃদয়, উদারধর্ম্মমত-পোষক, পতিতবন্ধু মহাত্মা গম্ভীরনাথ স্বীয় শিষ্যকে হাবভাবে ও কথায় সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, পাপকর্ম্মে লিপ্ত থাকিলেও যে ব্যক্তি দেবতার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন, দেবতার মন্দিরে প্রবেশ করিতে তাহার অধিকার আছে, সমাজ তাহাকে পরিত্যাগ করিলেও দেবতা তাহাকে পরিত্যাগ করেন না। শিষ্যের সংকীর্ণতা দূরীভূত হইল, পাপীর প্রতি বাবাজীর করুণা ও ধর্ম্ম-নীতি সম্বন্ধে তাঁহার উদারভাব দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন।

বাবা গম্ভীরনাথের ভক্তবাৎসল্য ও জীবপ্রেমের দৃষ্টান্তস্থানীয় ঘটনাবলী বিবৃত করিতে থাকিলে গ্রন্থের শেষ হইবার সম্ভাবনা

নাই। যে কোন ব্যক্তি এক ঘণ্টার জন্যও তাঁহার সঙ্গ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তিনিই এইরূপ ছোট খাট ঘটনায় ইহার বিবিধ পরিচয় পাইয়াছেন। ঘটনা সমূহ অবশ্য খুবই সাধারণ রকমের, কিন্তু তিনি যে দুই একটি কথা বলিয়াছেন, যে কোন কাজ করিয়াছেন বা কাজের আদেশ করিয়াছেন, যে ভাবে সংসারীদিগকে উপদেশ দিয়াছেন, যে ভাবে যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, তার প্রত্যেকটির মধ্যে তাঁহার ভক্তবাৎসল্য ও জীব-প্রেমের বিকাশ হইয়াছে। জীবের প্রতি ভালবাসাই যে তাঁহার ব্যাবহারিক জীবনের নিয়ামক ছিল, জীবপ্রেমই যে তাঁহাকে সমাধির অতল গর্ভ হইতে টানিয়া কতক পরিমাণে বাহিরে রাখিত। তাঁহার ব্যাবহারিক জীবন প্রেম দিয়াই গঠিত ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

যে দু' চারটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে, এবং এই জাতীয় অন্য যে সব ব্যাপার যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে, তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে সামান্য এক আধটুকু তথাকথিত অলৌকিকত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, যৎকিঞ্চিৎ অতীন্দ্রিয় দর্শন শক্তি, লোকের মনোগত ভাব বুঝিবার শক্তি, দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য করিবার শক্তি, ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে,—তৎপ্রতিই যাঁহাদের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়, তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিয়া এবং তাহাই এ সব ব্যাপারের প্রধান অঙ্গ মনে করিয়া যাঁহারা বিস্ময়াবিষ্ট ও বিমুগ্ধ হন, তাঁহারা আসল তথ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া নকলকেই সম্মান প্রদান করেন। যিনি

যোগসিদ্ধ যোগিরাজ, যাঁহার যোগশক্তি অপরিসীম, তাঁহার সম্বন্ধে উক্ত প্রকার শক্তিকে শক্তি বলিয়া মনে করাই বিচারহীনতার পরিচায়ক। নিতান্ত সাধারণ শক্তিবিশিষ্ট যে কোন ব্যক্তি সামান্য অনুশীলন দ্বারাই উক্তরূপ শক্তি লাভ করিতে পারেন; যোগ সাধকগণ তাঁহাদের সাধনার অনেক নিম্ন সোপানেই ঐ সব শক্তি লাভ করিয়া থাকেন, এবং তুচ্ছ বোধে এই প্রকার শক্তি ও বিভূতি অতিক্রম করিয়া যান। যোগ সাধনা ব্যতীত, কোনরূপ বিশেষ শক্তির অনুশীলন ব্যতীত, কেবল মাত্র ভালবাসা ও তজ্জনিত ইচ্ছাশক্তির বলে সাধারণ লোকেও এরূপ ব্যাপার সম্পাদন করিতে পারে, এ সম্বন্ধেও অনেক সুপরিচিত দৃষ্টান্ত আছে। একবার ইংরেজী সংবাদ পত্রে এক ইংরেজ লিখিয়াছিলেন যে,—একজন হিন্দু সাধু বিনা টিকেটে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে ভ্রমণ করিতেছিলেন দেখিয়া এক ষ্টেশনে টিকেট-পরিদর্শক তাঁহাকে বলপূর্ব্বক নামাইয়া দেন। সাধু ষ্টেশনে গাড়ীর ইঞ্জিনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিহিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। গাড়ী ছাড়িবার সময় হইলে চালক চেষ্টা করিয়াও গাড়ী চালাইতে পারিল না। গাড়ীর কোন অঙ্গ বিকল হইয়াছে মনে করিয়া মিস্ত্রীরা অনেক পরীক্ষা করিল। কিন্তু কোন বিকলতা দেখা গেল না। তখন সাধুর দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সাধুকে অনুনয় পূর্ব্বক গাড়ীতে উঠাইয়া দেওয়া হইলে, সহজেই গাড়ী ষ্টেশন ছাড়িল। এই ঘটনাটী লইয়া কেহ কেহ বাবাজীর সম্মুখেও আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং মহাযোগশক্তিধর মহাপুরুষ বলিয়া সেই সাধুর

প্রশংসা করিতেছিলেন। বাবাজী তখন কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন যে, এইরূপ শক্তি দেখিয়া মহাযোগী বা সিদ্ধ মহাপুরুষ নির্ণয় করা যায় না; এই শক্তি লাভ করা খুব বড় কথা নয়, একটা মাত্র বিদ্যা কিছুকাল অনুশীলন করিলেই এই জাতীয় শক্তি লাভ করা যায়। যথার্থ যোগী ও মহাপুরুষের কাছে এ সব কিছুই নয়।

পূর্ব্বোক্ত প্রকার ব্যাপার সমূহের বৈশিষ্ট্য কোনরূপ শক্তির পরিচয়ে নয়; এই সব ব্যাপারের ভিতর দিয়া প্রেমময় যোগিরাজের সুগভীর হৃদয় প্রস্রবণ হইতে যে প্রেমের ধারা নিঃসৃত হইয়া অনুগৃহীত ব্যক্তিদের প্রাণমন অমৃতে প্লাবিত করিয়া দিত, তাহাতেই ইহাদের বিশিষ্টতা। যিনি গুণাতীত পুরুষ, যিনি নিত্যনিরন্তর ব্রহ্মভাবে ভাবিত ও ব্রহ্মানন্দ রসপানে বিভোর, সংসার যাঁহার তত্ত্বদৃষ্টির নিকটে স্বপ্নবৎ মিথ্যা, নিজের দেহেন্দ্রিয় সম্বন্ধেও যিনি সম্পূর্ণ উদাসীন, নিজের সম্পর্কে যাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় কেহ নাই, ইষ্ট বা অনিষ্ট কিছু নাই, যিনি ব্যবহার ক্ষেত্রে জন কোলাহলের মধ্যে অবস্থান করিবার সময়ও সর্ব্বদা অন্তর্দৃষ্টি-পরায়ণ, মৌনবান্, হর্ষবিষাদরহিত ও স্থিরাসনে আসীন হইয়া আপনাতে আপনি বিরাজিত থাকিতেন, সেই লোকোত্তর মহাপুরুষেরও যে আমাদের প্রতি কিঞ্চিৎ স্নেহ ও বাৎসল্য আছে, তিনি যে মুহূর্ত্তের জন্যও আমাদের সম্বন্ধে চিন্তা করেন, আমাদের কল্যাণের নিমিত্ত ও সুখসুবিধা বিধানের নিমিত্ত তিনি যে বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করেন, তিনি যে আমাদিগকে আপনার জন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ও আমাদের প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার

করিতেছেন, তাঁহার ব্রহ্মরসরসিত অমৃতময় হৃদয়ে যে আমাদের জন্যও একটু স্থান আছে, তিনি সকল প্রয়োজনের ঊর্দ্ধে থাকিয়াও আমাদের প্রয়োজন সাধনের জন্য যে এত নিম্নে অবতরণ করেন, ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার বাহ্যিক সামান্য ব্যবহারের মধ্যেও ইহার নিদর্শন প্রাপ্ত হইলে, আমাদের হৃদয়ও কি আশায়, আনন্দে ও পবিত্রতায় সিক্ত হয় না, আমাদের শুষ্ক হৃদয়ও কি প্রেমের মহিমা কতকটা উপলব্ধি করিয়া সরস হয় না, আমাদের চিত্তও কি তাঁর প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া তাঁর ভাবে ভাবিত হইতে ও তাঁর আদর্শানুযায়ী জীবন গঠন করিতে কতক পরিমাণে উৎসাহিত হয় না? অতল সমুদ্রের তলদেশ হইতে উঠিয়া আসিয়া যে বুদ্বুদটী জলরাশির উপরে ভাসিতে থাকে, তার সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিলেই, সে যে অগভীর ডোবার জলের বুদ্বুদ হইতে কত পৃথক, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। সে নিজ আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও অতলতলের বার্ত্তা বহন করিয়া আনে, স্মৃতিকে, চিন্তাকে ও অনুভূতিকে অতলতলে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায় এবং অপার জলধির সঙ্গে আমাদের একটী নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দেয়। মায়াতীত ব্রহ্মভাব-ভাবিত নির্ব্বিকার মহাপুরুষের স্নেহ ও বাৎসল্য তাঁহার ব্রহ্মাভিন্ন হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়া আসিয়া আমাদিগকে সেই নিষ্কল নিষ্ক্রিয় শান্ত শিব অদ্বৈত পরম পুরুষের স্নেহ ও বাৎসল্যের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়, সেই সর্ব্বাতীত সর্ব্বময় বিশ্বগুরু ভগবানের অতল ও অপার প্রাণের সহিত আমাদের ক্ষুদ্র প্রাণের যোগ সংস্থাপন করিয়া দেয়। তাঁহার

অহৈতুকী ভালবাসা আপন প্রভাবে আমাদের বহুধাবিভক্ত ভালবাসাকে স্বকীয় রজস্তমোবিমুক্ত জ্ঞানময় ও প্রেমময় হৃদয়ের দিকে আকর্ষণ করিয়া এককেন্দ্রীভূত ও যোগযুক্ত করে, এবং আমাদের চিত্তকে তন্ময় করিয়া ব্রহ্মভাবে ভাবিত করে।

যোগিরাজ গম্ভীরনাথের বাৎসল্য ও প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ এক জাতীয় কয়েকটী সামান্য সামান্য ব্যাপার উল্লেখ করা হইল; তদ্ব্যতীত অন্য এক জাতীয় বহু ঘটনার বিবরণ তাঁহার বহু শিষ্য ও ভক্তের নিকট হইতে গোপনে অবগত হওয়া গিয়াছে। সে জাতীয় ঘটনা তাঁহারা বাবাজীর দেহে অবস্থান কালেই যে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা নয়, তাঁহার তিরোধানের পর এখনও বিভিন্ন শিষ্য ও ভক্ত বিভিন্ন ভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এখনও সেই প্রকার ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া ও তাহার ভিতরে তাঁহার বাৎসল্য ও করুণার নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহারা নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করিতেছেন যে, গুরুদেব লৌকিক ভাবে স্থূলদেহ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যান নাই, পরন্তু তিনি অলক্ষিত ভাবে তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাদের মঙ্গল বিধান করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বিপজ্জাল হইতে রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদের অন্তরে শুভবুদ্ধির প্রেরণা দিয়া তাঁহাদিগকে পরম কল্যাণের পথে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। শিষ্যবৃন্দের হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ও বিশ্বাসের শিথিলতা দূর করিয়া দিয়া তাঁহাদের প্রাণে উৎসাহ তেজ আস্তিক্য ও প্রেম বর্দ্ধিত করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি মাঝে মাঝে অলৌকিক ভাবে তাঁহাদের
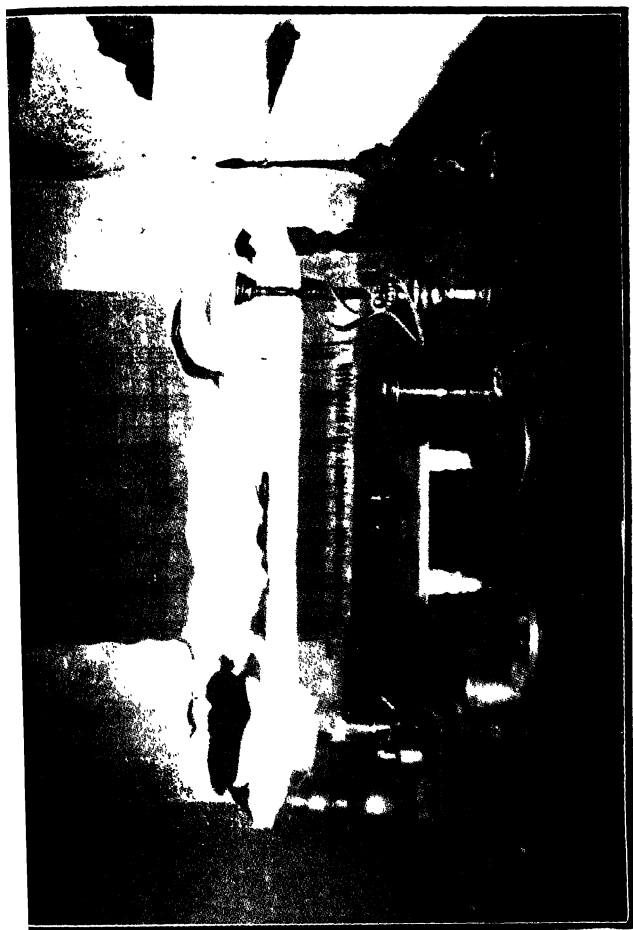
পাদুকা

নিকট আত্মপ্রকাশ করেন, এবং আপনার করুণা ও প্রেমের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন।

এই সব ঘটনার সত্যতায় সন্দেহ করিলে ঐ সকল বিশুদ্ধ স্বভাব সত্যপরায়ণ শিষ্য ও ভক্তদের প্রতি নিতান্ত অবিচার করা হইবে। তাঁহাদের সত্যনিষ্ঠায় সন্দেহ করা হইবে। মহাপুরুষগণ যে অলক্ষ্য ভাবে থাকিয়া জীবের কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন, ইহা শাস্ত্র সম্মত, এবং বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণ ইহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া থাকেন। যাঁহারা কোন সিদ্ধ মহাপুরুষকে গুরুরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই অনুভব করিয়াছেন ও করিতেছেন যে, গুরু তাঁহাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করেন, তাঁহাদের মঙ্গল বিধান করেন ও তাঁহাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করেন। এ বিষয়ে যুক্তি-বিরোধীও কিছুই নাই। সুতরাং এ সকল ঘটনা অপ্রাকৃত বলিয়াই ইহাদের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

কিন্তু তথাপি সে সব ঘটনার বিশেষ উল্লেখ এ গ্রন্থে সমীচীন বিবেচিত হয় না, যেহেতু সে সব ব্যাপার তাঁহার লৌকিক ও ব্যাবহারিক জীবনের অঙ্গীভূত নয়। যিনি অপ্রাকৃত ভাবে নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও, ধর্ম্মনিষ্ঠ সদ্‌গুণবিশিষ্ট প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায়ই লৌকিক জীবনের ব্যবহার চালাইয়াছেন, যিনি যোগীশ্বর হইয়াও প্রাকৃত জীবনে যোগৈশ্বর্য্যের কোন পরিচয় প্রদান করেন নাই, যিনি জীবপ্রেমে পরিপূর্ণ হইলেও প্রকাশ্য ভাবে কোনরূপ অলৌকিক শক্তি বিকাশ করিয়া জীবের দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করেন নাই, সেই মহাপুরুষের জীবন ধারার আলোচনার মধ্যে ঐ

সব গুপ্ত ঘটনার প্রকাশ্য আলোচনা না করাই সঙ্গত ও তাঁহার উপদেশানুযায়ী বোধ হয়। বিশেষতঃ ঐ সকল ঘটনা সর্ব্বসাধারণের জন্য নয়, বিশেষ অধিকার সম্পন্ন ভক্তদের জন্যই উহা অভিপ্রেত। ঐ সকল ঘটনাকে সাধকদের আধ্যাত্মিক জীবনের বিশেষ উপলব্ধি বলিয়া গ্রহণ করাই সমীচীন।

প্রপন্ন শিষ্যের আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে গুরু যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করেন, গুরু শিষ্যের পরস্পরের মধ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে যে প্রকার গুহ্য ভাবের আদান প্রদান হয়, তাহা সজাতীয়, সমভাবসম্পন্ন, অন্তরঙ্গ ধর্ম্মবন্ধু ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট প্রকাশযোগ্য নহে। কোন ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি যখন স্বকীয় সুপ্ত আধ্যাত্মিক শক্তি উদ্বুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ও বিশেষ মহাপুরুষ-প্রদর্শিত সাধন পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হইবার উদ্দেশ্যে, কোন মহাপুরুষের শরণাপন্ন হন, এবং সেই মহাপুরুষ যখন দীক্ষা প্রদান দ্বারা স্বীয় আধ্যাত্মিক শক্তি সেই ধর্ম্মার্থীর প্রাণে সংক্রামিত করিয়া ও তাঁহাকে মানব জীবনের চরম কল্যাণের পথ প্রদর্শন পূর্ব্বক পরিচালিত করিবার ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন, তখন হইতে সেই শিষ্যের নিকট উক্ত মহাপুরুষ অন্যান্য মহাপুরুষদিগের ন্যায় কেবলমাত্র একজন মহাপুরুষ অথবা ধর্ম্মোপদেষ্টা বা লোকশিক্ষক নহেন, এবং সেই মহাপুরুষের নিকটও উক্ত শরণাগত শিষ্য অন্যান্য ধর্ম্মলিপ্সু উপদেশ-প্রার্থীদের মধ্যে একজন নহেন। এই দীক্ষা ব্যাপারের

ভিতর দিয়া গুরু ও শিষ্যের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা কোনরূপ বাহিরের সম্পর্ক নয়, এই জগতে ব্যক্তিগতভাবে কোন দুইজন ব্যক্তির মধ্যে যত প্রকার সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে, তন্মধ্যে কোনটির সহিত এই গুরু-শিষ্য সম্বন্ধের তুলনা হইতে পারে না। এই সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে ভিতরের সম্পর্ক। শিষ্য নিজের সাধনার সঙ্গে সঙ্গে স্বকীয় হৃদয়ে গুরু শক্তির বিশেষ বিশেষ বিকাশ ও তাঁহার বিশেষ বিশেষ লীলা অনুভব করিতে থাকেন। গুরুও অন্তর্য্যামি-রূপে আত্ম প্রকাশ পূর্ব্বক শিষ্যের ধীশক্তিকে কল্যাণের পথে প্রবর্ত্তিত করিতে করিতে নব নব রূপে ও নব নব ভাবে শিষ্যের সহিত লীলা করিয়া থাকেন। শিষ্যের চিত্ত ও হৃদয় গুরুর বিশেষ লীলাক্ষেত্র, এবং এখানেই প্রেমপ্রধান মহাপুরুষের প্রেমময় স্বভাবের অসাধারণ প্রকাশ। শিষ্যের নিকটে গুরু করুণাময় মোক্ষদাতা ভগবান্ হইতে অভিন্ন --তাঁহার স্থূলদেহে প্রকটিত মূর্ত্তি।

এই জাতীয় লীলা মহাপুরুষের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত শিষ্য ব্যতীত অপর কেহ সম্যক্‌রূপে ধারণা করিতে সমর্থ হন না। সদ্‌গুরু-শিষ্যদের মধ্যেও একে অপরের অসাধারণ অভিজ্ঞতা অনেক সময় বুঝিতে পারে না। একই মহাপুরুষ অনেক সময় বিভিন্ন স্বভাব বিশিষ্ট শিষ্যদের নিকটে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গুরুশক্তির প্রকাশ করেন। সুতরাং এই সকল বিশেষ বিশেষ শিষ্যের ক্ষেত্রে গুরু শক্তির বিচিত্র লীলা মহাপুরুষের [illegible] জীবন-ধারার অঙ্গীভূত বলিয়া [illegible] না [illegible]

সাধারণ জীবন এক জিনিষ, তাঁহার বিশেষ গুরুভাবময় জীবন সম্পূর্ণ পৃথক জিনিষ। গুরুভাবের জীবন একমাত্র অধিকারী শিষ্যেরই অনুভূতি হয়, মহাপুরুষের সাধারণ জীবনচরিত সকলেরই আলোচ্য, বিচার্য ও অনুসরণীয়। সেইহেতু শ্রীশ্রীযোগিরাজ-গম্ভীরনাথ প্রসঙ্গ সদ্গুরু গম্ভীরনাথের বিশেষ গুরুভাবের লীলা যথাসম্ভব বর্জন করিয়া সাধারণ ধর্মার্থী ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু লোক সমাজে একটি পরিপূর্ণ মানবের অস্পষ্ট আলেখ্য উপস্থিত করিবার জন্য আত্মপ্রকাশ করিল। প্রার্থনা করি, সদ্গুরু প্রপন্ন ভক্তদের হৃদয়ের মাহাত্ম্য বিধান করিয়া মহাপুরুষ জীবনের জীবন্ত আদর্শ তাঁহাদের নিকট প্রকটিত করুন।

॥ হরি ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ ॥

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈশ্চ
সর্ব্বাত্মনা তে চরণাশ্রিতেন।
লব্ধঃ প্রসঙ্গো ভবতঃ প্রসাদাৎ
ত্বৎপাদপদ্মে হি সমর্পিতোঽয়ম্ ॥
ওঁ স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য খলঃ প্রসীদতাং
ধ্যায়ন্তু ভূতানি শিবং মিথো ধিয়া।
মনশ্চ ভদ্রং ভজতাদধোক্ষজে
আবেশ্যতাং নো মতিরপ্যহৈতুকী ॥